

Family Development Package - Book1

# TAQWA

# তাকওয়া

আমির জামান  
নাজমা জামান

Family Development Package – Book 1

# তাকওয়া Taqwa

আমির জামান  
নাঈমা জামান

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

## সম্পাদনা পরিষদ

ড. মানজুরে ইলাহী

পি.এইচ.ডি. ইসলামিক ল  
মদীনা ইউনিভার্সিটি, সৌদিআরব

শেখ বশির বিন আল মাসুমী

লেখক : ইসলামিক শিক্ষা সিরিজ  
মক্কা, সৌদিআরব

জাবেদ মুহাম্মাদ

পি.এইচ.ডি গবেষক  
ইউনিভার্সিটি অব রেজাইনা, ক্যানাডা

ড. কায়সার মামুন

শিক্ষা বিষয়ক গবেষক  
সিংগাপুর

সাইদুল হোসেন

লেখক এবং গবেষক  
ক্যানাডা

আলী আকবর

শিক্ষা বিষয়ক গবেষক  
আমেরিকা



**Published by**  
**Institute of Family Development, Canada**  
[www.themessagecanada.com](http://www.themessagecanada.com)

# তাকওয়া

**Amir Zaman**

**Nazma Zaman**

Toronto, Canada

Email : [themessagecanada@gmail.com](mailto:themessagecanada@gmail.com)

© Copyright: IFD Trust

1<sup>st</sup> Edition: July 2008

2<sup>nd</sup> Edition: December 2011

3<sup>rd</sup> Edition: January 2013

4<sup>th</sup> Edition: December 2015

## প্রাপ্তিস্থান

### Bangladesh:

**IFD Trust**

Mohammadpur  
Dhaka

01710219310

01682711206

**UZ Sales**

**Centre**

Dhaka

01712846164

01675865180

**Taleb Pharma**

NurJahanRoad

Dhaka

01917216350

01712177474

**Al-Maruf**

**Publications**

Katabon, Dhaka

029673237

01913510991

**Kabir**

**Publishers**

Chittagong

01613061653

### Canada:

**TIC**

Toronto Islamic Centre

575 Yonge St. Toronto

647-350-4262

**ATN Book Store**

Danforth, Toronto

416-686-3134

416-671-6382

**Proton Book Centre**

Danforth, Toronto

416-388-4250

647-346-4250

### Other Country:

**New York, USA**

917-671-7334

718-424-9051

**California, USA**

714-821-1829

714-930-6677

**London, UK**

447424248674

**Singapore**

65-938-67588

মূল্য : ২৫০ টাকা (BDT)

Price: \$7 (Seven Dollars)

## আমাদের অভিব্যক্তি

### আম্মামাদুমু আম্মাইবুন্ম

একজন মুসলিমের সমস্ত কর্মকাণ্ডের মূলে হলো তাকওয়া। যার তাকওয়া যত উন্নতমানের তার ঈমান তত মজবুত। আমরা বেশিরভাগ মুসলিমরাই তাকওয়া সম্পর্কে পরিষ্কার জ্ঞান না থাকার কারণে জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে সীমালংঘন করে ফেলি। আমরা কেন আল্লাহকে ভয় করবো বা কেন আল্লাহকে ভালবাসবো সে বিষয়ে সঠিক জ্ঞান অর্জনের জন্যে আল কুরআন ও সুন্নাহর দলিলসহ আধুনিক যুক্তি প্রমাণ ও authentic information উপস্থাপন করাই এই বইয়ের মূল উদ্দেশ্য।

ক্যানাডায় এসে যখন সরাসরি কুরআনের তাফসীর এবং সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহ পড়াশোনা শুরু করলাম তখন ধীরে ধীরে আমাদের কাছে তাকওয়ার প্রকৃত রূপ প্রকাশ পেতে থাকলো। তারপর থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্ন স্কলারদের বই, ডিভিডি, তাফসীর এবং ওয়েবসাইট থেকে আমরা তাকওয়া সম্পর্কে কিছু মূল্যবান তথ্য সংকলন করার চেষ্টা করতে থাকি। আর সেগুলোই মূলতঃ এই বইটিতে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি।

আশা করি এই বইটি আপনার-আমার মাঝে তাকওয়ার (আল্লাহর ভয় ও ভালবাসা) মনোভাব গঠন এবং ঈমানী শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। সম্মানিত পাঠকের মতামত, ভুল সংশোধন ও দৃষ্টি আকর্ষণ ই-মেইল অথবা টেলিফোনে জানালে আগামী সংস্করণে তা প্রতিফলিত হবে, ইনশাআল্লাহ।

জাযাকআল্লাহু খাইরন,

আমির জামান

নাজমা জামান

টরন্টো, ক্যানাডা

# সূচীপত্র

## ১ম অধ্যায় : তাকওয়ার উৎস

Etymology of Taqwa	১০
Meanings of Taqwa	১০
তাকওয়া কথাটির মূল (Root)	১০
তাকওয়া সম্পর্কে Wikipedia'র বক্তব্য	১১
তাকওয়া কী?	১২
তাকওয়ার কিছু Sprititual দিক	১৩

## ২য় অধ্যায় : তাকওয়ার গভীরতার উপর বিশ্লেষণ

তাকওয়ার বিশ্লেষণ	১৬
তাকওয়া হচ্ছে অভ্যন্তরীণ গুণ	২০
তাকওয়ার আরো ব্যাখ্যা	২০
আত্মার পরিশোধন	২২
ইসলামিক কম্পাস	২৪

## ৩য় অধ্যায় : তাকওয়ার শাখা-প্রশাখা

ঈমানের স্বচ্ছ ধারণা এবং দ্বীনের সঠিক বুঝ থাকা জরুরী	২৭
সকল সমস্যার মূল হচ্ছে আংশিক বা ভুল ঈমান	২৮
দ্বীনের সঠিক উপলব্ধি	২৯
তাকওয়া আছে কি নেই তা বিচার ও যাচাই	৩৪
তাকওয়া সম্পর্কে আল্লাহ বলেন	৩৬
কুরআনে তাকওয়া অবলম্বন করার জন্যে বারবার তাগিদ	৪০
তাকওয়া সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন	৪৪

## ৪র্থ অধ্যায় : সাহাবা(রা.) এবং ইসলামিক স্কলারদের দৃষ্টিতে তাকওয়া

তাকওয়া হলো পথের দিশারী আলো	৪৬
ভয় ও আশা পোষণ করা	৫১
আল্লাহকে ভালোবাসার মাধ্যম – তাকওয়া	৫২
তাকওয়ার উপর ভিত্তি করে উমর (রা.) ছেলের বিয়ে	৫৩
বর্তমান বিশ্বের একজন রাষ্ট্রপ্রধানের তাকওয়ার দৃষ্টান্ত	৫৪

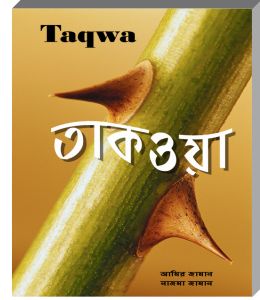
## ৫ম অধ্যায় : তাকওয়ার মাধ্যমে আত্মগঠন

তাকওয়া অর্জনের মাধ্যম – সিয়াম	৫৭
তাকওয়ার সাথে সিয়ামের সম্পর্ক	৫৮
Benefits of Fasting in Islam	৫৯

Annual training for character-building	৬০
সলাতের (নামাযের) মূল উদ্দেশ্য	৬২
আত্মগঠনের একমাত্র উপায় তাকওয়া	৬৩
<b>৬ষ্ঠ অধ্যায় : ঈমান এবং তাকওয়া</b>	
ঈমান এবং তাকওয়ার মধ্যে সম্পর্ক	৬৫
ঈমানের উপর টিকে থাকা	৬৬
কিভাবে বুঝবো আমার ঈমান দুর্বল না সতেজ?	৬৭
আল্লাহর ভয় না মানুষের ভয়?	৬৯
কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে নিজেই নিজের মূল্যায়ণ করি	৬৯
সূদ ও তাকওয়া	৭২
অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ দ্বীনের পথে খরচ করা	৭৪
ইসলাম কী বলে আর আমরা কী করি?	৭৬
তাকওয়া অবলম্বনের কিছু সূক্ষ্ম উদাহরণ	৮০
<b>৭ম অধ্যায় : অধিকার আদায়ে তাকওয়া</b>	
মানব জীবনে তাকওয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য	৮২
ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনে তাকওয়া	৮৩
স্বামী-স্ত্রীর অধিকার আদায় ও তাকওয়া	৮৭
স্ত্রীর অধিকার আদায় ও স্বামীর অধিকার আদায়	৮৮
সন্তান প্রতিপালনে তাকওয়া	৯১
মাতা-পিতার অধিকার ও তাকওয়া	৯২
ছোট ভাইবোনদের প্রতি বড় ভাইয়ের অবহেলা	৯২
অন্যান্যদের অধিকার ও তাকওয়া	৯৩
আয়-রোজগারের ক্ষেত্রে তাকওয়া	৯৩
<b>৮ম অধ্যায় : শিরক-বিদ'আত মিশ্রিত তাকওয়া</b>	
তাকওয়ার ক্ষেত্রে আকীদার তাৎপর্য ও গুরুত্ব	৯৮
তাকওয়ার ক্ষেত্রে তাওহীদ ও শিরক	৯৮
তাকওয়ার ক্ষেত্রে সুন্নাত ও বিদ'আত	১০২
<b>৯ম অধ্যায় : তাকওয়া বৃদ্ধির উপায়</b>	
তাকওয়া বৃদ্ধির সাইকেল	১০৪
সংঘবদ্ধ জীবনযাপন করা	১০৫
নিয়মিত দ্বীনের জ্ঞানার্জন করা	১০৬
ইসলামের দাওয়াতী কাজ করা	১০৭
দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর পথে ব্যয় করা	১০৮
আমাদের মৌলিক দুর্বলতা	১১০

তাহাজ্জুদ সলাতের মাধ্যমে তাকওয়ার মান বৃদ্ধি	১১২
ইতিকাফের মাধ্যমে তাকওয়া বৃদ্ধি	১১২
তাকওয়ার বাস্তব রূপ	১১৩
হাশরের ময়দানে কঠিন প্রশ্ন ও জবাব	১১৫
মৃত্যু-চিত্তার মাধ্যমে তাকওয়া বৃদ্ধি	১১৫
মৃত্যু সংক্রান্ত দু'টি সত্য ঘটনা	১১৬
<b>১০ম অধ্যায় : সলাত ও তাকওয়া</b>	
তাকওয়ার সহিত সলাত আদায়	১১৮
<b>১১শ অধ্যায় : তাকওয়াবানদের পরিচয়</b>	
আল কুরআনে তাকওয়াবানদের বিভিন্ন স্তর	১২৬
কে সর্বাধিক মুত্তাকী? এবং মুত্তাকীর গুণাবলী	১২৮
আল্লাহ কাদেরকে ভালবাসেন/কাদেরকে ভালবাসেন না	১৩১
প্রকৃত তাকওয়া এবং কৃত্রিম তাকওয়া	১৩৪
তাকওয়া ও ইহসান	১৩৮
<b>১২শ অধ্যায় : তাকওয়ার উপকারিতা</b>	
ইহকালীন উপকারিতা	১৪১
পরকালীন উপকারিতা	১৪৮
<b>১৩শ অধ্যায় : আদর্শ প্রতিষ্ঠায় তাকওয়া</b>	
তাকওয়া এক কঠিন পথ	১৫৩
আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা	১৫৭
আদর্শ প্রতিষ্ঠায় ঈমানের পরীক্ষা	১৫৮
অগ্নি পরীক্ষায় নিখাদ প্রমাণিত হওয়া	১৫৯
দীন প্রতিষ্ঠার মুভমেন্টে শরীক না হবার পরিণাম	১৬২
<b>১৪শ অধ্যায় : প্রকৃত সুন্নাহর অনুসরণ বনাম তাকওয়ার পরীক্ষা</b>	
সুন্নাহ কী?	১৬৫
সহজ সুন্নাহ ও কঠিন সুন্নাহ	১৬৬
বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের প্রতি বিশ্বনাবীর আহবান	১৬৯
<b>১৫শ অধ্যায় : তাকওয়ার পরীক্ষা</b>	
ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর তাকওয়ার পরীক্ষা	১৮০
রসূলুল্লাহ ﷺ -এর বন্দী জীবন	১৮৪
রসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি তায়েফবাসীদের অত্যাচার	১৮৯
ওহদের যুদ্ধে রসূলুল্লাহ ﷺ -এর দাঁত ক্ষতিগ্রস্ত	১৯২
সাহাবাদের (রা.) তাকওয়ার দৃষ্টান্ত	২০০
<b>এই বই-এর আলোকে শিক্ষা ও করণীয়</b>	২১৮





# تَقْوَا

## সবার জন্য তাকওয়া

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ  
تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

“হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর, যেক্রপ ভয় করা উচিত।  
তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।”  
(সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১০২)

*O you who believe! Fear Allah (by doing all that He has ordered and by abstaining from all that He has forbidden) as He should be feared. [Obey Him, be thankful to Him, and remember Him always], and do not die unless you are Muslims with complete submission to Allah.*

তাকওয়া হচ্ছে সকল ইবাদতের মূল। ঈমানী জীবনের প্রকৃত রূপ ও এর সৌন্দর্য পরিস্ফুটন হয় তাকওয়ার প্রখরতায়। যার তাকওয়া যত উন্নতমানের তার জীবন হয় তত সুন্দর ও ঈমানী নূরে আলোকিত। আল কুরআনের সর্বত্রই

মু'মিনদের পরিচয় ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন বারবার তাকওয়া শব্দটি উল্লেখ করেছেন ।

ঈমানদারের সকল কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রক হলো এই তাকওয়া । সকালে ঘুম থেকে উঠার পর থেকে রাতে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত একজন ঈমানদারের দিন-রাত ২৪ ঘণ্টার যাবতীয় কর্মসূচী প্রণীত হয় এই তাকওয়ার ওপর ভিত্তি করে । কেবল কর্মসূচী প্রণয়নই নয়, এর সফল বাস্তবায়নের পদ্ধতিও তাকওয়ার ওপর নির্ভরশীল ।

## তাকওয়া

তাকওয়া শব্দটির সরল অর্থ আল্লাহ ভীতি । তাকওয়ার আভিধানিক অর্থ কোন বস্তুর অনিষ্ট হতে আত্মরক্ষা বা বাঁচার প্রচেষ্টা করা । আল্লাহর ভয় মানুষের অন্তরে ঢুকলেই মানুষ হয় সত্য গ্রহণকারী এবং সত্য প্রত্যয়নকারী মুক্তাকী । তাকওয়ার বিপরীত শক্তি হচ্ছে 'ফুজুর' । আর 'ফুজুর' (Fujur) শব্দের অর্থ হলো আল্লাহদ্রোহী । যে আল্লাহর বিধান নিজেও মানে না অন্যকেও মানতে দেয় না আসলে সেই ফুজুরের মধ্যে ডুবে রয়েছে । অবশ্য এক্ষেত্রে আল্লাহ বলেন :

فَاللَّهُمَّهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

“অতঃপর তাকে [মানুষকে] তার অসৎকর্ম ও তার সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন ।” (সূরা আশ-শামস, ৯১ : ৮)

মহান স্রষ্টা মানুষের মধ্যে ভালো ও মন্দ দু'রকম ইচ্ছা-আগ্রহ ও মনোভাব সৃষ্টি করেছেন । প্রত্যেক মানুষের অবচেতন মনে চরিত্র ও নৈতিকতার ব্যাপারে কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ এমন ধারণা মহান সৃষ্টিকর্তা দান করেছেন ।

ভালো চরিত্র ও ভালো আমল এবং মন্দ চরিত্র ও মন্দ আমল এক রকম হতে পারে না । কুকর্ম (ফুজুর) অবশ্যই খারাপ এবং মন্দ থেকে বেঁচে থাকা নিশ্চয়ই ভালো । ভালো ও মন্দ সম্পর্কে ধারণা মানুষের নিকট অজানা নয়; বরং মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির নিকট তা অতি পরিচিত । আল্লাহ তা'আলা জন্মগতভাবেই মানুষকে ভালো ও মন্দের স্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন ।

## Etymology of Taqwa

The term *taqwá* comes from the Arabic root W-Q-Y from the 8th form verb, *ittaqá* "be wary, Allahfearing." Taqwa is cognate to the Hebrew term תִּקְוָה *tikvah* ("hope"), deriving from the Semitic root Q-W-L.

## Meanings of Taqwa

আল কুরআনের বিভিন্ন অনুবাদকগণ তাকওয়ার অর্থ নিম্নরূপ করেছেন :

Fear of Allah	- Abdullah Yusuf Ali
Ward off evil	- M. Picthal
Guard against evil	- Shaker
To be conscious of Allah	- Muhammad Asad
Love and fear of Allah	- Dr. Muhammad Muhsin Khan
To be careful or to be protected or to be cautious	- Abu Bakr Karoli
Clinging to obedience to Allah and abandoning disobedience to Him	- Ibn Juzayy's

According to some Muslim linguists, it is better to use the Quranic term “Taqwa” and keep it as it is.

## তাকওয়া কথাটার মূল (Root)

তাকওয়া শব্দটির উৎপত্তি আরবী ওয়াও কাফ ইয়া এই তিনটি অক্ষর দ্বারা গঠিত “ওয়াকা” মূল (root) থেকে যার অর্থ ঢাল (shield). এর ক্রিয়া বা verb হচ্ছে “ইত্তাকি” যার অর্থ হচ্ছে সাবধান হওয়া, সতর্ক হওয়া অথবা সুরক্ষিত হওয়া/থাকা। তাকওয়া হচ্ছে এক ধরনের কম্পাস (compass) যা মানুষের হৃদয়কে আল্লাহর দিকে পরিচালিত করে। ব্যাপক অর্থে তাকওয়া হলো নিজের ব্যবহারকে/কর্মকাণ্ডকে এমন সংযতভাবে পরিচালনা করা যাতে সর্বাবস্থায় আল্লাহর অস্তিত্ব ও নৈকট্য অন্তরে অনুভব করা যায় এবং এরই মাধ্যমে নিজের সকল ভুলত্রুটি সংশোধন করা যায়।

اتقى المطر to seek shelter from rain

وقى waqy: protection; safeguard

وقاء waqa, wiqa: protection; prevention

وقاية wiqaya(tun): a preservative

واق waaqin: preserving; guarding; protecting; preventive;

preservative; guardian; protector [Qur'an 13:34, 13:37, 40:21]

## What is Taqwa?

**Taqwa is =**

Taqwa is an Arabic word. It is the state of heart that motivates virtuous conduct and prevents evil action.

Love of Allah

+

Fear of Allah



Leads to

**Taqwa (Self-restraint)**

**Taqwa is the ability to safe-guard**

### তাকওয়া সম্পর্কে Wikipedia'র বক্তব্য

তাকওয়া (আরবী আত-তাকওয়া) হচ্ছে একটা ইসলামী ধারণা বা বিশ্বাস যা আল্লাহ সম্পর্কে সচেতনতা (Allah-consciousness) বোঝায়। কুরআনে ব্যাপকভাবে তাকওয়া বলতে being conscious of Allah (আল্লাহ সম্পর্কে সচেতনতাই) বলা হয়েছে; এবং আরো বলা হয়েছে যে তাকওয়া হলো আত্মার বিনাশকারী সব কাজ থেকে বিরত থাকা এবং একই সাথে সচেতনভাবে নিজেকে (আধ্যাত্মিকভাবে) শক্তিশালী করার নিয়ত প্রচেষ্টা।

## তাকওয়া কী?

ভাষাগতভাবে তাকওয়া কথাটার অর্থ হচ্ছে : ধৈর্য; ভয় ও নিবৃত্তি; পরিহার করে চলা। কিন্তু ইসলাম ধর্মে এর অর্থটা ভিন্ন মাত্রার। সেখানে তাকওয়া হলো হৃদয়ের এমন একটা অবস্থা যেখানে আল্লাহর স্মরণ সদা উপস্থিত থাকে, যা তাকে আমলে সলেহা (সৎকাজ) করতে উৎসাহিত করে এবং একই সংগে আমলে সাইয়েআহ (অসৎকাজ) করতে নিষেধ করে। তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহর রোষ ও শাস্তির বিরুদ্ধে ঢালস্বরূপ।

আল্লাহ বলেন : *হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর, এবং [তোমরা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী] মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১০২)*

এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইবনে মাসুদ রাদিআল্লাহু আনহু বলেছেন যে- এই নির্দেশের অর্থ হলো :

- (ক) আল্লাহকে মানতে হবে;
- (খ) তাঁর অবাধ্য হওয়া চলবে না;
- (গ) সর্বদা তাঁকে স্মরণে রাখতে হবে, তাঁকে ভুললে চলবে না;
- (ঘ) তাঁর শুকরিয়া আদায় করতে হবে, তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া চলবে না।

তাল্ক ইবনে হাবীদ (একজন তাবেঈ) বলেছেন : তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য, তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহর অবাধ্যতা পরিত্যাগ করা। (সহীহ)। সূত্র শাইখ আল-আলবানী, ইবনে আবি শাইবাহ রচিত কিতাবুল ঈমান থেকে। আল্লাহর দৃষ্টিতে তাকওয়াই হচ্ছে বান্দার আনুগত্য বিচারের একমাত্র মাপকাঠি/ মানদণ্ড (criterion). কুরআনে আল্লাহ বলেন :

*“হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সংগে পরিচিত হতে পার। তোমাদের কাছে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।” [সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১৩]*

মানুষে মানুষে জাতিগত, বর্ণগত, শ্রেণীগত সব ভেদাভেদ আল্লাহ দূর করে দিয়েছেন, ধার্য করেছেন একটি মাত্র মানদণ্ড উৎকৃষ্টতা বিচারের, আর সেটা

হলো মানুষের তাকওয়া। রসূলুল্লাহ ﷺ এর সকল শিক্ষার মূল কথাই ছিল তাকওয়া। যখন তিনি তাঁর কোন সাহাবীকে কোন সামরিক অভিযানে পাঠাতেন তখন তিনি তাকে তাকওয়ার কথা সদা স্মরণে রাখতে নির্দেশ দিতেন, সেই সৈন্যবাহিনীকেও ঐ একই উপদেশ দিতেন।

রসূলুল্লাহ ﷺ -এর পরবর্তী ইসলামের নেতাগণও একইভাবে তাকওয়ার অনুসারী ছিলেন। খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু তাঁর পুত্র আবদুল্লাহকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন : “অবশ্যই আমি তোমাকে মহান আল্লাহর তাকওয়া স্মরণে রাখতে নির্দেশ দিচ্ছি কারণ যেকেউ আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তাকে রক্ষা করেন; যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দেয়, আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করেন; যেকেউ আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তিনি তার তাকওয়া বৃদ্ধি করেন।”

## তাকওয়ার কিছু Spiritual দিক

তাফসীর ইবনে কাসীর-এর এক ব্যাখ্যা অনুসারে অপছন্দনীয় বস্তু বা ব্যবহার পরিত্যাগ করা বা পরিহার করার নামই তাকওয়া। খলিফা উমর ইবনে খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু একবার [বিখ্যাত সাহাবী] উবাই ইবনে কাআব-কে তাকওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করলে উবাই বলেছিলেন : “আপনি কি কখনো কাঁটায় ভরা রাস্তা দিয়ে হেঁটেছেন?” উমর বললেন : “হ্যাঁ, হেঁটেছি বৈকি!” উবাই তখন জানতে চাইলেন : “কী করে আপনি সেই রাস্তাটা অতিক্রম করেছিলেন?” উমর বললেন : “আমি আমার জামার হাত গুটিয়ে সাবধানতা অবলম্বন করে পরিশ্রম করে রাস্তাটা পার হয়েছিলাম।” তখন উবাই বললেন : “ঐ হচ্ছে তাকওয়া। সকল গুনাহের কাজ থেকে সর্বদা নিজেকে বাঁচিয়ে চলা এবং অক্ষত (বেগুনাহ/নিষ্পাপ) অবস্থায় যাত্রা শেষ করতে পারাটাই হচ্ছে তাকওয়া।”

সূরা বাকারা (২), আয়াত ৫ [যেখানে আল্লাহর নির্দেশিত পথের উল্লেখ রয়েছে] এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইবনে আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেছেন : “মুন্ডাকী হচ্ছে তারাই যারা শিরক থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে চলে এবং আল্লাহর আদেশ মেনে চলে।” তিনি আরো বলেছেন : “মুন্ডাকী তারাই যারা আল্লাহর শাস্তিকে ভয় পায়, যারা জেনে শুনে সৎপথ থেকে বিচ্যুত হয় না। তারা আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশা করে আল্লাহর বাণীতে বিশ্বাস রেখে।”

তাকওয়া ইসলামের একটা বিশেষ ধরনের পরিভাষা (terminology) যার অর্থ নিয়ে আলেমগণ (ইসলামী চিন্তাবিদগণ) বহু আলোচনা করেছেন, বহু বইপত্রে তাঁদের ব্যাখ্যা প্রকাশ করেছেন, এবং আলোচনা আজো অব্যাহত রয়েছে। যার ফলে আমরা নূতন নূতন অর্থ খুঁজে পাচ্ছি এই “তাকওয়া” কথাটির।

একটা যুগ ছিল যখন তাকওয়া বলতে শুধুমাত্র আল্লাহর ভয় (আল্লাহভীতি), Fear of Allah-ই বোঝানো হতো। কোন কোন মহল আজো এই আল্লাহভীতি নিয়েই সন্তুষ্ট, এর বাইরে তাঁরা অন্য অর্থ খুঁজতে নারাজ। অধিক আলোর সন্ধানী যারা তাঁরা আরো এগিয়ে গিয়ে বলছেন যে না, তাকওয়া শুধু আল্লাহভীতিতেই সীমাবদ্ধ নয়, তাকওয়ার পরিধি আরো ব্যাপক যার আওতায় আল্লাহ কে সেই পরিচয় জানা এবং আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলাও অন্তর্ভুক্ত, আল্লাহভীতি তো অবশ্যই রয়েছে।

আর একদল চিন্তাবিদ এখানেও থামতে রাজী নন, কারণ তাঁরা খুঁজে বের করেছেন কুরআনের সেই আয়াত যেখানে ইরশাদ হয়েছে “বল (হে মুহাম্মাদ)! যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” [সূরা আলে ইমরান : ৩১]

তাই তাঁরা তাকওয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে আল্লাহকে ভালোবাসাকেও (Fear for Allah) যোগ করেছেন। ফলে অবস্থাটা এই দাঁড়ালো যে তাকওয়ার প্রাচীন সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে এখন দাঁড়িয়েছে যে : তাকওয়া হলো আল্লাহর পরিচয় জানা (তাঁর তাওহীদে ঈমান আনা)

- ১) আল্লাহকে ভয় করা
- ২) আল্লাহর আদেশ-নিষেধ বিনা শর্তে মানা
- ৩) আল্লাহকে ভালোবাসা।

তাকওয়ার ক্ষেত্রটা বহু বিস্তৃত এবং এখন তাকওয়া কি বস্তু সেটা বোঝার অস্পষ্টতাটা দূর হয়ে গেছে। তাকওয়া আজ আর অবোধ্য কিছু নয়, তাই তাকওয়া অবলম্বন করার কাজটা সহজ হয়েছে। এখন বাকি শুধু অনুশীলন, চেষ্টা। আমরা জানি সকল মানবশিশু তার ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তাদের বাবা-মা তাদেরকে খৃষ্টান অথবা ইহুদি, অথবা অগ্নিপূজক/মূর্তিপূজক ইত্যাদিতে পরিণত করে।

এই “ফিতরত” কথাটার অর্থ হচ্ছেঃ এক আল্লাহর উপর ঈমান ও তাঁর ইবাদত । আল্লাহর তাওহীদে ঈমান এবং সেই অনুসারে জীবনযাপন । এই শিক্ষাটা শিশুটিকে দেয়ার গুরুদায়িত্ব মা-বাবার উপর বর্তায় কারণ সে তখন ভিন্নমুখী কোন চিন্তা বা ideology থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে । সুতরাং মা-বাবাকেই গুরুতে তাকওয়াবান (মুত্তাকি) হতে হবে এটা একটা অনশীকার্য সত্য ।

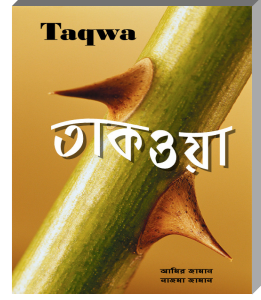
তাকওয়াবিহীন বান্দা কখনো তার ‘মনযিলে মকসূদ’ (আল্লাহর নৈকট্য ও ক্ষমা) হাসিল করতে পারে না কারণ সে তখন থাকে দিশাহারা । যে ঠিকানা জানা নেই সেই ঠিকানায় যেমন পৌছা অসম্ভব, ঠিক তেমনি তাকওয়া নামক আলোটি ক্লবের ভেতরে সর্বক্ষণ জ্বলতে না থাকলে চতুর্দিকে বাতিলের অন্ধকারের প্রভাব কাটিয়ে উঠা সম্ভব নয়, হাক্ বা সত্যের দেখা পাওয়াও সম্ভব নয় । একথা তো সত্য যে গভীর অন্ধকারে কেউ পথ চিনে চলতে পারে না কারণ তখন তার জন্যে উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব অথবা পশ্চিম কোন দিকই নির্ণয় করা সম্ভব হয় না, সব অগ্রগতি তখন রুদ্ধ হয়ে পড়ে ।

তাকওয়া হচ্ছে আলো ও সাগরের তীরের সন্ধানকারী একটা Lighthouseও বটে যে গভীর অন্ধকার সমুদ্রে পথহারা নাবিককে শক্ত স্থলভাগের নিরাপত্তার সন্ধান দেয় । তাকওয়া একটা Compassও বটে কারণ সে বান্দাকে সদাসর্বদা আল্লাহ-অভিমুখী করে রাখে, শয়তান বা পরিবেশ তাকে বাতিলপন্থী কোন চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত করতে অথবা পথভ্রষ্ট করতে পারে না । তাকওয়া হচ্ছে মযবুত ঈমানের নিদর্শন । তাকওয়া হচ্ছে মাঝির হাতের হাল যার সঠিক চালনায় নৌকা তার গন্তব্যে পৌঁছে । হালবিহীন নৌকা দিশাহারা হয়ে নদীতে ভেসে বেড়ায় ।

তাকওয়া হচ্ছে একটা দুর্ভেদ্য বর্ম, a strong shield, যা বান্দাকে গুমরাহীর শত আক্রমণ ও কুপ্রভাব থেকে তাকে আত্মরক্ষার ক্ষমতা প্রদান করে । তাকওয়া বান্দাকে সিরাতুল মুস্তাকীমের উপর দৃঢ় পায়ে চলতে সাহায্য করে, সে তখন আল্লাহকে ছাড়া জগতের আর কোন শক্তিকেই ভয় পায় না বা অন্য কারো ইবাদতও করে না । তার মনে তখন অপার শান্তি (সুকুন) বিরাজ করে । আল্লাহকে স্মরণ রাখলে তবেই কলবের শান্তি-স্বস্তি লাভ করা যায়, আল্লাহ আমাদের এই আশ্বাস দিয়েছেন [সূরা রা’দ (১৩), আয়াত ২৮] আল্লাহর নৈকট্য (কুরবাত) লাভ করতে হলে তাকওয়ার কোন বিকল্প নেই এবং আল্লাহ এই আশ্বাসও দিয়েছেন যে মুত্তাকিরা থাকবে জান্নাতে [কুরআন ৩৮ : ৪৯, ৫০; ১৫ : ৪৫, ৪৬]



## তাকওয়ার গভীরতার উপর বিশ্লেষণ



### তাকওয়ার বিশ্লেষণ

আল কুরআনুল কারীমে আল্লাহ বারবার আমাদের অভয় দিয়েছেন যারা মুত্তাকী তাঁদের কোন ভয় নেই, তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বা তাঁদের প্রতি কোন অবিচার করা হবে না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে মুত্তাকী কারা? মুত্তাকী তাঁরা যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জীবন গঠন ও পরিচালনা করে। এবার স্বভাবতঃই তাকওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে মন আনচান করে। মূলতঃ তাকওয়ার প্রধানত চারটি অংশ :

১. আল্লাহ [বিষয়ক] সচেতনতা (Allah Consciousness)
২. আল্লাহ ভীতি (Fear of Allah)
৩. আল্লাহর আনুগত্য (Obeying Allah)
৪. আল্লাহ প্রেম (Love for Allah)

#### ১. আল্লাহ [বিষয়ক] সচেতনতা (Allah Consciousness)

প্রথম অংশটি হচ্ছে তওহীদ অর্থাৎ আল্লাহর অস্তিত্ব, অসীম ক্ষমতা ও তাঁর একক সত্ত্বা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ ও দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন যে একমাত্র তিনিই সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা, শাস্তিদাতা, পুরস্কারদাতা, জীবন-মৃত্যু দাতা এবং দুনিয়া ও আখিরাতের একমাত্র মালিক। মৃত্যুর পর তাঁর কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে এবং জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ডের হিসাব দিতে হবে। তাঁর কোন শরীক বা অংশীদার নেই। এসবকে মনে প্রাণে বিশ্বাস এবং কর্মে বাস্তবায়ন

করার মনোভাবকেই আল্লাহ [বিষয়ক] সচেতনতা বা Allah Consciousness বলে অভিহিত করা যায়। একজন মুত্তাকী সকল অবস্থায় আল্লাহর কথা স্মরণ রাখবে, ফলে তার সকল কাজকর্মে আল্লাহর ইচ্ছা ও আদেশ নির্দেশের প্রতিফলন ঘটবে।

## ২. আল্লাহ ভীতি (Fear of Allah)

দ্বিতীয় অংশটি হচ্ছে পৃথিবীর বুকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী যে আল্লাহ তাঁকে ভয় করতে হবে, সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। আল কুরআনে আল্লাহ আমাদের বারবার সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, আমাকে ভয় কর এবং আমার আদেশ পালন কর যাতে আমার অবাধ্যতার শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে পার, আমার রহমত থেকে বঞ্চিত না হও। এটাকে Fear of Allah বলা চলে। (এই ভয় বলতে এখানে হিংস্র প্রাণী বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা নয় বরং আল্লাহর আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে সদাজাগ্রত থেকে তা জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করা না হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে শাস্তি অবধারিত সে শাস্তির ভয়ের কথা বলা হয়েছে।)

## ৩. আল্লাহর আনুগত্য (Obeying Allah)

তাকওয়ার তৃতীয় অংশটি হচ্ছে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ বিনা প্রতিবাদে, বিনা শর্তে খুশী মনে স্বীকার করে নিয়ে তা পালন করা এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। সেইসাথে পরিবারের সকল সদস্যদেরও তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। কেননা পরিবারের সদস্যদের আনইসলামী কার্যকলাপের জন্যেও পরিবারের কর্তা এবং কত্রীকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে, একথাও স্মরণে রাখতে হবে। এই অংশটিকে আমরা Obeying Allah বলতে পারি।

## ৪. আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা বা প্রেম (Love for Allah)

তাকওয়ার চতুর্থ অংশটি হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা- (Love for Allah) আল্লাহকে আমাদের ভালোবাসতে হবে। শুধু ভয় করলেই চলবে না।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, তাকওয়া বুঝাতে সাধারণতঃ আল্লাহ-ভীতি (Fear of Allah) বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে যা তাকওয়ার পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা নয়। কেউ কেউ আবার তাকওয়া বলতে “সাবধানতা” বোঝাতে চান। সেটাও ঠিক নয়। তাকওয়া বলতে আলোচিত চারটি অংশকেই বুঝতে হবে, এবং তা জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বিনা শর্তে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করাই হলো - Complete surrender to the wishes of Allah.

## “তাকওয়া” ও আল্লাহকে ভালোবাসা

তাকওয়ার চারটি অংশ উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, তবে চতুর্থ অংশ আল্লাহকে ভালোবাসার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টা একটু অধিক ব্যাখ্যার দাবী রাখে।

‘তাকওয়া’ কথাটা সমগ্র কুরআনে বারবার উল্লেখ একজন মু’মিনের জীবনে তাকওয়া যে গুরুত্বপূর্ণ সেটারই সাক্ষ্য বহন করে। এত অধিকবার তাগাদা এসেছে একমাত্র সলাতের ব্যাপারে – এক হিসাব অনুযায়ী সলাতের জন্যে সরাসরি তাগিদ এসেছে অন্ততঃ ৭৮ বার এবং ইংগিতে আরো ১৯ বার। কুরআনের সকল অনুবাদেই (অতীতের এবং বর্তমানের) তাকওয়া কথাটার অর্থ করা হয়েছে -

(ক) আল্লাহ-ভীতি/আল্লাহকে ভয়/Fear of Allah অথবা

(খ) Allah Consciousness

অনুবাদগুলো সঠিক, কোন ভুল নেই তাতে। তবে ভয়ের পাশাপাশি আল্লাহকে ভালোবাসতে হবে একথাটা আল্লাহ একাধিকবার কুরআনে উল্লেখ করেছেন যা ভয়ের ভারী পাল্লার দাপটে দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। এবার আয়াতগুলো দেখি -

“তথাপি মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ ছাড়া অপরকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে এবং আল্লাহকে ভালোবাসার ন্যায় ভালোবাসে; কিন্তু যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসায় তারা সুদৃঢ়।” (সূরা বাকারা, ২ : ১৬৫)

“বল (হে মুহাম্মাদ), তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৩১)

“অতঃপর তুমি [মুহাম্মাদ] কোন সংকল্প করলে আল্লাহর উপর নির্ভর করবে; যারা [আল্লাহর উপর] নির্ভর করে আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন।” (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৫৯)

আয়াতগুলো থেকে একথা অতি স্পষ্ট যে তাঁকে ভয় করার পাশাপাশি আল্লাহকে ভালোও বাসতে হবে, তবেই তাঁর ভালোবাসা এবং ক্ষমা আশা করা যাবে। আল্লাহকে ভালোবাসা প্রকাশ পায় হাসিমুখে, কষ্ট সহ্য করে অথবা কিছু অর্থ-আরাম-আয়েস বিসর্জন (sacrifice) করেও তাঁর আদেশ পালনে অবিচল থাকার মাধ্যমে। যাকে ভালোবাসি তার জন্যে তো আমরা বিনা প্রতিদানেই অথবা বিনা তাগিদেই কত রকম sacrifice করে থাকি। তেমনি দীন-দুনিয়া, জন্ম-মৃত্যু ও জ্ঞান-জাহান্নামের একমাত্র মালিক আল্লাহকে তো অবশ্যই ভালোবাসতে হবে।

এটা একটা স্বাভাবিক মানবিক আচরণ যে যাকে আমরা ভালোবাসি তার নৈকট্য আমরা কামনা করে থাকি, আর যাকে আমরা ভয় করি তার থেকে দূরে সরে থাকতে চাই। কিন্তু এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে আল্লাহ এমন এক সত্তা যার কাছ থেকে দূরে সরে থাকার কোনই উপায় নেই, তাঁর সম্মুখীন আমাদের হতেই হবে। সুতরাং এটাই যুক্তিসংগত যে তাঁকে ভয়ও করতে হবে, আবার তাঁর সব আদেশ-নিষেধও যথাসাধ্য মেনে চলে তাঁর প্রতি আমাদের আনুগত্য এবং ভালোবাসাও প্রদর্শন করতে হবে। কারণ আল্লাহ শুধু শাস্তিদাতাই নন, তিনি কোমল-হৃদয় (ওয়াদূদ)ও বটেন।

## আল কুরআনে তাকওয়ার আলোচনা

কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মানুষের প্রতি তাকওয়া অর্জন ও তার সুফল সম্পর্কে বিশদ আলোচনা ও আদেশ-নির্দেশ স্থান পেয়েছে। তাকওয়া বলতে আল্লাহ-ভীতি, আল্লাহ-ভক্তি, ধার্মিকতা, সাবধানতা, সৎকাজে একাগ্রতা, পাপ কাজ বর্জন ইত্যাদি সবই বোঝানো হয়েছে।

আল্লাহর অমর অস্তিত্ব, সর্ববিষয়ে তাঁর অসীম ও একচ্ছত্র অংশীদারবিহীন আধিপত্য, তাঁর শাস্তির ভয়, তাঁর পুরস্কারের আশা— এগুলোর সবই তাকওয়ার আওতায় পড়ে। ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহর ভয়টা হচ্ছে একটা সতর্কতা যাতে—

- (১) তাঁর শাস্তি থেকে আত্মরক্ষা করা যায়
- (২) তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত না হতে হয়, এবং
- (৩) আল্লাহর মত আপনজনকে অসন্তুষ্ট না করা হয়।

তাকওয়াবান লোকদের (মুত্তাকীদের) অন্তরেই আল্লাহ ও তাঁর ভয় ও তার জন্যে ভালোবাসা সর্বদা বিরাজমান থাকে ।

তাকওয়ার এক অর্থ হলো আল্লাহকে ভয় করে চলা । সূরা আলে ইমরান (৩) এর ১০২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন : “হে মু’মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর ।”

কুরআনের একটি বাংলা অনুবাদে লক্ষ্য করলাম যে সেখানে যথার্থভাবে ভয় করার অর্থ এভাবে করা হয়েছে : যথার্থ ভয় করার ব্যাখ্যায় হাদীসে আছে, আল্লাহর অনুগত হবে, অবাধ্য হবে না; আল্লাহকে স্মরণ করবে, তাঁকে ভুলবে না; আল্লাহর কৃতজ্ঞ হবে, অকৃতজ্ঞ হবে না ।

সূরা আনআম (৬) এর ৩২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যে - “যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্যে আখিরাতের আবাসই শ্রেয় ।”

## তাকওয়া হচ্ছে অভ্যন্তরীণ গুণ

‘তাকওয়া’ মূলতঃ মানুষের একটি অভ্যন্তরীণ গুণ বিশেষ । যে মানসিক অবস্থা মানুষকে আল্লাহর ক্রোধ উদ্বেককারী ও অসন্তোষজনক কাজ হতে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে, তাকেই বলা হয় ‘তাকওয়া’ । এই গুণ যার মনে ফুটে উঠবে, তার আলোক-প্রভা সমগ্র জীবনকে উদ্ভাসিত করে তুলবেই । কিন্তু এটা উপস্থিত না থাকলেও বাহ্যিক তাকওয়া যতই পরিলক্ষিত হোক, তা আনুষ্ঠানিকতা মাত্র - তা অন্তঃসারশূন্য । এইরূপ তাকওয়া না আল্লাহর হক রক্ষা করতে পারে, না পারে মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টির হক রক্ষা করতে ।

মনের অভ্যন্তরীণ এই গুণ যখন দুর্বল হয়, তখন আমলের মধ্যে বিপর্যয় শুরু হয়ে যায় । আর মুসলিম উম্মাহর বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত হওয়ার অন্যতম কারণ এটাই । কাজেই এর সংশোধন ও পুনর্গঠনের জন্য এই গুণটি (আল্লাহকে ভয় করার মনোভাব) সকলের মনে প্রতিষ্ঠা করা একান্ত আবশ্যিক ।

## তাকওয়ার আরো ব্যাখ্যা

“বল (হে মুহাম্মাদ), পার্থিব ভোগ সামান্য, অকিঞ্চিৎকর এবং যে মুত্তাকী তার জন্যে পরকাল (আখিরাত-ই) উত্তম । তোমাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও যুলুম

করা হবে না।” (সূরা আন নিসা, ৪ : ৭৭; সূরা আত তাওবা, ৯ : ৩৮; সূরা আল আনআম, ৬ : ৩২)

“নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের পছন্দ করেন” (সূরা আত তাওবা, ৯ : ৪, ৭)

উল্লিখিত আয়াতগুলোতে আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়াতা’আলা বারবারই মুত্তাকীদের পছন্দ করার ঘোষণা দিয়েছেন। এখন আমাদের জানা প্রয়োজন মুত্তাকী কারা?

## মুত্তাকী কারা?

মুত্তাকী বলতে এমন ব্যক্তিদের বোঝানো হয়—

- ১) যারা আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে;
- ২) যারা রসূল ﷺ-এর নির্দেশ ও পছন্দ-অপছন্দ মেনে চলে;
- ৩) যারা সৎ কাজের আদেশ করে, অসৎ কাজে নিষেধ করে;
- ৪) যারা অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে না;
- ৫) যারা পার্থিব জীবন পরিচালনায় সাবধানতা অবলম্বন করে, অর্থাৎ যা ন্যায় তা করে, যা অন্যায় তা বর্জন করে;
- ৬) যারা সংযমী, মিতভাষী, মিতব্যয়ী, লোভ ও ক্রোধ নিবারণ করে চলে;
- ৭) যারা নিজের পরিবারের ইসলামী জীবনযাপনের প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখে;
- ৮) যারা সর্বদা হারাম-হালাল বেছে চলে;
- ৯) যারা সত্যবাদী, মিথ্যা থেকে দূরে থাকে;
- ১০) যাদের ঈমান ও আমল দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত;
- ১১) যারা আমলে সোয়ালেহা অবলম্বন করে (সর্বাবস্থায় সৎ জীবনযাপন করে);
- ১২) যারা তাদের হালাল রোজগার থেকে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে;
- ১৩) যারা অপচয়, অপব্যয় করে না;
- ১৪) যারা পাপ কাজ থেকে এবং ছোট-বড় সন্দেহজনক সকল প্রকার কাজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলে।

## মানুষের মনের ডেতরে বসবাস করে তিনটি ইচ্ছা শক্তি

- (ক) নফসে আম্মারা – কুপ্রবৃত্তি [দাস] – সূরা ইউসুফ, ১২ : ৫৩
- (খ) নফসে মুত্‌মাইন্না – সুপ্রবৃত্তি [নিয়ন্ত্রিত] – সূরা ফজর, ৮৯ : ২৭
- (গ) নফসে লাওয়ামা – অনুশোচনার প্রবৃত্তি – সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ : ২

এই নফসে আম্মারাকে দমন করতে পারলেই তাকওয়া অবলম্বনের পথ পরিষ্কার হয়। তবে কাজটা বড় কঠিন, বহু সাধনার দরকার। এজন্যে দরকার লোভ-মোহ মুক্ত হয়ে অনাড়ম্বর জীবনযাপন। ধনসম্পদের আধিক্য মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ধ্বংস করে দেয়, দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট করে, আখিরাতের কথা, এমনকি মৃত্যুর কথা পর্যন্ত ভুলিয়ে দেয়। অথচ কুরআন-হাদীসে আল্লাহ এবং তাঁর বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মাদ ﷺ বারবার মানুষকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, দুনিয়ার জীবন নয় আখিরাতের জীবনই উৎকৃষ্ট এবং চিরস্থায়ী। সেই জীবন লাভের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করাই উত্তম চেষ্টা।

## আত্মার পরিশোধন (Purification of the Soul)

একাজ সহজ হবে বিশুদ্ধ হৃদয় নিয়ে অর্থ বুঝে, অর্থ হৃদয়ংগম করে আল্লাহর কুরআন ও তাঁর রসূলের হাদীস পাঠ করে নিজ জীবনে তার বাস্তবায়ন করলে। সূরা জুমু'আ (৬২), আয়াত ২-তে আল্লাহ মানুষকে জানিয়েছেন যে -

আল্লাহ-ই উম্মী (অজ্ঞ)দের মাঝে তাদেরই মধ্যে থেকে একজন রসূল পাঠিয়েছেন যে তাদের নিকট আল্লাহর আয়াতসমূহ (অর্থাৎ কুরআন) পাঠ করে শোনায়ে, তাদের পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত, (wisdom/বিচক্ষণতা/ভাল-মন্দ পার্থক্যের জ্ঞান)। ইতিপূর্বে এরাইতো ছিল ঘোর অন্ধকারে। রসূল ﷺ আজীবন একাজগুলোই করে গিয়েছেন, তাঁর অনুসারীদের শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। এসবই তো আল্লাহর ইবাদত। আত্মার পরিশোধন বা আত্মশুদ্ধি (self purification) অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে যেসব কাজ তাহলো

- ১) আল্লাহর স্মরণে বাধা সৃষ্টিকারী সব কাজ থেকে দূরে থাকা।
- ২) দৈহিক, জৈবিক আনন্দ লাভে নিষিদ্ধ কাজ ও বস্তু থেকে দূরে থাকা।
- ৩) সকল প্রকার অর্জিত সাফল্যই আল্লাহর দান বলে স্বীকার করা।
- ৪) আমি অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এই মনোভাব পরিত্যাগ করা।
- ৫) জীবনের সর্বকর্মে ও ব্যাপারে আল্লাহর সন্তুষ্টিকেই প্রাধান্য দেয়া।
- ৬) আল্লাহর সৃষ্টিগুলোকে অধ্যয়ন করে নিজের ঈমানকে দৃঢ়তর করা।
- ৭) সদাসর্বদা মৃত্যুকে স্মরণে রাখা এবং মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত থাকা।

মনে রাখা দরকার যে তাকওয়া হচ্ছে জান্নাতের জীবনদায়িনী পানীয়; যে তার উৎসের সন্ধান পেয়েছে সে কতইনা ভাগ্যবান!

## তাকওয়ার নিদর্শনসমূহ

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই নিজের সম্পর্কে অবগত হতে সক্ষম যে, সে তাকওয়াশীল বা আল্লাহভীরু, না-কি তাকওয়াহীন ও এ বিষয়ে উদাসীন-শৈথিল্যপরায়ণ। অনুরূপভাবে অন্যদের পক্ষেও কতিপয় আলামত দেখে এ বিষয়টি জানা সহজ হয়। এখানে সেধরণের কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হলো :

**মুখের কাজ :** মানুষের মুখের কথাবার্তা ও ভাষায় বোঝা যায় যে, সে তাকওয়াশীল কি-না। কেননা তাকওয়া মানুষকে মিথ্যা কথা, গীবত বা দোষচর্চা, অপবাদ, চোগলখুরী এবং অশ্লীল ও অনর্থক কথাবার্তা বলা থেকে বিরত রাখে। পক্ষান্তরে জিহ্বাকে সর্বদা আল্লাহর যিকর, কুরআন তিলাওয়াত ও দ্বীনী জ্ঞান চর্চায় লিপ্ত রাখে।

**অন্তরের কাজ :** তাকওয়াশীল মানুষ অন্তরের কর্মকাণ্ডকে ভয় করে। ফলে তার হৃদয় থেকে শত্রুতা, রোধ ও অন্য মুসলিম ভাইয়ের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ দূরীভূত হয়। সেখানে জায়গা করে নেয় মুসলিম ভাইয়ের প্রতি নছীহত ও সদুপদেশ, তার প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনা।

**অপ্রকাশ্য কর্মকাণ্ড :** তাকওয়াশীল মানুষ গোপনে বা লোকচক্ষুর অন্তরালেও উত্তম ও জনকল্যাণকর কাজ ব্যতীত নিন্দিত ও ঘৃণিত কাজ করতে ভয় পায়। অন্যের প্রয়োজন ও চাহিদার প্রতি লক্ষ্য না করে নিজে পেট পুরে আহার করে না। বরং সে পরিমিত আহার করে এবং প্রতিবেশী অভাবী-দুস্থদের প্রতি খেয়াল রাখে।

**চোখের কাজ :** চোখ নিষিদ্ধ বিষয়ের দিকেই ধাবিত হয়। কিন্তু তাকওয়াশীল মানুষ স্বীয় দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করে। সে তার চোখকে হারাম থেকে ফিরিয়ে রাখার সর্বাঙ্গিক চেষ্টা করে। পক্ষান্তরে উপদেশ গ্রহণ, হালাল বা বৈধ এবং নেকী অর্জনের কাজে লিপ্ত রাখার চেষ্টা করে। তেমনি স্রেফ দুনিয়াবী কাজে নয়, বরং পরকালীন কাজে চোখকে নিয়োজিত রাখার চেষ্টা করে।

**পায়ের কাজ :** পা মানুষকে ভাল-মন্দ সকল কাজে সংশ্লিষ্ট স্থানে নিয়ে যেতে সহায়তা করে। তাকওয়াশীল মানুষ স্বীয় পাকে আল্লাহর অবাধ্যতা ও পাপের



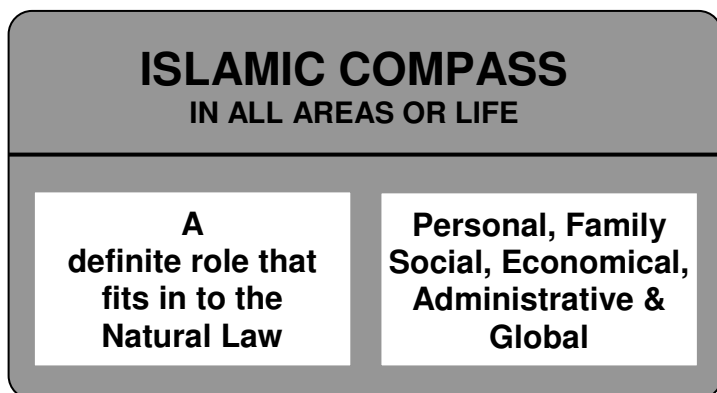
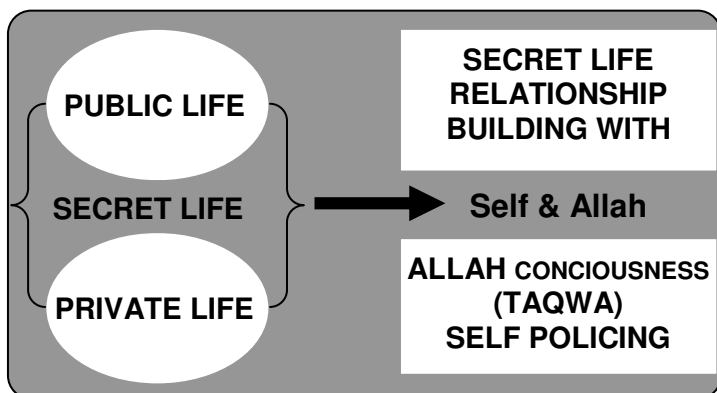
কাজের দিকে নিয়ে যেতে ভয় করে। বরং সে নেকীর কাজের দিকে স্বীয় পাকে চালিত করতে সচেষ্ট হয়।

**হাতের কাজ :** হাত মানুষের সকল প্রকার ভাল-মন্দ কাজ সম্পাদন করার মাধ্যম। তাকওয়াশীল মানুষ তাই নিজের হাতের কাজকে ভয় করে। সুতরাং সে হারাম ও নিষিদ্ধ কাজের প্রতি স্বীয় হৃদয়কে কখনও প্রসারিত করে না। বরং আল্লাহর নেকীর কাজের প্রতিই সে তার হাতকে প্রসারিত করে।

**আল্লাহর নির্দেশ পালন :** তাকওয়াশীল মানুষ সর্বদা আল্লাহর আদেশনিষেধের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে। সে নিজেকে সদা আল্লাহর আনুগত্যে নিরত রাখে এবং তাঁর নিষেধ থেকে নিজেকে বিরত রাখে। লৌকিকতা, লোকদর্শন ও নিফাকী বা কুটিলতা বাদ দিয়ে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ইবাদত করে ও তাঁর আনুগত্যপূর্ণ সকল কাজ সম্পাদন করে। এসব কাজ যারা সঠিকভাবে সম্পাদন করে, তারাই প্রকৃত মুত্তাকী।

## ইসলামিক কম্পাস (Compass)

কম্পাস যন্ত্রটা মানুষকে চলার পথের দিক নির্ণয়ে ও সঠিক গন্তব্যে পৌঁছতে সাহায্য করে। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দা মানুষদের ভালোবাসেন, তাদের পার্থিব জীবনে এবং পারলৌকিক জীবনে সাফল্য লাভ কামনা করেন। তাই তিনি তাঁর কুরআনে তাকওয়ার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করেছেন এবং মানুষকে তাকওয়ারূপী compassটি দান করেছেন যাতে তারা সর্বদা আল্লাহর রহমত ও গণ্যবকে স্মরণে রেখে তাদের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে, এমনকি রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়েও মুসলিম ও অমুসলিম সবার প্রতি ভালোবাসা, সুবিচার ও ন্যায়নীতিপূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত দেখিয়ে প্রকৃত ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে। সর্বক্ষণ যার অন্তরে তাকওয়ারূপী মানদণ্ডটি (compassটি) সচল থাকবে, আল্লাহর সাহায্য ও দয়া (দুনিয়া ও আখিরাতে) তার জন্যে অবধারিত। আমাদের অন্তরের তাকওয়ার কম্পাসটি চালু রাখি, তার নির্দেশ মেনে চলি, দেখবো আল্লাহর প্রসন্ন দৃষ্টির সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি।



External aspects of personal life are concerned with the body and its requirements. Some of them are

**Personal hygiene & cleanliness:**

Islam enjoins us to follow strict rules in all matters of personal hygiene and cleanliness. E.g. Ablution and cutting of nails etc.

**Food & drink:**

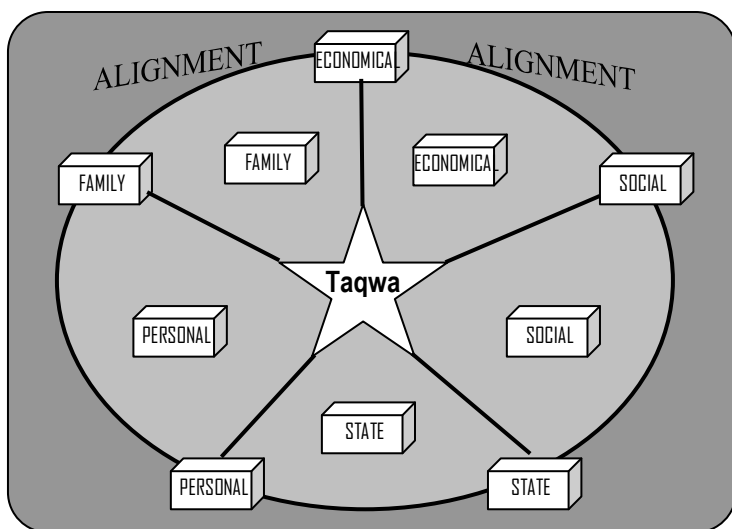
The dietary laws in Islam are quite detailed. Food can be halal or haraam i.e. lawful or unlawful. E.g. Intoxicants are prohibited in Islam.

**Recreation & Sports:**

Relaxation for body and mind is important, but certain limits have to be observed. Gambling and placing of bets are strictly prohibited.

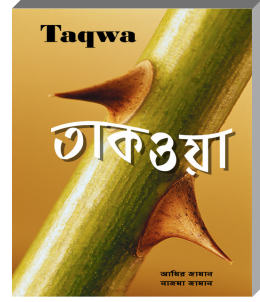
**Clothing & Adornment:**

Dress code is prescribed in Islam for both men and women.



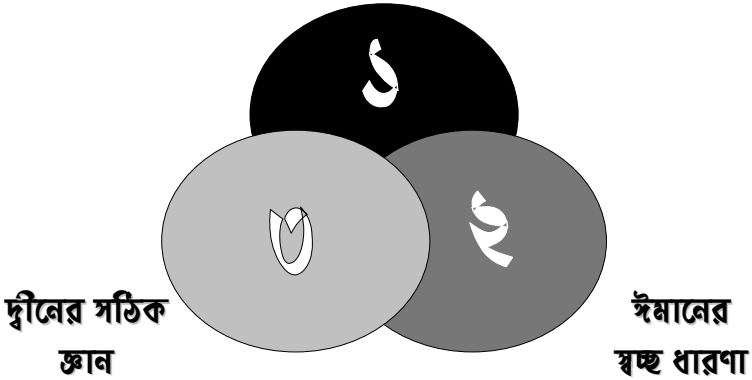
The above Principle (based on Taqwa) is to keep an Islamic compass always within us in all areas and activities of life.

## তাকওয়ার শাখা-প্রশাখা



তাকওয়া বুঝতে হলে ঈমানের স্বচ্ছ ধারণা এবং  
দ্বীনের সঠিক বুঝ থাকা জরুরী

তাকওয়া



উপরের ডায়াগ্রামের মতো এই তিনটি বিষয় একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। এই দুনিয়াতে এবং পরকালে সফলকাম হওয়ার জন্য এই তিনটি বিষয়ে পরিষ্কার জ্ঞান থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। আমি যদি সত্যিকারভাবে এই তিনটি বিষয় বুঝে থাকি তাহলে বুঝতে হবে যে এটিই হচ্ছে আমার জীবনে মহান আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে সবচেয়ে বড় নিয়ামত।

## সকল সমস্যার মূল হচ্ছে আংশিক বা ভুল ঈমান

### ঈমানের স্বচ্ছ ধারণা

মানব জীবনের যে গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়েই আলোচনা-পর্যালোচনা বা গবেষণা শুরু করা হোক তা প্রভাবিত হবে ঈমানী জ্ঞান, এর সঠিক উপলব্ধি (knowledge & understanding) ও জ্ঞানের গভীরতার উপর। যে কোন সমস্যা সমাধানে কিছু মৌলিক নীতিমালা মেনে চলতে হয়। মানব-সমস্যা বিশ্লেষণে ঈমানকে সামনে রেখেই যাবতীয় সূত্র, বিধি ও সমাধান হওয়ার নীতিমালা মেনে চলা কল্যাণকর। এর বাইরে যে সমাধানেরই চেষ্টা করা হোক তা হবে আংশিক, অপূর্ণাঙ্গ ও ক্ষণস্থায়ী। কারণ এতে সবচাইতে বড় ফ্যাক্টর ঈমানকে অগ্রাহ্য করে নিজের অজান্তে মানুষের ক্ষতি ডেকে আনা হয়। ফলে মানুষ কোন বিষয়ে আজ এক কথা বলে তো কাল আরেক সূত্র আবিষ্কার করে। আর ঈমান মানে আল্লাহর উপর অগাধ বিশ্বাস, মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি যে মৌলিক বিধি বিধান পাঠিয়েছেন তার উপরও সমভাবে বিশ্বাস স্থাপন। এটিই ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ দাবী।

আমরা যদি মানব জীবনের মৌলিক বিষয়ে (যেমন : এর শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থনৈতিক নীতিমালা, শ্রমনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রগঠন, অপরের কল্যাণ কামনা, পরিবার গঠন ইত্যাদি) যদি কোন আধুনিক ও যুগোপযোগী সমাধান বের করতে চাই তাহলে সেইগুলির ব্যাপারে আল্লাহর কোন নির্দেশনা আছে কিনা তা অবশ্যই শুরুতেই দেখে নিতে হবে। কারণ তা না হলে আমাদের ঈমান কেবল প্রশ্নের মুখোমুখি নয় বরং আল্লাহর নির্ভুল নির্দেশ অমান্য করে যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে তা হবে পুরো মানবজাতির উপর যুলুমের শামিল।

### আংশিক বা ভুল ঈমান

ঈমানদারগণের সকল ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক ব্যর্থতার জন্য দায়ী আংশিক বা ভুল ঈমান। ঈমানের প্রকৃত সংজ্ঞা, ঈমানের দাবী, এর ভিত্তি, ঈমানের শাখা প্রশাখা, ঈমান বৃদ্ধির উপায়, ঈমানকে সতেজ রাখার উপকরণ ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানের অভাব একজন ঈমানদারের ইহকাল ও পরকালকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এ বিষয়ে ভুল জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য সমাজকে সংক্রামিত করে, রাষ্ট্রীয় চরিত্রের উপরও এর ক্ষতিকর ছাপ ফেলে। ঈমানের বুঝ ও গভীরতার উপর নির্ভর করে মানুষের আচার-আচরণ ও সারাদিনের কর্মতৎপরতা। ফলে একজন ঈমানদার

কবির লেখনী অন্য যে কোন কবির লেখনী হতে সুস্পষ্টভাবে ভিন্ন হবে। সঠিক ঈমানের অধিকারী মন্ত্রী আর অপর মন্ত্রীদের কর্ম খুব সহজেই ভিন্ন হবে। একজন ঈমানদার ট্যাক্সি ড্রাইভার আরেকজন ঈমান বিহীন ট্যাক্সি ড্রাইভারের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ আলাদা হবে।

### ঈমানদারদের করণীয়

একজন ব্যক্তি মুসলিম হওয়ার পর তার সর্বপ্রথম দায়িত্ব ঈমানের পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়া। ঈমানদারদের উপর আল্লাহর হুক (অধিকার) কী কী তা জেনে নেয়া। জীবনের গতির সঠিক লক্ষ্য ঈমানের আলোকে ঠিক করে নেয়া, সফলতা ও ব্যর্থতার মাপকাঠি আল্লাহর দেয়া সংজ্ঞার আলোকে নির্ধারণ করা, ঈমানের সাথে সংগতি রেখে আনন্দ ও বেদনার সীমা জেনে নেয়া, ঈমানের মেজাজে বন্ধু ও শত্রুর বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা, প্রতিবেশীর অধিকার ও তাদের প্রতি আচরণ ইত্যাদি জেনে তদনুযায়ী কাজ করা, অন্যের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন হওয়া, ঈমানকে সবসময় সঙ্গে রাখা। বান্দার উপর আল্লাহর হকের ব্যাপারে, মাতা-পিতার অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে, ওয়াদা করার সময়, আমানত রক্ষার ক্ষেত্রে, ওজন করার সময়, ঋণ নেয়া ও পরিশোধের সময় – অর্থাৎ সকল সময় ঈমানকে সতেজ ও স্মরণে রেখে কাজ করা জরুরী।

দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায়কারী ব্যক্তির পক্ষে ঈমান সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকার কারণে ওজনে কম দেয়া সম্ভব। ঈমানের মৌলিক জ্ঞান না থাকার কারণে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে সিয়াম পালনকারীর পক্ষেও আমানতের খেয়ানত করা সম্ভব। হাজী হয়েও ওয়াদা খেলাফ করা মামুলী ব্যাপার হতে পারে, সব আনুষ্ঠানিক ইবাদত সম্পাদন করেও মিথ্যা বলা সম্ভব। পিতামাতার সম্ভৃতির প্রতি চরম অবহেলা, স্বামী-স্ত্রী একে অপরের হুক আদায়ে উদাসীনতা, গরীব আত্মীয়-স্বজনকে শুধু নামের জন্য দান সদাকা করা, মিসকিনের প্রতি অবজ্ঞা দেখানো এ ধরনের ব্যক্তিদের পক্ষে বিচিত্র কিছু নয়।

## দ্বীনের সঠিক উপলব্ধি

### দ্বীনের স্বচ্ছ ধারণা

দ্বীন শব্দটির প্রচলিত কিন্তু অপূর্ণাঙ্গ অর্থ হচ্ছে ধর্ম। এতে দ্বীনের পুরোপুরি অর্থ প্রকাশ পায়না। এর প্রকৃত অর্থ ব্যাপক। তবে সংক্ষেপে ও এককথায় দ্বীন

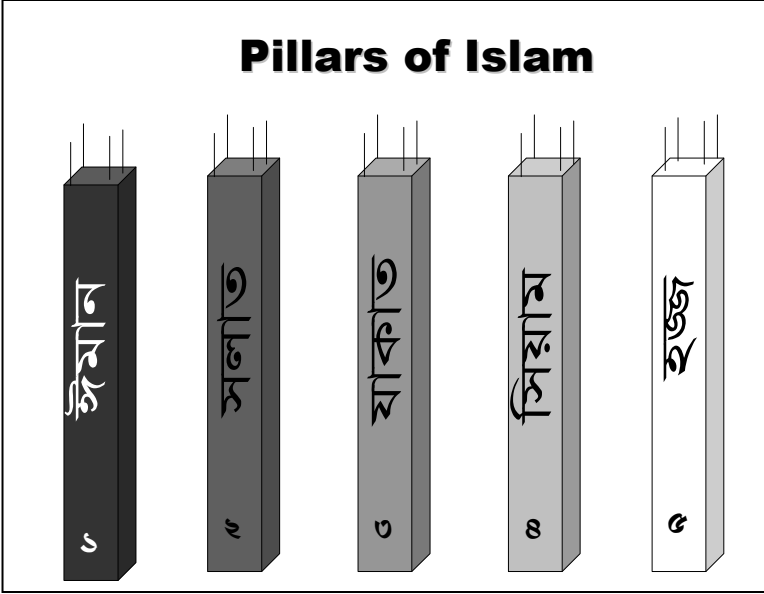
শব্দের অর্থ : জীবন-বিধান। আল কুরআনে দ্বীন শব্দটি কয়েক ধরনের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এর মধ্যে জীবনের সকল মৌলিক বিষয়ের নির্দেশনা পাওয়া যায়। মুসলিম জনগোষ্ঠীর বেশীর ভাগই আজ দ্বীন সম্বন্ধে কিছু না জেনেও জানার ভান করে নির্দিধায় দ্বীন বিরোধী কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বরং কেউ বাধা দিলে চরম অজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে তর্ক শুরু করে দেয়। কেবল সলাত-সিয়াম পালনকে দ্বীন মনে করছে। ব্যাপক জনগোষ্ঠী দ্বীনের অপেক্ষাকৃত কম ও অস্পষ্ট বিষয়কে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সুস্পষ্ট বিষয়াদির উপর স্থান দিয়ে বিকৃতির প্রতियোগিতায় বিভোর রয়েছে। সুতরাং কোন ব্যক্তিকে দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কে জানানো ও বুঝানোর জন্য নূন্যতম ভূমিকা রাখাও যে কত বড় পুণ্যের কাজ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

## দ্বীনের সঠিক জ্ঞান ও উপলব্ধি (Clear Knowledge & Understanding of Deen)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা যাকে কল্যাণ দান করতে ইচ্ছা করেন, তাকে তিনি দ্বীন সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান ও তা উপলব্ধি করার ক্ষমতা (clear knowledge & understanding) দান করেন। (মুসনাদে আহমাদ)

দ্বীনের সঠিক জ্ঞান ও উপলব্ধি লাভ আল্লাহর করুণা ও ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যে কেউ চাইলেই এটা পেতে পারে না। তবে অব্যাহত প্রচেষ্টা, প্রবল ইচ্ছা ও সর্বদা আল্লাহর অনুগত বান্দাগণের দ্বীনের জ্ঞান ও উপলব্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ ধরনের ভাগ্যবানদের সাথে কথা বললেই বুঝা যায় যে তারা অন্যদের চাইতে কিছুটা ব্যতিক্রম। তারা দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে গতানুগতিক ব্যাখ্যা দেন না। তারা দ্বীনকে খুব সুন্দর করে মানুষের নিকট উপস্থাপন করতে পারেন। তারা দ্বীন সম্পর্কে এক শ্রেণীর মানুষের মাঝে যে ভুল ধারণা বদ্ধমূল তা দূর করার চেষ্টা করেন। অজ্ঞ লোকদের থাবা হতে বের করে দ্বীনকে গণমানুষের সামনে সহজ সরল ভাষায় তুলে ধরেন। এ ধরনের ঈমানদারদের মাধ্যমে আল্লাহ দ্বীনের সৌন্দর্য ও শোভা সমাজে, রাষ্ট্রে ও সমগ্র দুনিয়াতে ছড়িয়ে দেন। খুঁটিনাটি বিষয়ের দিকে বেশী গুরুত্ব না দিয়ে বরং দ্বীনের মৌলিক বিষয়ের প্রতি নজর দেয়াই থাকে তাদের প্রধান লক্ষ্য। তারা সবাইকে সংগঠিত করার দিকেও মন দেন। মুসলিমদের ঐক্য তাদের স্বপ্ন, বিশ্বমুসলিমের ভ্রাতৃত্ব অর্জন তাদের আকাঙ্ক্ষা, মুসলিমদের শিক্ষা তাদের কর্মসূচী। দ্বীনের সঠিক বুঝ যিনি লাভ করেন তার মনের দুয়ার কখনো বদ্ধ থাকে না। জ্ঞানের পিপাসা ও জানার আগ্রহ তার অদম্য।

## Pillars of Islam



ঈমান, সলাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ এই পাঁচটি হচ্ছে ইসলামের মূল স্তম্ভ বা পিলার। সলাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ এই চারটি পিলার আবার নির্ভর করছে প্রথম পিলার ঈমানের উপর। কারো প্রথম পিলার যদি ঠিক না থাকে তাহলে পরের চারটি পিলার নড়বড়ে হয়ে যাবে। কারণ ঈমানের অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। মানুষের প্রতিটি কর্মের সাথে ঈমান জড়িত। কেউ যদি মনে করেন যে আমি শুধু সলাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ এই চারটিকেই পরিপূর্ণ ইসলাম মনে করে পালন করে যাবো তাহলে একটা বড় ধরনের গ্যাপ থেকে যাবে। এই চারটির বাইরে আরো অনেক কিছুই ইসলামে রয়েছে যা ঈমানের অংশ এবং ফরয। বুঝার সুবিধার্থে উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি যে একটি ঘর তৈরী করার জন্য কিছু পিলার দিলাম কিন্তু ছাদ, দরজা, জানালা, দেয়াল ইত্যাদি কিছুই দিলাম না তাহলে ঘরটির মধ্যে শুধু পিলার কয়টি দাঁড়িয়ে থাকবে এবং পরিপূর্ণ ঘর তৈরী হবে না। ইসলাম হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ ঘরের মতো যাকে বলা হয় পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এই পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় আল কুরআনে। তাই পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার উপকার পেতে হলে সলাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ এর বাইরে আল কুরআনের আরো সমস্ত নির্দেশও অবশ্যই মেনে চলতে হবে।



আরো একটি উদাহরণ দেয়া যাক; মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে যদি আমরা বলি সলাত, যাকাত, সিয়াম ও হাজ্জ হচ্ছে ৩৩% (পাশ মার্কস) এবং দ্বীনের অন্যান্য ফরয হুকুমগুলো ৬৭% যা সবই ঈমানের অংশ। এখানে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, শুধু সলাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ-ই ফরয ইবাদত নয়, এর বাইরে ইসলামে আরো অনেক কিছুই রয়েছে যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ফরয। যদি আমরা ইসলামের মূল কাজ মনে করে শুধু সলাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ এই চারটিকে ধরে থাকি অর্থাৎ ১০০-র মধ্যে যদি ৩৩ হয় টার্গেট বা পরীক্ষায় শুধু ৩৩-এর উত্তর দিয়ে থাকি তাহলে পাশ করা কঠিন হয়ে যেতে পারে এবং দ্বীন ইসলামের অন্যান্য ফরয বিষয়গুলোকে (৬৭%) গুরুত্ব না দেই তাহলে পরকালে পার পাওয়া কঠিন হয়ে যেতে পারে।

আমরা জানি ইবাদতের কোন % নেই। এই ক্ষেত্রে যেন আমরা কোন ভুল না বুঝি এবং misinterpret করার চেষ্টা না করি। ফরয ইবাদতের গুরুত্ব বুঝানোর সুবিদার্থে এই দুটি উদাহরণ টানা হয়েছে। নিম্নের এই সহীহ হাদীস থেকে আমরা বিষটি আরো পরিষ্কার হতে পারি :

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা কি জান দরিদ্র অসহায় ব্যক্তি কে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমাদের মধ্যে দরিদ্র অসহায় ব্যক্তিতো সে যার কোন টাকা পয়সা বা সম্পদ নেই। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আমার উম্মতের মধ্যে সত্যিকার দরিদ্র অসহায় হলো সেই ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন সলাত, সিয়াম ও যাকাতসহ অনেক ভাল কাজ নিয়ে উপস্থিত হবে, অথচ দুনিয়াতে বসে সে কাউকে গালি দিয়েছিল, কারো প্রতি অপবাদ দিয়েছিল, কারো সম্পদ আত্মসাত করেছিল, কারো রক্তপাত ঘটিয়েছিল, কাউকে মারধোর করেছিল ফলে তার নেক আমলগুলো থেকে নিয়ে তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পাওনা আদায় করা হবে। এভাবে যখন তার নেক আমলগুলো শেষ হয়ে যাবে ক্ষতিগ্রস্তদের দেয়ার জন্য আর কিছু থাকবে না তখন তাদের পাওনগুলো তাকে দেয়া হবে ফলে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। (সহীহ মুসলিম)

## তাকওয়া নিয়ে আরো কিছু আলোচনা

আল্লাহর ইবাদত অকৃত্রিমভাবে শুধুই আল্লাহর খুশীর জন্যে করতে হবে, লোক দেখানো ইবাদত নয় কারণ সেটা হবে রিয়া যা আল্লাহ খুব অপছন্দ করেন। এমন ইবাদত তাকওয়ার আওতায় পড়ে না। তাকওয়ার প্রকাশ ও প্রমাণ

কিভাবে হয় তা কুরআন ও হাদীস মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করে জেনে নিতে হবে, তারপর সেই অনুসারে আমল করতে হবে। ইখলাস (sincerity) হলো ইবাদতে অকৃত্রিমতা যা শুধু আল্লাহর তুষ্টির জন্যে করা হয়, আর সেখানেই তাকওয়া উপস্থিত থাকে কারণ তখন আল্লাহর সান্নিধ্য ও সেই সান্নিধ্যের সুগন্ধ অন্তরে অনুভব করা যায়। এক হাদীসের বর্ণনা অনুসারে জানা যায় যে রসূলুল্লাহ عليه السلام -এর কাছে কোন এক ব্যক্তি কিছু উপদেশ চাইলে তিনি বললেন : আল্লাহকে ভয় কর কারণ এটাই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে।

এই ভয়টাই হচ্ছে তাকওয়া। তাকওয়ার সুফল নিয়ে পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে। এবার কুরআনের কিছু আয়াত লক্ষ্য করি। তাকওয়া সংকর্ম করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে, এবং তাকওয়ার পুরস্কারস্বরূপ আল্লাহ বান্দার সেইসব সংকর্ম কবুল করেন।

১) সূরা আল-আহযাব, ৩৩ : ৭০-৭১

হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর। তা হলে তিনি তোমাদের কর্ম ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।

২) সূরা আল-হুজুরাত, ৪৯ : ১৩

তোমাদের মাঝে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী (তাকওয়ার অধিকারী)।

৩) সূরা আলে-ইমরান, ৩ : ৭৬

যে কেউ অঙ্গীকার পূর্ণ করলে এবং তাকওয়া অবলম্বন করলে আল্লাহ অবশ্যই মুত্তাকীদের ভালোবাসেন।

৪) সূরা তালাক, ৬৫ : ৫

যে আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার পাপ মোচন করবেন এবং তাকে মহাপুরস্কার দেবেন।

৫) সূরা আনফাল, ৮ : ২৯

হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে আল্লাহ তোমাদের দেবেন 'ফুরকান' [ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার ক্ষমতা]

তাফসীর ইবনে কাসীরে উল্লেখ করা হয়েছে যে 'ফুরকান' হচ্ছে বিপদ বা সংকট থেকে পরিব্রাণ পাওয়ার একটি পথ। মুজাহিদ আরো এগিয়ে গিয়ে বলেছেন :

‘দুনিয়া এবং আখিরাত এই উভয় জগতে পরিত্রাণ পাওয়ার রাস্তা।’ ইবনে আব্বাস বলেছেন : “মুক্তি (salvation)”; “সাহায্যপ্রাপ্ত হওয়া”। মুহাম্মাদ ইসহাক ফুরকান অর্থ করেছেন : “সত্য ও মিথ্যা নির্ণয়ের মানদণ্ড”।

সূরা হাদীদ (৫৭), এর ২৮ নম্বর আয়াতে তাকওয়ার (আল্লাহর ভয়ের) গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন :

হে মু’মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর (ইত্তাকুল্লাহ) এবং তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তাঁর অনুগ্রহে তোমাদিগকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন, আর দেবেন আলো (নূর) যার সাহায্যে তোমরা পথ চলবে এবং তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

## তাকওয়া আছে কী নেই তা বিচার ও যাচাই

ঈমানের দাবীদার দুই ব্যক্তির একজন সকালে ঘুম থেকে উঠেই ফযরের সলাত আদায় করলেন, অন্যজন তা করলেন না। যিনি ফযরের সলাত আদায় করলেন তার তাকওয়া আছে বলেই তিনি তা করলেন। কিন্তু যিনি তা করেননি ঈমানের দাবীদার হওয়ার পরও বুঝা গেল তার মধ্যে তাকওয়া বা আল্লাহভীতি তৈরী হয়নি যেমনটি হলে তিনি যে কোন মূল্যে সকালে সলাত আদায় করতেন। তেমনি এক ব্যক্তি কর্মক্ষেত্রে গিয়ে উপার্জনের সময় হালাল পথে আয় করেন। অন্যজন আয় রোজগারের সময় হালাল-হারাম দেখেন না। যে কোন ধরনের আয়ই তার পকেটে চলে যায়। এ ব্যাপারে তার মধ্যে নূন্যতম অনুশোচনা বা দুশ্চিন্তা নেই। আয়ের সুযোগ পেলেই তিনি তা লুফে নেন। তাহলে বলা যায়, আয় রোজগারের ক্ষেত্রে প্রথম জনের তাকওয়া থাকলেও দ্বিতীয় জনের নেই। এভাবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে মানুষ তার মধ্যে তাকওয়া আছে কি নেই তা নিজেই পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। আর তাদের উদ্দেশ্য করেই আল্লাহ বলেন :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকওয়াবানদের (মুত্তাকীদের) ভালোবাসেন।”

(সূরা আত তাওবা, ৯ : ৪)

“তারা যদি ঈমান আনতো ও তাকওয়া অবলম্বন করতো, তবে আল্লাহর কাছে তার যে প্রতিফল পাওয়া যেতো, তা তাদের জন্য বড়ই কল্যাণময় হতো। তারা যদি এটা জানতে পারতো!” (সূরা আল বাকারা, ২ : ১০৩)

এভাবে আল কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় তাকওয়া অবলম্বন, তাকওয়া অর্জন ও তাকওয়ার ভিত্তিতে ঈমানদারদের কর্ম পরিচালনার জন্য উৎসাহ, আদেশ ও নসিহত করা হয়েছে। ইসলামী সমাজে সকল ঈমানদারই নূন্যতম তাকওয়ার অধিকারী হয়। ঈমানদারের সবচাইতে বড় নৈতিক শক্তি হলো তার তাকওয়া। এ শক্তির বলেই সে দুনিয়ার আর কোন শক্তিকে ভয় করে না। ভয় করে কেবল তার মনিব (রব) মহান আল্লাহকে।

যে ব্যক্তি কুরআন থেকে হিদায়াত তথা সত্যের সন্ধান পেতে ইচ্ছুক, তাকে অবশ্যই কলুষমুক্ত নির্মল অন্তর নিয়ে কুরআন পড়তে হবে। এই ভীর্ণ, সতর্ক, সচেতন, সংবেদনশীল এবং উপদেশ গ্রহণে প্রস্তুত হৃদয়কেই কুরআন স্বীয় নূর ও হিদায়াত দ্বারা ভরে দেয়।

বস্তুত, বিবেকের সার্বক্ষণিক সচেতনতা ও সতর্কতা, চেতনা ও অনুভূতির স্বচ্ছতা, অব্যাহত আল্লাহ-ভীতি, নিরবচ্ছিন্ন সাবধানতা, জীবন পথের কন্টকসমূহ (পাপকাজগুলো) থেকে আত্মরক্ষার প্রবণতা-এ সবারই নাম তাকওয়া। জীবন পথের এই কাঁটাগুলো হচ্ছে প্রবৃত্তির কুৎসিত কামনা-বাসনা ও প্ররোচনা, অন্যায় লোভ-লালসা ও উচ্চাভিলাষ, ভয়-ভীতি ও শংকা, আশা পূরণে সক্ষম নয় এমন কারো কাছে মিথ্যা আশা পোষণ করা, ক্ষতি বা উপকার সাধনে সক্ষম নয় এমন কারো মিথ্যা ভয়ে আক্রান্ত হওয়া ইত্যাদি।

সুতরাং তাকওয়া হলো বিবেকের সচেতনতা, তাকওয়া হলো চেতনার এমন একটি অবস্থার নাম যা থেকে চিন্তা ও কর্মের উন্মোচ ঘটে, যার সাহায্যে মনের বিভিন্ন আবেগ ও বাহ্যিক অংগ-প্রত্যংগের বিভিন্ন তৎপরতার ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, যা গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহর সাথে মানুষের প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করে এবং যার সাহায্য পেয়ে মানবাত্মা আল্লাহর আরো নিকটবর্তী ও ঘনিষ্ঠ হয়।

## উদাহরণ

- ধরি আমি এলাকার মসজিদ কমিটির মেম্বর, এখন নিয়মিত সলাত আদায় না করলে কেমন দেখায় সেজন্য আমি পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করি। অথবা

- আমি এলাকার চেয়ারম্যান, হাজ্জ না করলে কেমন দেখায় সেজন্য আমি হাজ্জ করেছি। অথবা
- আমি ছেলেমেয়ে বিয়ে দিয়েছি এবং নানা-দাদাও হয়েছে এখন দাড়ি না রাখলে কেমন দেখায়, সেজন্য দাড়ি রেখেছি। অথবা
- আমি সমাজে পয়সাওয়ালা একজন মান্যগণ্য ব্যক্তি, মাঝে মধ্যে দান-সদাকা না করলে কেমন দেখায়, সেজন্য আমি মাঝে মধ্যে কিছু দান-সদাকা করি। অথবা
- যেমন, আমার মাথায় টাক, সেজন্য আমি সবসময় টুপি মাথায় দিয়ে রাখি। অথবা
- দেখা গেল আমার স্বামী ইসলামিক অর্গানাইজেশনের মেম্বর সেজন্য আমি পর্দা করি। অথবা
- আমি যখন কোন ইসলামী অনুষ্ঠানে যাই শুধু তখনই পর্দা করি এছাড়া অন্য সময় করি না। অথবা
- আমার স্বামী হাজ্জ করে এসেছেন এজন্য আমি যখন বাইরে যাই তখন পর্দা করে যাই। ইত্যাদি।

এই সিনারিওগুলোতে প্রতিটি কাজ করা হচ্ছে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে, কোন কাজই আল্লাহকে ভয় করে বা ভালবেসে করা হচ্ছে না, অর্থাৎ কোন কাজই তাকওয়ার উপর ভিত্তি করে করা হচ্ছে না। তাই এই সব লোক দেখানো ইবাদতের কোনটাই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে।

## তাকওয়া সম্পর্কে আল্লাহ বলেন

তাকওয়া শব্দটি আল কুরআনের বিভিন্ন সূরায় প্রায় ২৫১ বার এসেছে। এই শব্দটি কুরআনে এতোবার আসার উদ্দেশ্য আমরা খুব সহজেই অনুধাবন করতে পারি যে এটা মানব জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এই শব্দটি শুধু আল কুরআনেই নয় সহীহ হাদীসগুলোতেই বহুবার এসেছে। নিম্নে তাকওয়া সম্বলিত কিছু আয়াত তুলে ধরা হলো।

১. নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অধিক সম্মানিত যিনি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছু জানেন এবং সব বিষয়ে অবহিত। (সূরা আল হুজুরাত, ৪৯ : ১৩)
২. হে ঈমানদার লোকেরা! আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন লক্ষ্য করে যে, সে আগামীদিনের জন্য কী সামগ্রীর ব্যবস্থা করে রেখেছে। আল্লাহকেই ভয় করতে থাক। আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাদের সে সব আমল সম্পর্কে অবহিত যা তোমরা কর। (সূরা আল হাশর, ৫৯ : ১৮)
৩. হে ঈমানদার লোকেরা, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যাদর্শ লোকদের সঙ্গী হও। (সূরা আত তাওবা, ৯ : ১১৯)
৪. নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল ইলমসম্পন্ন লোকেরাই তাঁকে ভয় করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশক্তিশালী ও ক্ষমাকারী। (সূরা আল ফাতির, ৩৫ : ২৮)
৫. আল্লাহ তো তাঁদের সংগে রয়েছেন, যারা তাকওয়া সহকারে কাজ করে এবং ইহসান অনুসারে আমল করে। (সূরা আন নাহল, ১৬ : ১২৮)
৬. আর সফলকাম হবে ঐ সমস্ত লোক যারা আল্লাহ ও রসূলের হুকুম পালন করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর অবাধ্যতা হতে দূরে থাকে। (সূরা আন নূর, ২৪ : ৫২)
৭. রসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর। আর যা নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক। আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। (সূরা আল হাশর, ৫৯ : ৭)
৮. তোমরা যথাসম্ভব আল্লাহকে ভয় কর। আর শুন ও অনুসরণ কর এবং নিজের ধন সম্পদ ব্যয় কর, ইহা তোমাদের জন্যই কল্যাণকর। যে সকল লোক স্বীয় মনের সংকীর্ণতা হতে রক্ষা পেয়ে গেল, শুধু তারাই সফলকাম। (সূরা আত তাগাবুন, ৬৪ : ১৬)
৯. হে নাবী! আল্লাহকে ভয় কর এবং কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য করো না, প্রকৃতপক্ষে সব জ্ঞান ও বুদ্ধির মালিক তো আল্লাহই। (সূরা আল আহযাব, ৩৩ : ১)

১০. যারা নিজেদের অদৃশ্য আল্লাহকে ভয় করে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও অতি বড় সুফল। (সূরা আল মূলক, ৬৭ : ১২)
১১. হে ঈমানদারগণ, ধৈর্য অবলম্বন কর, বাতিলপন্থীদের মোকাবেলায় দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা প্রদর্শন কর, যুদ্ধের জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায় যে, তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ২০০)
১২. যেসব কাজ পূণ্য ও ভয়মূলক তাতে একে অপরকে সাহায্য কর, আর যা গুনাহ ও সীমালংঘনের কাজ তাতে কারো একবিন্দু সাহায্য ও সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় কর, কেননা তাঁর দণ্ড অত্যন্ত কঠিন। (সূরা আল মায়িদা, ৫ : ২)
১৩. হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা যখন পরস্পর গোপন কথা বল, তখন গুনাহ, বাড়াবাড়ি ও রসূলের নাফরমানির কথাবার্তা নয়-বরং সংকর্মশীলতা ও আল্লাহকে ভয় করে চলার (তাকওয়া) কথাবার্তা বল এবং সেই আল্লাহকে ভয় করতে থাক যার দরবারে তোমাদেরকে হাশরের দিন উপস্থিত হতে হবে। (সূরা আল মুজাদালা, ৫৮ : ৯)
১৪. তোমাদের উম্মত একই উম্মত, আর আমি তোমাদের রব। অতএব আমাকেই ভয় কর। (সূরা আল মু'মিনুন, ২৩ : ৫২)
১৫. (হে রসূল) বলে দাও দুনিয়ার জীবন সম্পদ খুবই নগণ্য। আর পরকাল একজন আল্লাহভীরু ব্যক্তির জন্য অতিশয় উত্তম। আর তোমাদের প্রতি একবিন্দু পরিমাণও যুলুম করা হবে না। (সূরা আন নিসা, ৪ : ৭৭)
১৬. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তার নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান কর এবং তার পথে চরম চেষ্টা সাধনা বা জিহাদ কর। সম্ভবতঃ তোমরা কল্যাণ লাভ করবে। (সূরা আল মায়িদা, ৫ : ৩৫)
১৭. হে ঈমানদার লোকেরা, আল্লাহকে ভয় কর এবং রসূলের প্রতি ঈমান আন। (সূরা আল হাদীদ, ৫৭ : ২৮)
১৮. আল্লাহকে ভয় কর, সম্ভবতঃ তোমরা কল্যাণ লাভ করবে। (সূরা আল বাকারা, ২ : ১৮৯)

১৯. হে ঈমানদার লোকেরা, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অগ্রো অগ্রসর হয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা আল হুজুরাত, ৪৯ : ১)
২০. হে মানবজাতি, তোমরা ভয় কর তোমাদের সেই রবকে যিনি তোমাদেরকে একটি নফস থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তা থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের দু'জন হতে অসংখ্য নারী-পুরুষ ছড়িয়ে দিয়েছেন। আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট দাবী করে থাক এবং আত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপারেও ভয় কর। আল্লাহ তোমাদের উপর প্রহরীরূপে আছেন। (সূরা আন নিসা, ৪ : ১)
২১. তোমরা ভয় কর সেই দিনের যেদিন কেউ কারো এক বিন্দু উপকারে আসবে না, কারো নিকট হতে কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবে না, কোন সুপারিশই কাউকে এক বিন্দু উপকার দান করবে না, আর পাপীগণ কোন দিক দিয়েও কিছুমাত্র সাহায্য প্রাপ্ত হবে না। (সূরা আল বাকারা, ২ : ১২৩)
২২. যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার মুক্তির পথ বের করে দেন এবং তার কল্পনাভীত উৎস থেকে তিনি তাকে রিযিক দেন। (সূরা আত তালাক, ৬৫ : ২-৩)
২৩. যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে (ভালো ও মন্দের মধ্যে) পার্থক্য করার যোগ্যতা ও শক্তি দান করবেন, তোমাদের থেকে তোমাদের গুনাহসমূহ দূর করে দেবেন এবং তোমাদের মাফ করে দেবেন। আর আল্লাহ বড়ই মহান। (সূরা আল আনফাল, ৮ : ২৯)
২৪. আর যারা সত্যসহ আগমণ করে এবং (যারা) সত্যকে সত্য বলে সমর্থন করে তারাই আল্লাহভীরু। (সূরা আয্ যুমার, ৩৯ : ৩৩)
২৫. তোমরা পাথেয় সঞ্চয় কর। সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া। আর হে বিবেকবানেরা, একমাত্র আমাকেই ভয় কর। (সূরা বাকারা, ২ : ১৯৭)
২৬. এবং আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রেখো, আল্লাহ সহিষ্ণু পরহেজগার আমলদারদের সাথে রয়েছেন। (সূরা আল বাকারা, ২ : ১৯৪)
২৭. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক/সত্য কথা বল। (সূরা আল আহযাব, ৩৩ : ৭০)



২৮. তোমরা আত্মপ্রসংশা করো না, আল্লাহ উত্তমরূপে জানেন মুত্তাকী কে (সূরা  
নাজম ৫৩ : ৩২) আল্লাহ মুত্তাকীদের সম্বন্ধে উত্তমরূপেই জানেন (সূরা  
আলে ইমরান ৩ : ১১৫)

## কুরআনে তাকওয়া অবলম্বন করার জন্যে বারবার তাগিদ

আল্লাহর তাওহীদে (অংশীদারবিহীন নিরংকুশ এককত্বে) বিশ্বাস যেমন  
ঈমানের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, ঠিক তেমনি তাঁকে ভয় করা  
(তাকওয়া)ও ঈমানের অপর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। আল্লাহ জানিয়েছেন  
যে তাকওয়া অবলম্বনে (আল্লাহকে ভয় করলে) ঈমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় [সূরা  
আনফাল (৮) : ২]

আবার আল কুরআনে আল্লাহ বারবার যারা তাকওয়া অবলম্বন করবে  
তাদের সম্পর্কে বলেন : [মুত্তাকী হবে] -

ক) তারা উন্নতি লাভ করবে (২ : ১৮৯)

খ) তারা আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা লাভ করবে (৪৯ : ১০)

গ) তাদের আল্লাহ সত্য ও মিথ্যা (হাক্ ও বাতিল) নির্ণয়ের

বিচক্ষণতা/ক্ষমতা দান করবেন, তাদের গুনাহগুলি মুছে দেবেন, এবং

তাদের ক্ষমা করে দেবেন। এবং আল্লাহ অতিশয় মঙ্গলময় (৮ : ২৯)

আল্লাহ আরো জানিয়েছেন যে তিনি মুত্তাকীদের পছন্দ করেন (৯ : ৪, ৭)  
এবং জান্নাতে তাদের স্থান সুনিশ্চিত (১৫ : ৪৫)

সমগ্র কুরআনে সর্বাধিক তাগাদা দেয়া হয়েছে সলাত কায়েম করার জন্যে  
(৯০ বারেরও বেশী), অন্যদিকে তাকওয়া অবলম্বন করার জন্যে তাগিদ  
এসেছে তার চেয়েও অনেক বেশী। ফাভাকুল্লাহ, ওয়াভাকুল্লাহ, ইভাকুল্লাহ,  
ওয়াখশাওনী, ওয়া খা-ফুনী ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁকে ভয়  
করার নির্দেশ দিয়েছেন মানবজাতিকে। আল্লাহর সন্তোষ লাভের উপায়  
হিসেবে ঈমান আনার পরই আল্লাহকে ভয় করার গুরুত্ব যে কত অধিক  
এত তাগাদার পর সেটা বুঝতে কারো কষ্ট হওয়ার কথা নয়। আল্লাহকে  
ভয় করার কথা কুরআনে কোথায় কোথায় আছে তা নীচের তালিকাতে

দেখি এবং তাকওয়া অবলম্বনে সদা তৎপর থাকি । আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের  
চেয়ে অধিক কাম্য আর কী হতে পারে বান্দার জীবনে?

সূরা নং	সূরার নাম	আয়াত	আল্লাহর নির্দেশ
১	বাকারা (২)	৪০	আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে না
২	বাকারা (২)	৪১	আমাকে ভয় কর, শুধুই আমাকে
৩	বাকারা (২)	১৫০	শুধু আমাকে ভয় করবে
৪	বাকারা (২)	১৮৯	আল্লাহকে ভয় কর যাতে উন্নতি লাভ করতে পার
৫	বাকারা (২)	১৯৪	আল্লাহকে ভয় কর
৬	বাকারা (২)	১৯৬	আল্লাহকে ভয় কর
৭	বাকারা (২)	১৯৭	আল্লাহকে ভয় কর
৮	বাকারা (২)	২০৩	আল্লাহকে ভয় কর
৯	বাকারা (২)	২২৩	আল্লাহকে ভয় কর
১০	বাকারা (২)	২৩১	আল্লাহকে ভয় কর
১১	বাকারা (২)	২৩৩	আল্লাহকে ভয় কর
১২	বাকারা (২)	২৩৫	আল্লাহ সম্পর্কে সতর্ক/সচেতন থাক/তাকে ভয় কর
১৩	বাকারা (২)	২৭৮	আল্লাহকে ভয় কর
১৪	বাকারা (২)	২৮২	আল্লাহকে ভয় কর
১৫	আলে ইমরান (৩)	৫০	আল্লাহকে ভয় কর
১৬	আলে ইমরান (৩)	১০২	হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর যে রকম ভয় করা উচিত, এবং মুসলিম (আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না ।
১৭	আলে ইমরান (৩)	১২৩	আল্লাহকে ভয় কর
১৮	আলে ইমরান (৩)	১৩০	আল্লাহকে ভয় কর
১৯	আলে ইমরান (৩)	১৭৫	আমাকে ভয় কর যদি তুমি ঈমানদার হও
২০	আলে ইমরান (৩)	২০০	আল্লাহকে ভয় কর যাতে তুমি উন্নতি লাভ করতে পার
২১	নিসা (৪)	১	আল্লাহকে ভয় কর
২২	নিসা (৪)	১৩১	আল্লাহকে ভয় কর
২৩	মায়িদা (৫)	২	আল্লাহকে ভয় কর, তিনি শাস্তি দানে কঠোর
২৪	মায়িদা (৫)	৩	আল্লাহকে ভয় কর
২৫	মায়িদা (৫)	৪	আল্লাহকে ভয় কর
২৬	মায়িদা (৫)	৭	আল্লাহকে ভয় কর
২৭	মায়িদা (৫)	৮	আল্লাহকে ভয় কর
২৮	মায়িদা (৫)	১১	আল্লাহকে ভয় কর
২৯	মায়িদা (৫)	৩৫	আল্লাহকে ভয় কর

সূরা নং	সূরার নাম	আয়াত	আল্লাহর নির্দেশ
৩০	মায়িদা (৫)	৪৪	আল্লাহকে ভয় কর
৩১	মায়িদা (৫)	৫৭	আল্লাহকে ভয় কর যদি তুমি ঈমানদার হও
৩২	মায়িদা (৫)	৮৮	আল্লাহকে ভয় কর যাঁর প্রতি ঈমান এনেছ
৩৩	মায়িদা (৫)	৯৬	আল্লাহকে ভয় কর যাঁর কাছে তোমাদের সমবেত করা হবে
৩৪	মায়িদা (৫)	১০০	আল্লাহকে ভয় কর
৩৫	মায়িদা (৫)	১০৮	আল্লাহকে ভয় কর
৩৬	মায়িদা (৫)	১১২	আল্লাহকে ভয় কর
৩৭	আনফাল (৮)	১	আল্লাহকে ভয় কর
৩৮	আনফাল (৮)	৬৯	আল্লাহকে ভয় কর
৩৯	তাওবা (৯)	১৩	আল্লাহকেই শুধু ভয় করবে যদি তোমরা মু'মিন হও
৪০	তাওবা (৯)	১১৯	হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর, এবং সত্যবাদী হও
৪১	হুদ (১১)	৭৮	আল্লাহকে ভয় কর
৪২	নাহল (১৬)	২	আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আমার প্রতি রুখু হও
৪৩	নাহল (১৬)	৫১	আমিই একমাত্র ইলাহ, আমাকে ভয় কর
৪৪	আমবিয়া (২১)	৪৮, ৪৯	তরাই মুত্তাকী যারা না দেখেই তাদের রবকে ভয় করে
৪৫	হাজ্জ (২২)	১	হে মানবজাতি! তোমাদের রবকে ভয় কর
৪৬	মু'মিনুন (২৩)	৫২	আমি তোমাদের রব, আমাকে ভয় কর
৪৭	নূর (২৪)	৫২	যে আল্লাহকে মান্য করে, তাঁর রসূলকে মান্য করে, এবং আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর কর্তব্য করে যায়, সেই সফলকাম হবে
৪৮	শু'আরা (২৬)	১০৮, ১১০	আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে মান (নাবী নূহ)
৪৯	শু'আরা (২৬)	১২৬, ১৩১	আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে মান (নাবী হুদ)
৫০	শু'আরা (২৬)	১৪৪, ১৫০	আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে মান (নাবী সালিহ)
৫১	শু'আরা (২৬)	১৬২	আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে মান (নাবী লূত)
৫২	শু'আরা (২৬)	১৭৯	আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে মান (নাবী শু'আইব)
৫৩	শু'আরা (২৬)	১৮৪	তাকে ভয় কর যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তীদেরও সৃষ্টি করেছেন (নাবী শু'আইব)

সূরা নং	সূরার নাম	আয়াত	আল্লাহর নির্দেশ
৫৪	আনকাবুত (২৯)	১৬	আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁকে ভয় কর (নাবী ইব্রাহিম)
৫৫	রু-ম (৩০)	৩১	আল্লাহর প্রতি রুযু হও এবং তাঁকে ভয় কর, সালাত কয়েম কর, মুশরিক হয়ো না
৫৬	লুকমান (৩১)	৩৩	হে মানবজাতি! তোমাদের রবের প্রতি কর্তব্য পালন কর
৫৭	আহযাব (৩৩)	১	হে নাবী! আল্লাহকে ভয় করুন
৫৮	আহযাব (৩৩)	৭০	হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর, এবং সঠিক কথা বল (অর্থাৎ সদা সত্য কথা বল)
৫৯	যুমার (৩৯)	১০	হে আমার দাস (বান্দা)গণ যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের রব (প্রভু)কে ভয় কর
৬০	যুমার (৩৯)	১৬	হে আমার দাস (বান্দা)গণ! আমাকে ভয় কর
৬১	যুখরুফ (৪৩)	৬৩	তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে মান (নাবী ঈসা)
৬২	হুজুরাত (৪৯)	১, ১০, ১২	হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর যাতে তাঁর কৃপা লাভ করতে পার
৬৩	কা-ফ (৫০)	৩৩, ৩৪	না দেখে যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্যে জান্নাত
৬৪	হাদীদ (৫৭)	২৮	হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর
৬৫	হাশর (৫৯)	৭	আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর
৬৬	হাশর (৫৯)	১৮	হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর
৬৭	মুমতাহানা (৬০)	১১	যে আল্লাহতে ঈমান এনেছ তাঁকে ভয় কর
৬৮	তাগাবুন (৬৪)	১৬	আল্লাহকে যথাসম্ভব ভয় কর
৬৯	মূলক (৬৭)	১২	না দেখে যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের জন্যে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার রয়েছে
৭০	নূ-হ (৭১)	৩	আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁকে ভয় কর, এবং আমাকে মান (নাবী নূহ)
৭১	নাযিয়াত (৭৯)	৪০, ৪১	আখিরাতে আল্লাহ সামনে দাঁড়ানোর ভয় যারা করে এবং পাপ কাজ করা থেকে বিরত থাকে, জান্নাত হবে তাদের বাসস্থান
৭২	বাইয়্যিনা (৯৮)	৮	যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের পুরস্কার হলো জান্নাত

## তাকওয়া সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

১. অতিয়া আস-সাদী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তি পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় যেসব কাজে গুনাহ নেই তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত আল্লাহভীরু লোকদের শ্রেণীভুক্ত হতে পারে না। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

**ব্যাখ্যা :** কখনও কখনও বৈধ কাজ অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই কোন মু'মিনের সামনে কেবল বৈধতার দিকটিই উপস্থিত থাকবে না বরং এই বৈধ কাজ কোথাও যেন হারাম কাজে জড়িয়ে পড়ার কারণ না হয় সেদিকেও তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

২. ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর নির্ধারিত রিযিক পূর্ণ মাত্রায় লাভ না করা পর্যন্ত কোন লোকই মারা যাবে না। সাবধান! আল্লাহকে ভয় কর এবং বৈধ পন্থায় আয় উপার্জনের চেষ্টা কর। রিযিক প্রাপ্তিতে বিলম্ব যেন তোমাদেরকে অবৈধ পন্থা অবলম্বনে প্ররোচিত না করে, কেননা আল্লাহর কাছে যা কিছু রয়েছে তা কেবল আনুগত্যের মাধ্যমে লাভ করা যায়। (ইবনে মাজাহ)

৩. আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত; তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন : সাবধান! অযথা ধারণা করা থেকে বিরত থাক। কেননা অযথা ধারণা পোষণ করা সবচেয়ে বড় মিথ্যা। মানুষের দোষ অনুসন্ধান করো না, পরস্পরের ত্রুটি অনুসন্ধান লেগে যেয়ো না। পরস্পর হিংসা পোষণ করো না, যোগাযোগ বন্ধ করো না। আল্লাহর বান্দারা ভাই ভাই হয়ে থাকো, যেভাবে তোমাদের হুকুম করা হয়েছে, এক মুসলিম আরেক মুসলিমের ভাই। সে তার উপর যুলুম করতে পারে না, তাকে লাঞ্ছিত করতে পারে না এবং অবজ্ঞা করতে পারে না। তাকওয়া ও আল্লাহভীতি এখানে (এই বলে তিনি তাঁর আংগুল দিয়ে বুকের দিকে তিন বার ইশারা করলেন)। কোন ব্যক্তির খারাপ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে অবজ্ঞা বা ঘৃণা করবে। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অন্য মুসলিমের রক্ত, মান-মর্যাদা ও ধন-সম্পদ হরণ করা হারাম। মহান আল্লাহ তোমাদের শরীর ও চেহারার দিকে দৃষ্টি দেবেন না, বরং দৃষ্টি দেবেন তোমাদের অন্তর ও আমলের প্রতি। (সহীহ মুসলিম)

৪. আবুযর রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত । রসূল ﷺ বলেছেন : আমি অদৃশ্য জগতের এমন সব বিষয় দেখতে পাই, যা তোমরা দেখতে পাও না, এমন সব আওয়াজ শুনতে পাই যা তোমরা শুনতে পাও না । আকাশ ‘চড়চড়’ করছে, আর ‘চড়চড়’ করাই স্বাভাবিক । আমি সেই মহান আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ, আকাশে এমন চার আস্তুল প্রশস্ত স্থান নাই যেখানে কোন না কোন ফিরিশতা আল্লাহর উদ্দেশ্যে মাথা রেখে সিজদায় পড়ে নাই । আমি যে সব বিষয় জানি তোমরাও যদি তা জানতে, তবে তোমরা খুব কমই হাসি-তামাশা করতে পারতে; বরং খুব বেশী করে কান্নাকাটি করতে এবং সুখ-শয্যায় স্ত্রীদের সাথে মিলন-স্বাদও গ্রহণ করতে পারতে না । তাছাড়াও তোমরা ভয়ে আল্লাহর দরবারে পরিত্রাণ চেয়ে কাতরভাবে বিলাপ করতে করতে জঙ্গল বা জনমানবশূন্য বালুকাময় মরুভূমির দিকে বের হয়ে যেতে - হাদীস বর্ণনাকারী আবুযর অতঃপর বলেন, হায়! আমি যদি এমন একটি গাছ হতাম যা কেটে ফেলা হত! (মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ) ।

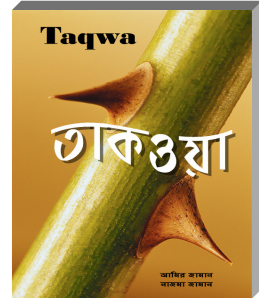
৫. হাসান রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ এর মুখ হতে এই কথা মুখস্ত করে নিয়েছি, যে জিনিস সংশয়ের মধ্যে ফেলে দেয় তা পরিত্যাগ কর, যা সন্দেহের উর্ধে তা গ্রহণ কর কেননা সততাই শান্তির বাহক এবং মিথ্যাচার সন্দেহ-সংশয়ের উৎস । (তিরমিযী)

৬. আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত । রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আয়িশা! ছোটখাট গুনাহর ব্যাপারেও সতর্ক হও, কেননা এ-জন্যও আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে । (ইবনে মাজাহ)

**ব্যাখ্যা :** কবীরা গুনাহ যেমন কোন মুসলিমের মুক্তি লাভকে বিপদগ্রস্ত করে দেয়, তেমনি ছোটখাট গুনাহও কম বিপদজনক নয় । ছোটখাট গুনাহ বাহ্যত হালকা বা তুচ্ছ মনে হলেও তা বারবার করার কারণে অন্তরাত্মায় মরিচা ধরে যায় এবং কবীরা গুনাহর প্রতি ঘৃণাবোধ নিঃশেষ হয়ে যায় ।

৫ নং এবং ৬ নং হাদীসে সরাসরি তাকওয়া শব্দটির উল্লেখ নেই কিন্তু হাদীস দুটির মূল বিষয় বস্তুই হচ্ছে তাকওয়া । কারণ সন্দেহ থেকে দূরে থাকা তাকওয়ার ব্যাপার আবার ছোটখাট গুনাহ থেকেও দূরে থাকা তাকওয়ার ব্যাপার ।

## সাহাবা রা. এবং ইসলামিক স্কলারদের দৃষ্টিতে তাকওয়া



### তাকওয়া হলো পথের দিশারী আলো

#### তাকওয়া সম্পর্কে বিশিষ্ট কয়েকজন সাহাবীর অভিমত/মন্তব্য

- ১) আবু হুরায়রা (রা.) যে -কাঁটা বিছানো রাস্তায় চলতে গেলে যেমন কাঁটা দেখলেই সেটাকে পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে চলতে হয় যাতে সেটা পায়ে বিঁধে কষ্ট না দেয়, তাকওয়াও ঠিক তেমনি। পাপের কাজ দেখলেই তাকে এড়িয়ে চলতে হবে যাতে তাকওয়া পাপ দ্বারা বিদ্ধ না হয়, নিষ্পাপ থাকে, নিষ্কলংক থাকে।
- ২) আলী (রা.) বলেছেন যে - ক) তোমাদের [উত্তম] আমল দ্বারা তোমাদের নিজেদেরকে বাঁচাও এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকেও তেমনি উপদেশ দাও যাতে ওরাও বেঁচে থাকতে পারে।  
খ) তাকওয়া হচ্ছে সর্বশক্তিমান আল্লাহর ভয়; তাঁর কুরআনের নির্দেশ মেনে চলা; অল্পে তুষ্ট থাকা, এবং আখিরাতের পথে চলার প্রস্তুতি নেয়া।
- ৩) ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন যে - ক) সূরা আলে ইমরান (৩) এর ১০২ নম্বর আয়াতের যথাযথ অনুসরণ করা। কোন কিছুকে ভয় না করে, অথবা কারো বিরূপ সমালোচনাকে গ্রাহ্য না করে আল্লাহর পথে চলা; এবং সুস্থ ও অসুস্থ উভয় অবস্থায় তাকওয়াকে আঁকড়ে ধরে থাকা যাতে মুসলিম (আল্লাহ কাছে আত্মসমর্পণকারী) হিসেবে মৃত্যুবরণ করা সম্ভব হয়।

খ) তারাই মুত্তাকী যারা শিরক থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে চলে, এবং আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করে এই দৃঢ় বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করে যে কুরআনের নির্দেশ আল্লাহর কাছ থেকেই এসেছে।

৪) আবু দারদা (রা.) বলেছেন - তাকওয়া হচ্ছে মনে আল্লাহর ভয় এতটা প্রকট যে সরিষার দানা পরিমাণ পাপও সেই ব্যক্তিকে আতংকিত করে তোলে। তারা পাপ হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে অনেক ক্ষেত্রে কিছু কিছু হালাল কাজ থেকেও সদাসম্মত থাকে এবং সেসবকে এড়িয়ে চলে।

৫) মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) বলেছেন যে - শেষ বিচারের দিন একটা ঘোষণা শোনা যাবে, “মুত্তাকীগণ কোথায়?” তখন মুত্তাকীগণ আল্লাহর আরশের ছায়ার তলায় উঠে দাঁড়াবে। তবে আল্লাহকে তারা দেখতে পাবে না। উপস্থিত লোকজনেরা তখন মু'আযকে জিজ্ঞাসা করলো, “মুত্তাকী কারা?” তিনি বললেন, “যারা শিরক থেকে আত্মরক্ষা করে, মূর্তিপূজা থেকে দূরে থাকে, এই আল্লাহর দ্বীনকে অপবিত্রতা থেকে মুক্ত রাখে।”

৬) ইবনে মাসউদ (রা.) - তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যথাযথ ভয়। প্রসঙ্গে বলেন : তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য করা তার নাফরমানী না করা, আল্লাহকে স্মরণ করা তাকে না ভুলা, তার শোকর আদায় করা তার কুফরী না করা।

## তাকওয়া সম্পর্কে অতীত এবং বর্তমানের কয়েকজন বিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদদের অভিমত

১) ইবনে কইয়িম (রা.) বলেছেন যে -ক) কুরআনের এই আয়াত থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে - “হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর এবং মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না (৩ : ১০২) [ইগাসাতুল লাহফান ১/১০১]

খ) কোন কিছু থেকে পালিয়ে যাওয়া। পালিয়ে যাওয়া দুই ধরনের হতে পারে : সৌভাগ্যজনক ও দুর্ভাগ্যজনক। দুর্ভাগ্যজনক হলো আল্লাহর কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়া, আর সৌভাগ্যজনক হলো [অন্য সব ছেড়ে] আল্লাহর কাছে পালিয়ে যাওয়া। (মাদিহিজ সালিকিন - ১/৫০৪)



গ) আল্লাহর ভয় হচ্ছে অতি উঁচু দরজা যা মানুষের অন্তরে সতত জাগরুক থাকে। আল্লাহকে ভয় করা মানুষের অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ বলেন : ওদের [কাফিরদের] ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় কর যদি তোমরা প্রকৃতই ঈমানদার হয়ে থাক (৩ : ১৭৫); শুধুই আমাকে ভয় করবে (২ : ৪০)। যারা আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছেন কারণ তারা ..... সৎকাজে অগ্রগামী (২৩ : ৫৭-৬১) সুতরাং সেই ভয়ই উত্তম যা মানুষকে হারাম কাজ করা থেকে নিবৃত্ত করে। (মাদিহিজ সালিকিন ১/৫৪৮)

- ২) ইবনে মানযুর (রা.) বলেছেন যে - আরবী 'খাউফ' কথাটার অর্থ ভয় এবং ভয় করা এই দুই-ই (লিসানুল আরাব ২/১২৯২)
- ৩) ইমাম কুরতুবী (রা.) বলেছেন যে - 'খাউফ' অর্থ ভয়/ভীতি এবং সতর্কবাণী; অন্যদিকে ভয় করা এবং সতর্ক করাও বটে (তাফসীর আল কুরতুবী)
- ৪) আবু কাসিম (রা.) বলেছেন যে - যে বস্তুকে মানুষ ভয় করে সে সেটা থেকে দূরে সরে যায়, কিন্তু যে আল্লাহকে ভয় করে সে আল্লাহরই নিকট দৌড়ে যায় (ইহিয়া উলুম ৪/১৫৩)
- ৫) আবু হাফস (রা.) বলেছেন যে - খাউফ (ভয়) হচ্ছে আল্লাহর চাবুক তাদের জন্যে যারা তাকে ত্যাগ করে। অন্যদিকে ভয় হচ্ছে অন্ধকারে আলোর ন্যায় যা দ্বারা মানুষ ভাল এবং মন্দের পার্থক্যটা বুঝতে পারে। যারা সৃষ্ট বস্তুকে ভয় পায় তারা সেটা থেকে দূরে পালিয়ে যায়। আর যারা আল্লাহকে ভয় পায়, তারা আল্লাহর দিকেই দৌড়ে যায় (মাদিহিজ সালিকিন ১/৫৫০ এবং কুশারিয়াহ্ চিঠিপত্র)
- ৬) হাসান বাসরী (রা.) বলেছেন যে - যাদের [অন্তরে] তাকওয়া আছে তারা আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখে, এবং আল্লাহর আদেশ মেনে চলে (আমল করে)।
- ৭) সুফিয়ান আস-সাউরি (রা.) বলেছেন যে - তাদের [মুত্তাকীদের] পরিচয় হচ্ছে তারা ভীতসন্ত্রস্ত, কারণ সচরাচর যেসব বস্তুকে ভয় করা হয় না, সেই সব লোকেরা সেসব বস্তুকেও ভয় করে।

৮) উমর বিন আবদুল আযীয (রা.) বলেছেন যে – দিনে সিয়াম পালন করা এবং রাতে নামাযে দাঁড়িয়ে থাকা তাকওয়া নয়। বরং আল্লাহর নিষেধ মেনে চলা এবং আদেশ পালন করাই হচ্ছে তাকওয়া। এর চেয়েও অধিক তাকওয়া যার আছে আল্লাহ তাকে অগণিত, অশেষ রহমত দান করেছেন।

৯) ইবনে রজব (রা.) বলেছেন যে – তাকওয়ার মূল কথা হচ্ছে আল্লাহর ক্রোধ এবং শাস্তির বিরুদ্ধে ঢাল তৈরী করা। সেই ঢালের কাজ হচ্ছে আল্লাহর আদেশ মেনে চলা এবং নিষিদ্ধ বস্তু ও কাজ থেকে দূরে সরে থাকা। প্রকৃত তাকওয়া হলো নির্দেশিত সব কাজ করা, এবং নিষিদ্ধ, ঘৃণ্য ও সন্দেহজনক সব কাজ বর্জন করা। এই হচ্ছে প্রকৃত তাকওয়া (জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম ১৯০/১৯১)

১০) ইবনে মুআতায় বলেছেন যে – ছোটবড় সব পাপ কাজ পরিত্যাগ করাই তাকওয়া। সেই ব্যক্তির মত হও যে কাঁটা বিছানো পথে অতি ভয়ে ও সাবধানতা সহকারে চলে। অতি ক্ষুদ্র বস্তুকেও অবহেলা করবে না, কারণ ছোটছোট পাপের সমষ্টিই হলো পাহাড়-পর্বত। (কুরতুবী এবং ইবনে কাসীর বলেছেন যে এই কবিতাটা ইবনে মুআতায়েরই রচনা)

১১) ওমর ইবনে আব্দুল আযীয তার ছেলে আব্দুল্লাহকে লেখেন : অতঃপর... আমি তোমাকে আল্লাহর তাকওয়া অর্জন করার অসিয়ত করছি, যার সাথে তোমাকে অবশ্যই সাক্ষাত করতে হবে, তিনি ব্যতীত তোমার কোন আশ্রয় নেই, তিনিই দুনিয়া-আখিরাতের মালিক।

১২) তালক ইবনে হাবীব বলেছেন : তাকওয়ার অর্থ: আল্লাহর নির্দেশমতো তুমি তার আনুগত্য কর ও তার সাওয়াবের আশা রাখ এবং তার নির্দেশমতো তার নافرমানী ত্যাগ কর ও তার শাস্তিকে ভয় কর।

## একটি উদাহরণ

আল্লাহর প্রতি  
ভালোবাসা



আল্লাহর  
প্রতি ভয়

### তাকওয়া

২০০৯ সালে ক্যানাডার টরন্টোতে অনুষ্ঠিত “Journey of Faith” International Islamic Conference- এ অস্ট্রেলিয়া থেকে আগত বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার ডক্টর তৌফিক চৌধুরী (Usul Al Fiqh Specialist) তাকওয়ার উপর ইমাম ইবনে তাঈমিয়ার রেফারেন্সে একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়েছিলেন :

এখানে তাকওয়াকে একটি উড়ন্ত পাখির সাথে তুলনা করা হয়েছে। একটি পাখি তার দু’টো ডানার উপর ভর করে উড়ে যাচ্ছে, পাখিটির একটি ডানা হচ্ছে “আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা” এবং অপর ডানাটি হচ্ছে “আল্লাহর প্রতি ভয়”, আর পাখিটি হচ্ছে তাকওয়া। এই দু’টো ডানার উপর ভর করেই পাখিটি তার গন্তব্যে যাওয়ার চেষ্টা করছে। আর এই দু’টোর একটি যদি দুর্বল বা অচল হয়ে পড়ে তাহলেই পাখিটি তার গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে না।

একজন মু’মিনের চূড়ান্ত গন্তব্য হচ্ছে জান্নাত। একজন প্রকৃত মু’মিন আর আট-দশজনের মতো তার জীবনকে হেলাফেলা করে পরিচালনা করে না। সে তাকওয়া অবলম্বন করে নানা রকম বাধা-বিপত্তি পার হয়ে তার লক্ষ্যে পৌঁছার চেষ্টা করে এবং মহান আল্লাহর সাহায্যও সবসময় তার সাথে থাকে এবং তিনি সাহায্য করেই যান। তাই আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছতে হলে অবশ্যই “আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা এবং ভয়” এই দু’টো নিয়েই এগুতে হবে।

## ভয় ও আশা পোষণ করা

প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির কর্তব্য হলো সকল ইবাদত ও সিয়াম-সলাত সঠিক পদ্ধতিতে আদায় করা। কিন্তু সে জানে না তার এ সলাত ও সিয়াম আল্লাহ কবুল করেছেন না প্রত্যাখ্যান করেছেন। অতএব তার সর্বদা এ ভয় থাকা উচিত যে, হয়তো আমি আমার ইবাদত-বন্দেগি এমনভাবে করতে পারিনি যেভাবে করলে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। ফলে আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান হয়তো পাব না। আবার এ আশাও পোষণ করা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে আমার ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে আমার ইবাদত-বন্দেগি কবুল করে আমাকে প্রতিদান দেবেন। এ অবস্থার নাম হল 'আল-খাওফ ওয়ার রজা' অর্থাৎ 'ভয় ও আশা'। এটা ইসলামের একটা গুরুত্বপূর্ণ আকীদাগত পরিভাষা। মনে রাখতে হবে যে আল্লাহ সকলের নেক আমল কবুল করেন না। যেমন আল্লাহ বলেন :

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

“অবশ্যই আল্লাহ মুতাকীদেবর কাজ কবুল করেন।” (সূরা আল মায়িদা ৫ঃ ২৭)

হাদীসে এসেছে যে আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা এ আয়াতের অর্থ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন :

‘যারা তাদের যা দান করার তা দান করে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে - আল্লাহ এ কথা কাদের জন্য বলেছেন? যারা মদ্য পান করে, চুরি করে তাদের জন্য? তিনি উত্তরে বললেন : না, হে সত্যবাদীর কন্যা! তারা হল, যারা সিয়াম পালন করে, সলাত আদায় করে, দান-সদাকা করে এবং সাথে সাথে এ ভয়ও রাখে মনে যে হয়তো আমার এ আমলগুলো আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না, তারাই দ্রুত সম্পাদন করে কল্যাণকর কাজ এবং তারা তাতে অগ্রগামী।’ (তিরমিযী)

বর্ণিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা স্পষ্ট হল যে, আল্লাহ ঐ সকল মু'মিনদের প্রশংসা করেছেন যারা নেক আমল করে কবুল হবে কি হবে না এরকম একটা ভয় পোষণ করে এবং কাজ আরো সুন্দর করার চেষ্টা করে। কিন্তু এ ভয় যেন আবার মানুষকে নৈরাশ্যবাদী না করে। কোন অবস্থাতেই কোন মুসলিম আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত থেকে নিরাশ হতে পারে না। আল্লাহর সম্পর্কে নৈরাশ্যবাদী হওয়া

একটা কুফরি। নেক আমল কবুল হওয়ার ব্যাপারে প্রবল আশাবাদী হতে হবে কিন্তু এ আশাবাদী মনোভাব যেন অহংকার ও আত্মতৃপ্তিতে ফেলে না দেয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। অহংকার ও আত্মতৃপ্তি নেক আমলকে বাতিল করে দেয়। অনেক সময় অলসতা নিয়ে আসে। অপরদিকে ভয় মানুষকে তৎপর ও কর্মঠ হতে সাহায্য করে। তাই সকলের উচিত সকল প্রকার নেক আমল করা ভয় ও আশা নিয়ে। শুধুই ভয় অথবা শুধুই পাওয়ার আশায় নয়।

## আল্লাহকে ভালোবাসার মাধ্যম – তাকওয়া

আল্লাহর জন্য ভালোবাসা সম্পর্কে জাহিলী যুগে মানুষের কোন ধারণা ছিল না। স্বাদেশিকতা, বংশ-সম্পর্ক বা অনুরূপ কিছু ছিল তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মূল ভিত্তি। আল্লাহর বিশেষ দয়ায় ইসলামের আলো উদ্ভাসিত হল। পরস্পর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় উৎকর্ষতা আসল। ধর্মীয় সম্পর্ক সর্বোত্তম ও সুমহান সম্পর্ক হিসেবে রূপ লাভ করল। এ-সম্পর্কের উপরেই প্রতিদান, পুরস্কার, ভালোবাসা ও ঘৃণা সাব্যস্ত হল। ইসলামের বিকাশের সাথে সাথে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ইত্যাদি পরিভাষা চালু হল।

আল্লাহর জন্য ভালোবাসা-এর অর্থ হচ্ছে, এক মুসলিম ভাই অপর মুসলিম ভাইয়ের কল্যাণ কামনা করা। সম্পদের মোহ, বংশ বা স্থান ইত্যাদির কোন সংকীর্ণতা একে অপরের সম্পর্কের মানদণ্ড হবে না।

- ১) আল্লাহর জন্য ভালোবাসা স্থাপনকারীদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন : আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন - এক ব্যক্তি অন্য গ্রামে বসবাসকারী নিজ ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হল। মহান আল্লাহ তার জন্য পথে একজন ফিরিশতা মোতায়েন করে রাখলেন। যখন ঐ ফিরিশতা সেই ব্যক্তির নিকটবর্তী হল, বলল, তুমি কোথায় যাও? সে বলল, এই গ্রামে বসবাসকারী আমার এক ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করা আমার উদ্দেশ্য। ফিরিশতা বলল, তার কাছে তোমার কোন পাওনা আছে কি? সে বলল, না। কিন্তু আমি তাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি। তখন ফিরিশতা বলে উঠল, নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত দূত। মহান আল্লাহ অবশ্যই তোমাকে ভালোবেসেছেন যে রকম তুমি তাকে আল্লাহর জন্য ভালোবেসেছ। (সহীহ মুসলিম)

- ২) হাদীসে কুদসীতে আছে মহান আল্লাহ বলেন : আমার জন্য পরস্পর ভালোবাসা স্থাপনকারী, পরস্পর উঠা-বসাকারী, পরস্পর সাক্ষাতকারী, পরস্পর ব্যয়কারীদের জন্য আমার ভালোবাসা অবধারিত । (আহমাদ)
- ৩) মহান আল্লাহর জন্য পরস্পর ভালোবাসা স্থাপনকারীরা আল্লাহর আরশের ছায়াতলে অবস্থান করবে, যেদিন তাঁর আরশের ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না । রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : মহাবিচারের দিনে সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তাঁর আরশের ছায়াতলে ছায়া দিবেন, যেদিন তাঁর আরশের ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না; তাদের মাঝে এমন দুজন ব্যক্তিকে, যারা আল্লাহর জন্য পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা স্থাপন করেছে, তাঁর ভালোবাসায় তারা একত্রিত হয়েছে, এবং তাঁর ভালোবাসায় তারা পৃথক হয়েছে । (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)
- ৪) রসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন : আল্লাহ কিয়ামত দিবসে বলবেন, আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পরস্পর ভালোবাসা স্থাপনকারীরা কোথায়? আজকের দিনে যখন আমার আরশের ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না, আমি তাদের ছায়া দেব । (সহীহ মুসলিম)
- ৫) আল্লাহর জন্য ভালোবাসা জান্নাতে প্রবেশের বিশেষ মাধ্যম । রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এবং পরস্পর ভালোবাসা স্থাপন না করা পর্যন্ত তোমরা ঈমানদার হতে পারবে না । (সহীহ মুসলিম)

## তাকওয়ার ঘটনার উপর ভিত্তি করে উমর রাদিআল্লাহু আনহুর ছেলের বিয়ে

উমর রাদিআল্লাহু আনহু এর খিলাফতকালে তিনি দেশের জনগণের খোঁজখবর নেয়ার জন্য রাতের বেলা মদীনা মুনাওয়ারায় টহল দিতেন । এক রাতে তাহাজ্জুদের পর টহল দিচ্ছিলেন হঠাৎ লক্ষ্য করলেন, একটি ঘর থেকে কথাবার্তার শব্দ শোনা যাচ্ছে । সাধারণ অবস্থায় কারো ব্যক্তিগত কথা আড়ি পেতে শোনা জাযিয় নয় । কিন্তু দায়িত্বশীল ব্যক্তির জন্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অনুমতি রয়েছে । তো কথাবার্তার ধরণ শুনে তাঁর কৌতুহল হল । তিনি ঘরের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালেন এবং শুনতে পেলেন, এক বৃদ্ধা তার মেয়েকে বলছে,

‘বেটি! আজ তো উটের দুধ কম হয়েছে। এত অল্প দুধ বিক্রি করে দিন চালানো কষ্টকর হয়ে যাবে। তাই দুধের সাথে একটু পানি মিশিয়ে দাও। বাজারে নিয়ে বিক্রি করলে ভাল লাভ হবে’। মেয়ে উত্তরে বলল, ‘মা! আমীরুল মু’মিনীন তো দুধের সাথে পানি মেশাতে নিষেধ করেছেন।’ বৃদ্ধা বললেন, ‘আমীরুল মু’মিনীন কি আমাদেরকে দেখছেন? তিনি হয়তো এখন নিজ ঘরে ঘুমিয়ে আছেন। তুমি নিশ্চিন্তে পানি মেশাতে পার।’ এবার মেয়ে বলল, ‘মা, আমীরুল মু’মিনীন এখানে নেই এবং তার কোন লোকও নেই। কিন্তু আল্লাহ তো আছেন! তিনি তো আমাদের দেখছেন! তাঁর কাছে আমরা কী জবাব দেব?’

উমর রাদিআল্লাহু আনহু দেয়ালের ওপাশ থেকে সব কথা শুনতে পাচ্ছিলেন। এতটুকু শুনেই তিনি চলে এলেন এবং পরদিন লোক পাঠিয়ে সে ঘরের খোঁজখবর নিলেন। তারপর বৃদ্ধার কাছে প্রস্তাব পাঠালেন যে, ‘আপনি সম্মত হলে আপনার মেয়ের সাথে আমার ছেলের বিয়ে দিতে চাই।’

তো মানুষের অন্তরে সারাক্ষণ এই ধ্যান-ধারণা জাগরুক থাকা যে, ‘মহান আল্লাহ তা’আলা আমাদের দেখছেন’ - এর নামই তাকওয়া। এভাবে তাকওয়ার বদৌলতে মেয়েটি আমীরুল মু’মিনীনের পুত্রবধু হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করল। এই বরকতময় ঘরের তৃতীয় পুরুষ জন্মগ্রহণ করলেন খলীফা উমর বিন আব্দুল আযীয (রহ.), যাকে পঞ্চম খলীফায়ে রাশেদা বলা হয় আবার দ্বিতীয় উমরও বলা হয়। যিনি হোসাইন রাদিআল্লাহু আনহু এর মৃত্যুর দীর্ঘদিন পর ইসলামকে অরাজকতার হাত হতে পুনরুদ্ধার করেন।

## বর্তমান বিশ্বের একজন রাষ্ট্রপ্রধানের তাকওয়ার দৃষ্টান্ত

সংঘাত-সংশয়-বিশৃঙ্খলার সময় প্রথম শিকার হয় সত্য। কেননা কোন জালিম অত্যাচারীর সবচেয়ে বড় অস্ত্র হচ্ছে সত্যকে বিকৃত করে তার নিজের স্বার্থে ব্যবহার করা। সত্য ব্যতীত আমরা বুঝতে পারি না কোনটা সঠিক, কোনটা ভুল। সত্য ব্যতীত সবই মিথ্যা, সবই অবিচার। মিশরেও আজ এই অবস্থা। চলছে যেখানে রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে অপহরণ করে বন্দী করে রাখা হয়েছে। কিন্তু তাকে আমরা ভালোবাসি আর ঘৃণা করি তার চারিত্রিক এইগুনগুণে হয়তো সত্যিকারের মানুষটির প্রকৃত তাকওয়ার পরিচয় ঘটাবে।

১. কুরআনে হাফিজ প্রেসিডেন্ট মুরসী : একথাটি অনেকেই আমরা জানি না যে প্রেসিডেন্ট মুরসী সম্পূর্ণ কুরআনে ছিলেন হাফিজ। তার শুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত ছিল অসাধারণ এবং হৃদয়গ্রাহী।

২. অত্যধিক জ্ঞানী প্রেসিডেন্ট মুরসী : অনেকেরই ধারণা মুরসী অত বুদ্ধিমান ছিলেন না। কিন্তু মুরসীর শিক্ষাগত যোগ্যতা অনেকেরই অজানা। তিনি পিএইচডি ডিগ্রীধারী ডক্টরেট, তিনি জাগাজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের প্রধান ছিলেন। তিনি আমেরিকাতে বিভিন্ন প্রজেক্টে কনসালটেন্সি করেছেন এবং সেখানে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

৩. সাধারণ জীবনযাপনে প্রেসিডেন্ট মুরসী : মিশরের প্রেসিডেন্টদের জন্য বিভিন্ন বিলাসবহুল প্রাসাদ বরাদ্দ থাকলেও প্রেসিডেন্ট মুরসী তার জন্য বরাদ্দকৃত প্রাসাদে প্রথম ঢুকেই সিদ্ধান্ত নেন তিনি সেখানে থাকবেন না। তিনি তার অফিসিয়াল কাজকর্ম প্রাসাদ থেকে পরিচালনা করলেও, তার ভাড়া করা অ্যাপার্টমেন্টেই বসবাস করতেন। বর্তমান মুসলিম অনেক নেতাদের টয়লেটও হয়তো এই প্রেসিডেন্টের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বড় ও অত্যাধুনিক।

৪. রাষ্ট্রের বাড়তি সুবিধা নিতে অস্বীকৃতি প্রেসিডেন্ট মুরসীর : প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন সময় মুরসীর বোন অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাক্তাররা তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য পাশ্চাত্যে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন, এবং মেডিকেলের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হেলিকপ্টার ব্যবহার করার অনুমতি চান। কিন্তু মুরসী বলেন তিনি তার পরিবারের জন্য কোন বাড়তি সুবিধা নেবেন না। তার বোন সরকারী হাসপাতালেই মৃত্যুবরণ করেন।

৫. আযান ও সলাত প্রাধান্য পেত তার বক্তৃতার আগে : একদিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতার মাঝে আযান শুরু হয়। তিনি বক্তৃতা বন্ধ করে আযানের জবাব দিতে থাকেন এবং অতঃপর সবাইকে নিয়ে সলাত আদায় করেন।

৬. একজন গৃহহারার প্রতি দয়া প্রেসিডেন্ট মুরসীর : একজন গৃহহারা বিধবা মহিলা রাস্তায় জীবনযাপন করতেন। একদিন একটি গাড়ি তার পাশে এসে থামে যার ভেতর থেকে মুরসী নেমে তাকে জিজ্ঞেস করেন কেন তিনি রাস্তায় শুয়ে আছেন। মহিলা তার দুঃখের কথা খুলে বললে, তিনি আদেশ দেন মহিলাকে যেন সরকারী খরচে একটি বাড়ির ব্যবস্থা করে দেয়া হয়।



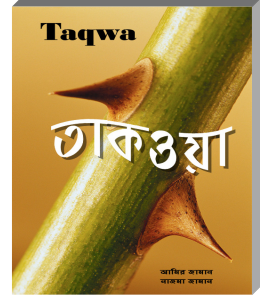
৭. স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে প্রেসিডেন্ট মুরসী : মুরসী বিভিন্ন দান-অনুদান প্রকল্পে অংশগ্রহণ করতেন। দক্ষিণ এশিয়ার ভয়াবহ সুনামীর পর তিনি সাহায্য মিশনে সেখানে আতর্দের সহায়তায় ছুটে গিয়েছিলেন।

৮. দুনিয়ার সবচেয়ে কম বেতনপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট মুরসী : বর্তমান বিশ্বে খেলোয়াড় কিংবা নায়ক নায়িকাদের আয় শুনলেই আমাদের অবাক লাগে, আমরা ধরেই নেই রাজনৈতিক নেতাদের বেতন হবে আকাশচুম্বী। কিন্তু মুরসী ছিলেন ব্যতিক্রমী। তিনি নির্ধারণ করেন তার বাৎসরিক বেতন হবে ১০,০০০ ডলার। তাকে অপহরণ করার সময় জানা যায়, তিনি আসলে কোন বেতনই গ্রহণ করেননি। তিনি পুরো সময় বিনামূল্যে দেশের জন্য কাজ করেছেন।

৯. সলাতের ব্যাপারে সতর্ক প্রেসিডেন্ট মুরসী : মুরসী পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন এবং নিয়মিত তাহাজ্জুদ সলাতও আদায় করতেন। তিনি সাধারণত জামাতে ইমামতি করতেন, তারাবীহও পড়াতেন। জুমার খুতবায় তাকে প্রায় কাঁদতে দেখা যেত।

১০. প্রেসিডেন্ট মুরসীর ছবি বিহীন অফিসের দেয়াল : সারাবিশ্বে আমরা দেখি সরকারী, আধা-সরকারী ও বেসরকারী অফিস-আদালতের দেয়ালে নেতা নেতৃদের ছবি। কোন কোন দেশে এটি সরকারী আদেশ। মুরসী নির্বাচিত হওয়ার পরপর তিনি আদেশ জারি করেন তার কোন ছবি সরকারী ভবনে ঝোলানো যাবে না।

## তাকওয়ার মাধ্যমে আত্মগঠন



### তাকওয়া অর্জনের মাধ্যম সিয়াম

সিয়ামের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে এর মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন। আর তাকওয়ার প্রতিদান জান্নাতী জীবন, যেখানে কল্পনাভিত্তিক বাস্তবায়িত হবে মানুষের প্রতিটি ইচ্ছা-বাসনা। তবে সিয়ামের এ তাৎপর্য পেতে হলে সকল পাপকর্ম থেকে গুটিয়ে নিতে হবে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে। বুকে ধারণ করতে হবে ঈমানপূর্ণ পরিতৃপ্ত হৃদয়। যে হৃদয় ঈমানী ভাব-চেতনা সদাজাগ্রত রাখার শুভ পরিণতিতে শোনার সুযোগ পাবে মহান আল্লাহর আহ্বান,

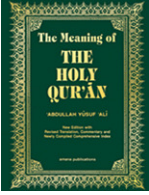
‘হে মুতমায়িন (পরিতৃপ্ত) হৃদয়! ফিরে এসো তোমার প্রতিপালকের দিকে, রাজি-খুশি হয়ে। আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও প্রবেশ কর আমার জান্নাতে  
(সূরা আল ফায়র ৮৯ঃ ২৭-৩০)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا  
كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“হে ঈমানদারগণ, তোমাদের ওপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরয করা হয়েছিল। ফলে আশা করা যায়, তোমাদের মধ্যে তাকওয়ার গুণ ও বৈশিষ্ট্য জাগ্রত হবে।” (সূরা আল বাকারা, ২ঃ ১৮৩)

## Why Fasting?

**The goal of fasting is to develop  
Self-restraint (Taqwa)**



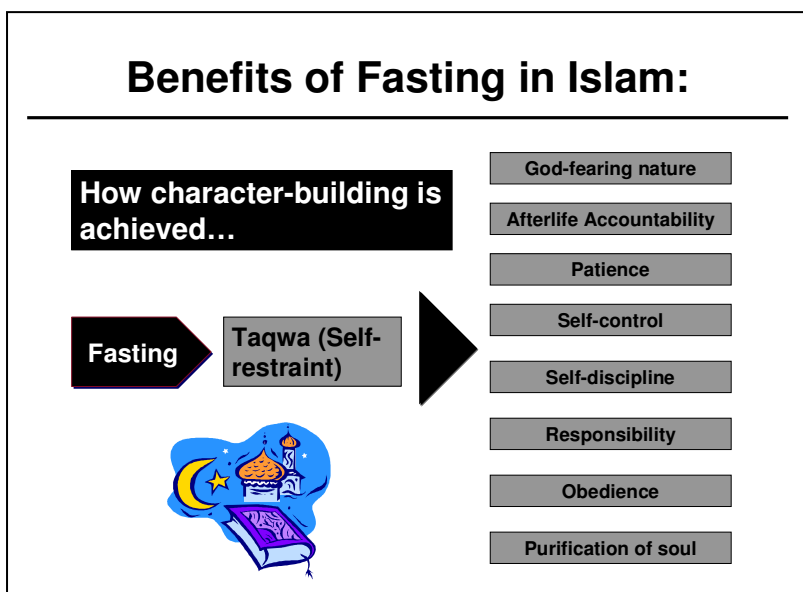
***Holy Quran** states: “O you who believe! Fasting is prescribed to you as it was prescribed to those before you, so that you may develop **Taqwa** (self-restraint) ” [2:183]*

Example: God says about Mary in the Qur'an that she said: “Verily!, I have vowed a fast to the Most Beneficent...[Maryam 19:26].

আল্লাহ তা'আলা সিয়ামের হুকুম দেয়ার পর বলেছেন তোমাদের জন্য সিয়াম ফরয করা হয়েছে সম্ভবত তোমরা মুত্তাকী হতে পারবে। আল্লাহ পাক একথা বলেননি যে, সিয়াম রেখে তোমরা নিশ্চয়ই মুত্তাকী হতে পারবে। কারণ সিয়াম হতে যে সুফল লাভ করা যায় তা সিয়াম আদায়কারীর নিয়ত, ইচ্ছা-আকাংখা ও আত্মহের ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি এর উদ্দেশ্য জানতে বুঝতে পারবে এবং এ থেকে তা অর্জনের চেষ্টা করবে সে তো কম-বেশী মুত্তাকী নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু যে এর উদ্দেশ্যই জানবে না এবং তা অর্জনের জন্য চেষ্টা করবে না, সিয়াম দ্বারা তার কোন উপকারই হবার আশা নেই।

নাবী কারীম ﷺ নানাভাবে সিয়ামের আসল উদ্দেশ্যের দিকে ইংগিত করেছেন এবং বুঝিয়েছেন যে, উদ্দেশ্য না জেনে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকায় কোনই সার্থকতা নেই।

সিয়ামের বাস্তব রূপটা চিন্তা করি। যে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে সিয়াম রাখে, লুকিয়ে কিছু পানাহার করে না, কঠিন গরমের সময় পিপাসায় কলিজা যখন ফেটে যাবার উপক্রম হয় তখন যে এক ফোঁটা পানি পান করে না – অসহ্য ক্ষুধার দরুন যন্ত্রণা অনুভব করতে শুরু করলেও কোন কিছু খাওয়ার ইচ্ছা করে না – সেই ব্যক্তির ঈমান কত ময়বুত? আল্লাহ তা’আলা যে আলিমুল গায়েব সেই কথা সে কতখানি দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করে! কত নিঃসন্দেহে সে জানে যে, তার কাজ দুনিয়ার লোকদের কাছে অজানা থাকলেও সারাজাহানের মালিকের কাছে কিছু অজানা নয়। তার মনে আল্লাহর ভয় কত তীব্র, অসহ্য কষ্ট স্বীকার করা সত্ত্বেও কেবলমাত্র আল্লাহর ভয়েই সে এমন কাজ করে না যাতে তার সিয়াম ভেঙ্গে যেতে পারে। পরকালের বিচারের প্রতি তার আকীদা-বিশ্বাস কত দৃঢ়!



আমাদের চলার যে রাজপথ মহান আল্লাহ তাঁর নাবী-রসূলদের মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়েছেন সেটিই সঠিক পথ। সে পথেই রয়েছে মুক্তির ঠিকানা। মহান রব আল্লাহ তাঁর শ্রেষ্ঠ রহমত পাঠিয়েছেন শেষ নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর মাধ্যমে। এখানে জীবন সমস্যার এমন সমাধান রয়েছে যা ১৪শ বছর আগে মানুষের জীবনে প্রশান্তি এনেছিল, আজ ১৪শ বছর পরও মানুষের সকল জটিল সমস্যার

জট খুলে দিচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এর প্রভাব একইরকম থাকবে, ইনশাআল্লাহ। ইসলামী মতবাদের তুলনায় মানুষের সৃষ্ট মতবাদ খুব বেশীদিন টিকে থাকতে পারেনি, ইতিহাসের dustbin-এ নিক্ষিপ্ত হয়েছে। মার্কসবাদ, লেনিনবাদ এর পতন বিশ্ববাসীর কাছে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এবং বাস্তববাদী উদাহরণ।

আসলে সত্যি কথা বলতে কী, আমাদের জীবনের শেষ মঞ্জিল আখিরাত। ইহজীবনকে আল্লাহর দেয়া চিরন্তন Code of Conduct (আচরণ বিধি) দিয়ে সাজিয়ে তোলার মাধ্যমে আখিরাতের সফল প্রস্তুতি। আসুন আমরা আল কুরআনে রক্ষিত এসব Code of Conduct দিয়ে নিজেদের চরিত্র গঠন করি, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাই, চেষ্টা-সাধনা করি, পারস্পরিক লেন-দেন করি, মেলামেশা, পরিবার গঠন ও লালন করি, আমাদের রবকে খুশী করার চেষ্টা করি। অতএব আত্মগঠন মানে আল্লাহর দেয়া জীবন-বিধান দিয়ে নিজের অন্তর ও বাহির এমনভাবে তৈরী করা যাতে ছোট-বড় সকল কাজই করা হয় শুধু মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য।

## Annual Training for Character-building

**Ramadan provides an annual training opportunity that is meant to fulfil the character-building needs for the rest of the year.**



↑  
*Taqwa for  
11 month*

## তাকওয়ার মুকাবেলায় শয়তান ও কু-প্রবৃত্তির ক্ষমতা দুর্বল

শয়তান মানুষের শিরা-উপশিরায় চলাচল করতে পারে এবং কু-প্রবৃত্তিকে তৃপ্ত করা হলে তা আরো অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠে সে তার আরো চাহিদা মিটানোর জন্য চাপ অব্যাহত রাখে। শয়তান ক্ষুধা ও পিপাসা দিয়ে সিয়াম পালনকারীর সাথে যুদ্ধ করে। এ যুদ্ধে সিয়াম পালনকারী আল্লাহর সাহায্যে শয়তান ও কু-প্রবৃত্তিকে পরাজিত করে। এ কারণে কু-প্রবৃত্তিকে দমন করার জন্য নাবী কারীম ﷺ সিয়াম নামক চিকিৎসা দিয়েছিলেন। কেননা নফসে আম্মারা বা কু-প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ সকল প্রকারের পাপাচারে লিপ্ত হয়। যেমন রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

“হে যুবকেরা! তোমাদের মধ্যে যে সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। কেননা বিবাহ দৃষ্টি ও লজ্জাস্থানের সুরক্ষা এনে দেয়। আর যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে না সে যেন সিয়াম পালন করে। কারণ এটা তার রক্ষাকবচ।” (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

সিয়ামের বিধানের এটা একটা হিকমত। এভাবেই সিয়াম মানুষকে তাকওয়ার পথে নিয়ে যায়। মোটকথা সিয়াম যাবতীয় জৈবিক চাহিদা নিয়ন্ত্রণ ও তা বৈধ পথে পরিচালিত করার প্রশিক্ষণ দেয়।

### একটি উদাহরণ

একটি ইউনিভার্সিটির ছাত্র শপিংমলে এক মেয়েকে দেখে তার রূপে মোহিত হয়ে সে চোখ দিয়ে মেয়েটির রূপ অবগাহনে লিপ্ত হলো। মেয়েটির শরীর আংশিক দেখা যাওয়ার কারণে তার নজর বারবার সে মেয়ের দিকে ফিরে যাচ্ছে। তারই বন্ধু অপর এক ছাত্র একই শপিংমলে ঐ মেয়েটিকে একবার মাত্র দেখে তার দৃষ্টিকে অবনত করে নিল। আরেকবার দৃষ্টি দেয়ার সাথে সাথে তার একটি কোডের কথা মনে পড়ল। “যদি কোন পুরুষ তার স্ত্রী ব্যতীত অপর কোন নারীর দিকে কু-দৃষ্টিতে তাকায় তাহলে পরকালে তার চোখে গলিত সীসা ঢেলে শাস্তি দেয়া হবে।” এ কোড মনে আসার সাথে সাথে দ্বিতীয় ছাত্রটি তার দৃষ্টিকে একেবারে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসলো, আর তাকালো না। এখানে প্রথম ছাত্রটি কোড ভঙ্গ করল আর দ্বিতীয় ছাত্রটি কোড মেনে খারাপ কাজ হতে বিরত থাকলো।

এভাবে জীবনের প্রায় সকল অঙ্গনে একজন ঈমানদার আল্লাহ নির্ধারিত Code of Conduct বা আচরণ বিধির সম্মুখীন। আল্লাহ এই আচরণ বিধি দিয়ে যুগে যুগে নাবী- রসূলদের পাঠিয়েছেন। নাবী-রসূলগণ এ আচরণ বিধির কেবল থিওরীই মানুষকে শুনাননি, এর বাস্তব প্রয়োগও নিজেদের জীবনে করে দেখিয়েছেন। মানুষ সেসব বিধি মেনে নিজেকে অনন্ত জীবনের পুরস্কার লাভের জন্য প্রস্তুত করেছে, অথবা কোড ভঙ্গ করে শাস্তির যোগ্য হয়েছে।

সারা-জীবন এ আচরণ বিধি মেনে আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করে পরকালীন পাথেয় অর্জনের জন্য আমাদের ইহজীবনকে সঠিকভাবে গঠন করার গুরুত্ব অপরিসীম। আত্মগঠনের প্রক্রিয়ায় আমরা নিজেদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুমগুলি মেনে চলতে চেষ্টা করি। ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ইত্যাদি category-র কাজগুলি মেনে নিজেদের মেধা ও মনকে তৈরী করি, আমাদের আমলকে পরিশুদ্ধ করি।

একজন ঈমানদারের জন্য আত্মগঠনের কাজটি একটি বিরামহীন দায়িত্ব। আত্মগঠনের পেরেশানী হতে ঈমানদারের শিক্ষার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, অহঙ্কার নিয়ন্ত্রিত থাকে। ঈমানী জ্ঞান যেখানে যার নিকটেই থাক না কেন, ঈমানদার সেখানেই দ্রুত এগিয়ে যাবে।

## সলাতের (নামাযের) মূল উদ্দেশ্য

সলাত হতে হবে কোয়ালিটি সম্পন্ন। সলাতের ভেতর সূরা এবং অন্যান্য যা কিছু পড়া হয় তা খুবই ধীরে ধীরে পড়তে হবে এবং সেইসাথে অর্থগুলো অনুধাবন করতে হবে। খুবই ধীরে সুস্থে রুকু-সাজদা করতে হবে এবং সলাত সম্পন্ন করতে হবে।

যথাযথভাবে খুশু-খুযুর সাথে যদি সলাত আদায় করা হয়, সলাত যে প্রশিক্ষণ দেয় তা অনুসরণ করা হয় তাহলে সেই সলাত অবশ্যই মানুষের অন্তরে আল্লাহ তা'আলার ভয় সৃষ্টি করবে এবং সেই ব্যক্তি যাবতীয় অপরাধমূলক কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, 'আল্লাহ তা'আলা হলেন আমার মনিব (রব) এবং আমি তাঁর দাস (গোলাম); এ কথা সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে হৃদয়ে জীবন্ত রাখার জন্যই আল্লাহ তা'আলা সলাত কায়েম করার আদেশ দিয়েছেন। সূরা আনকাবুতের ৪৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

“নিশ্চয়ই সলাত মানুষকে সমস্ত পাপ-কার্য ও অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখে”।

## আত্মগঠনের একমাত্র উপায় তাকওয়া

আত্মগঠনের প্রধান উপায় তাকওয়া অর্জন। অর্থাৎ আল্লাহ-ভীতি যত বেশী থাকবে আত্মগঠনের কাজ তত সফলভাবে সম্পন্ন হবে, ইনশাআল্লাহ। মানুষের সৎ ও অসৎ স্বভাবের মাঝে ভারসাম্য বিধানের জন্য আমাদের সৃষ্টিকর্তা এমন একটি উপাদানের খোঁজ দিয়েছেন যা দ্বারা অবিচারকে সুবিচার দিয়ে, বন্যতাকে নিয়ন্ত্রণের লাগাম দিয়ে, রক্ষতাকে নম্রতা দিয়ে, অশালীন আচরণকে শালীনতা দিয়ে, অন্যায়কে ন্যায় দিয়ে মীমাংসা করা হয়। আর এটির নাম হলো তাকওয়া বা আল্লাহভীতি।

আত্মগঠনের সবচাইতে বড় উপাদান তাকওয়া অর্জন। জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তাকওয়া অবলম্বন মানুষের জন্য আল কুরআনের অন্যতম কেন্দ্রীয় প্রতিপাদ্য বিষয়। আল্লাহ রব্বুল আলামীন আল কুরআনে ইহজীবনে মানুষের আচরণের মৌলিক দিক নির্দেশনা উল্লেখ করেছেন। এর মূলে রয়েছে তাকওয়া। তাকওয়া সম্পর্কে আরো পরিস্কার হওয়া যাক এখানে তাকওয়া সংক্রান্ত কয়েকটি আয়াত উপস্থাপন করা হলো :

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتِ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“কাজেই যারা তোমাদেরকে আক্রমণ করে, তোমরাও অনুরূপভাবে তাদের উপর আক্রমণ করবে; অবশ্য ভয় করতে থাক এবং এ কথা জেনে রাখ যে, আল্লাহ তাদের সংগে রয়েছেন যারা সীমালংঘন হতে দূরে থাকে।”

(সূরা আল বাকারা, ২ : ১৯৪)

অর্থাৎ শত্রুর সাথে আচরণের সময়ও আল্লাহকে ভয় করে চলার উপদেশ দেয়া হচ্ছে। বিবেকহীন হয়ে এবং সুযোগ পেলেও শত্রুর সাথে যা ইচ্ছে তাই ব্যবহার করা মানুষের অসৎ স্বভাবের পরিচয়। তাকওয়ার লাগাম দিয়ে এটিকে নিয়ন্ত্রণ



করা আল্লাহর হুকুম। আমরা যদি এটি মেনে চলতে পারি তাহলে এ ক্ষেত্রে তাকওয়া অর্জন হয়ে গেলো।

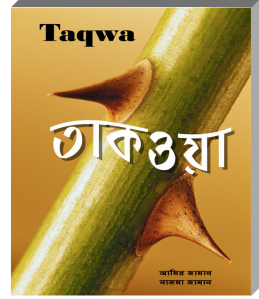
### একটি উদাহরণ :

একবার আলী রাদিআল্লাহু আনহু জিহাদের মাঠে এক কাফিরের সাথে যুদ্ধ করছিলেন। দু'জনে যুদ্ধ করতে করতে এক সময় কাফিরের হাত থেকে তরবারী পরে যায় এবং আলী রাদিআল্লাহু আনহু তাকে হত্যা করার জন্য তার বুকে চেপে বসে। ঐ মুহূর্তে কাফির আলী রাদিআল্লাহু আনহু-এর মুখে থুথু নিক্ষেপ করে। তখন আলী রাদিআল্লাহু আনহু-এর মনে এক প্রকার জিদ চলে আসে আর ঠিক ঐ মুহূর্তেই তার মহান আল্লাহর ভয় স্মরণে আসে। আলী রাদিআল্লাহু আনহু তখন ঐ কাফিরকে আর হত্যা না করে ছেড়ে দেন। পরবর্তীতে তিনি এর ব্যাখ্যা বলেছেন যে, কাফির যখন যুদ্ধে হেরে গিয়েছিল তখন তাকে হত্যা করা জায়য ছিল কিন্তু যখন সে থুথু নিক্ষেপ করেছিল তখন আলীর রাদিআল্লাহু আনহু-র মনে ব্যক্তিগত জিদ চলে এসেছিল। আর ব্যক্তিগত জিদের কারণে কাউকে হত্যা করা যায় না, এজন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তাই তিনি তাকে হত্যা না করে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এখানেই আলী রাদিআল্লাহু আনহু-এর প্রকৃত তাকওয়ার সুস্বভাব এবং শিক্ষণীয় পরিচয়।

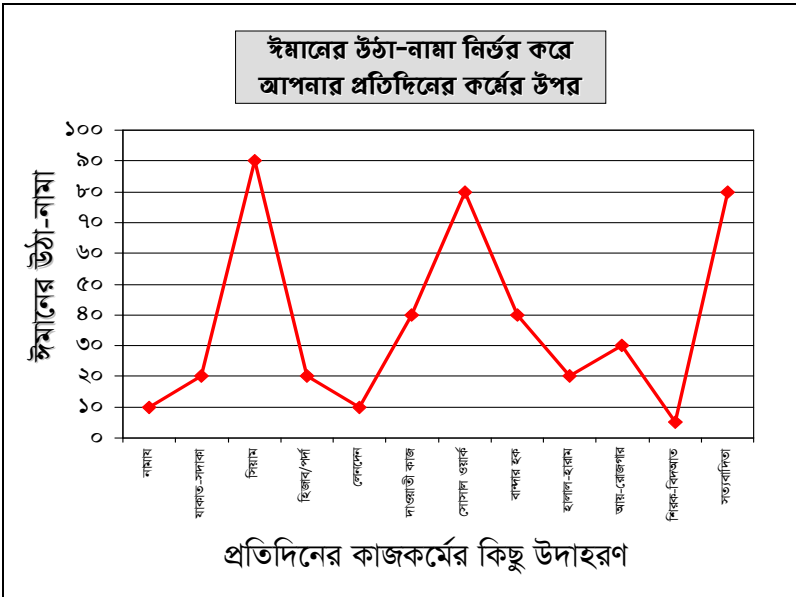
### আরেকটি উদাহরণ :

সালাহুদ্দিন আইউবী যখন জেরুজালেম জয় করেন তখনকার একটি ঘটনা। তিনি ঘোষণা দিলেন : যে এই দেশের রাজা রিচার্ডকে হত্যা করতে পারবে সে এই রাজ্যের রাজকন্যাকে পাবে এবং তার সাথে বিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর তুমুল যুদ্ধ হলো এবং একসময় ঐ রাজ্য এবং রাজকন্যা মুসলিমদের দখলে আসলো। এবার সালাহুদ্দিন আইউবী ঘোষণা দিলেন কে এই রাজ্যের রাজা রিচার্ডকে হত্যা করেছে? সে এসে এই রাজকন্যাকে নিয়ে যাও। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সৈন্যদের থেকে কেউ এগিয়ে আসছে না। বাবাকে হত্যা করার সময় রাজকন্যা সেই হত্যাকারীকে দেখেছিল। তখন তিনি ঐ সৈন্যকে দেখিয়ে দিলেন যে এই সেই লোক যিনি আমার বাবাকে হত্যা করেছে। তখন সালাহুদ্দিন আইউবী তাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি রাজকন্যাকে নিতে আসছিলে না কেন? তখন ঐ সৈন্য উত্তরে বলেছিল যে, ‘আমি তো রাজকন্যাকে পাওয়ার জন্য যুদ্ধ করিনি, আমি যুদ্ধ করেছি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য’। এই ঘটনাতেও দেখা যাচ্ছে প্রকৃত তাকওয়ার পরিচয়।

## ঈমান এবং তাকওয়া



### ঈমান এবং তাকওয়ার মধ্যে সম্পর্ক



বুঝানোর সুবিধার্থে এটি একটি উদাহরণ মাত্র

## ঈমানের উপর টিকে থাকা

ঈমান এমন কোন বিষয় বা বস্তু নয় যা একবার অর্জন করলে এটা আর আমাকে ছেড়ে যাবে না। এ ঈমান না চাইলে তা সাধারণত কাউকে দেয়া হয় না এবং ধরে রাখতে না চাইলে তা থাকে না। ঈমানকে সবসময় তাকওয়ার মাধ্যমে Renew করতে হয়। আমার এটা মনে করার কোন কারণ নেই যে একবার ঈমান যখন এনেছি এটা আমার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত আমার সাথে সাথে থাকবে। ঈমানের উঠা-নামা নির্ভর করে আমার প্রতিদিনের কর্মের উপর। উপরের গ্রাফের মাধ্যমে উদাহরণস্বরূপ এটাই বোঝানো হয়েছে।

আসুন, উপরের গ্রাফটা আমরা খুব গভীরভাবে বুঝার চেষ্টা করি। নিচের লাইনে যে বিষয়গুলো দেখানো হয়েছে সেগুলো হচ্ছে আমাদের প্রতিদিনের কিছু কাজকর্মের উদাহরণ। আমি যদি নিজেকে মুসলিম হিসেবে দাবি করি তাহলে আমার প্রতিটি কাজকর্ম হবে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী এবং এটাই আমার প্রতিটি কাজের Measurement Scale অর্থাৎ মাপকাঠি।

যেমন আমার প্রতিদিনের কাজের মধ্যে কোন কাজ খুব কোয়ালিটিসম্পন্ন অর্থাৎ ঐ কাজটি আমি প্রচণ্ডভাবে তাকওয়া মেনে সম্পন্ন করছি, সে ক্ষেত্রে আমার ঈমানের ‘লাইন গ্রাফ’ খুব উচুতে উঠে গেছে। আবার কোন কাজের ক্ষেত্রে মাঝামাঝি তাকওয়া রক্ষা করা হচ্ছে, সে ক্ষেত্রে আমার ঈমানের ‘লাইন গ্রাফ’ হয়তো ৫০ এর বরাবর স্পর্শ করছে। আবার দেখা যাচ্ছে কোন বিষয়ে আমার একদম তাকওয়া নেই অর্থাৎ এ কাজে আমি একেবারেই আল্লাহর হুকুম মানছি না, সে ক্ষেত্রে আমার ঈমানের ‘লাইন গ্রাফ’ একেবারেই শূন্যের কাছাকাছি নেমে গেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমার প্রতিদিনের কাজকর্মে কোন বিষয়ে আল্লাহকে খুব মানছি, আবার কোন বিষয়ে কম মানছি, বা কোন বিষয়ে একেবারেই মানছি না। অর্থাৎ কোন বিষয়ে আমার ঈমান খুব মজবুত, আবার কোন বিষয়ে মাঝামাঝি বা নড়বড়ে। তার মানে প্রতিটি কাজের উপর নির্ভর করে আমার ঈমান সারাক্ষণ উঠা-নামা করছে।

তাই মহান আল্লাহর নিকট সব-সময় দু’আ করতে হয় “হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দিও।” কারণ আমি সারা জীবন ঈমানদার ছিলাম কিন্তু দেখা গেল কোন কারণে মৃত্যুর আগে ঈমানহারা হয়ে গেলাম। আল্লাহ তা’আলা আমাদের সবাইকে ঈমানের উপর টিকে থাকার তৌফিক দান করুন।

## কিভাবে বুঝবো আমাদের ঈমান দুর্বল না সতেজ?

আল্লাহ তা'আলার প্রতি সত্যিকার ঈমান থাকলে আল্লাহর সাথে যে সব সম্পর্ক গড়ে উঠে এ সম্পর্কের দাবি পূরণ করাই মু'মিনের জন্য স্বাভাবিক। কিন্তু ঈমানের দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও ঈমানের দাবি পূরণে সে-ই ব্যর্থ হয় যার ঈমান দুর্বল। তাই প্রত্যেক মু'মিনেরই এ-বিষয়ে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন যে, কোন পথে ঈমানে দুর্বলতা আসে। যখনই ঈমানে দুর্বলতা দেখা দেবে তখনই আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে।

(হে রসূল! আপনি তাদেরকে) বলুন, তোমাদের পিতা, সন্তানাদি, ভাই-বোন, স্ত্রীগণ, আত্মীয়-স্বজন, ঐ সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, তোমাদের ঐ ব্যবসা-বাণিজ্য তোমরা যার মন্দার ভয় কর এবং তোমাদের ঐ সম্পদ (বাড়ি) যা তোমরা পছন্দ কর - (এ সব) যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর পথে জিহাদের চেয়ে বেশি প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর ফায়সালা না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আল্লাহ ফাসিকদেরকে হিদায়াত করেন না। (সূরা তাওব : ২৪)

এ আয়াতে মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাছ্ ওয়াতা'আলা স্পষ্ট ভাষায় দুনিয়ার ভালোবাসার জিনিসগুলোকে যেমন : ১. পিতা ২. সন্তানাদি ৩. ভাই-বোন ৪. স্ত্রীগণ ৫. আত্মীয়-স্বজন ৬. জমানো সম্পদ ৭. ব্যবসা-বাণিজ্য ৮. বাড়ি এই আটটিকে কী পরিমাণ ভালোবাসা যাবে তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

সুতরাং বক্তব্য স্পষ্ট : ১. আল্লাহ ২. রসূল ও ৩. আল্লাহর পথে জিহাদের চেয়ে সম্পদ ও স্বজনকে বেশি ভালোবাসলেই ঈমান দুর্বল বলে প্রমাণিত হবে। যখন ঐ ৮টির ভালোবাসা এ তিনটির চেয়ে বেশি হবে তখনি ঈমানের বিপদ।

### একটি উদাহরণ

আমরা জানি যে যেকোন খাবারে লবন প্রয়োজন। কিন্তু এই লবন যদি খাবারে অতিরিক্ত হয়ে যায় তাহলেই সেই খাবার আর মুখে দেয়া যায় না। এই লবন ছাড়া কোন খাবারই খাওয়া যায় না আবার এই লবনই যদি পরিমানের চেয়ে বেশী হয়ে যায় তাহলেই সমস্যা। আল্লাহ, রসূল ও ধীন প্রতিষ্ঠার প্রতি দায়িত্ব পালনের পথে যখন ঐ আটটি ভালোবাসার বস্তু প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় তখন ঐ দায়িত্ব পালনে বাধার সৃষ্টি হয়। এ বাধা দূর করতে পারলে, অর্থাৎ তিনটির ভালোবাসার খাতিরে যদি আটটির ভালোবাসা কুরবানী দেয়া যায়, তাহলে

প্রমাণিত হবে যে ঈমান দুর্বল নয়। ঈমান দুর্বল হলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। কারণ তখন আর ঈমানের দাবি পূরণ করার শক্তি থাকে না। সম্পদ ও সন্তানকে আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়াতাতা'আলা শোভাও বলেছেন, ফিতনাও বলেছেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহর বক্তব্য পরিষ্কার।

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الدُّنْيَا

“সম্পদ ও সন্তানাদি দুনিয়ার জীবনের শোভা।” (সূরা আল কাহাফ, ১৮ : ৪৬)

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

“নিশ্চয়ই তোমাদের সম্পদ ও সন্তান [তোমাদের জন্য] ফিতনাই”।

(সূরা আত তাগাবুন, ৬৪ : ১৫)

এ আটটি ও তিনটির ভালোবাসায় যদি ভারসাম্য রক্ষা করা হয় তাহলে সম্পদ ও সন্তান জীবনের শোভা। আর যদি আটটির ভালোবাসা বেশি হয় তাহলে সম্পদ ও সন্তান ফিতনাই। ইসলামী পরিভাষায় আল্লাহর হুকুম পালনে বাধাকেই ফিতনা বলা হয়। এর শাব্দিক অর্থ-পরীক্ষা, বিপদ, গোলযোগ, আকর্ষণ, বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ

ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

“হে ঐ সব লোক যারা ঈমান এনেছে, ঈমান! তোমাদের মাল ও আওলাদ (সম্পদ ও সন্তান) যেন তোমাদেরকে আল্লাহর কথা ভুলিয়ে না দেয়।”

(সূরা মুনাফিকুন, ৬৩ : ৯)।

## আর একটি বাস্তব উদাহরণ

মহিলাদের মাসিক ইসলামিক প্রোগ্রাম হয়, সেই প্রোগ্রামে নিয়মিত ৩০-৪০ জন মহিলা অংশগ্রহণ করেন এবং আল-কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে শিক্ষামূলক আলোচনা করেন। এই নিয়মিত অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে দুজনের নতুন বাচ্চা হয়েছে (আলহামদুলিল্লাহ), দু'জন খুবই ধার্মিক। কিন্তু দেখা গেল বাচ্চা হওয়ার পর থেকে তারা আর মাসিক ইসলামিক প্রোগ্রামে আসেন না। অযুহাত হচ্ছে নতুন বাচ্চা। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে নতুন বাচ্চা হওয়ার কারণে শুধু ইসলামিক প্রোগ্রামে আসা হচ্ছে না ঠিকই কিন্তু দূর-দূরান্তের সপিং মলে যাওয়া হচ্ছে,

বিভিন্ন বাসায় দাওয়াত খাওয়া হচ্ছে অর্থাৎ আর সব কাজই হচ্ছে ঠিকমতো শুধু ইসলামের কথা বলা হলে বাচ্চা নিয়ে ব্যস্ততা দেখানো হচ্ছে। এক্ষেত্রে উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী সন্তান হচ্ছে ফিতনা। তাই কোন কিছুই ভালোবাসায় এমন মগ্ন হওয়া যাবে না যার কারণে ঈমানের দাবি পূরণে অবহেলা হয়ে যায়। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের সঠিক ঈমানের বুঝ দিন এবং প্রতিমুহূর্তে এই ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিক দিন। আ-মী-ন।

## আল্লাহর ভয় না মানুষের ভয়?

আমি যদি আমার সারাদিনের কাজকর্ম এবং সারা জীবনের কাজকর্ম শুধু মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করি এবং আল্লাহকে ভয় করে করে থাকি তাহলে আমাকে এই পৃথিবীর আর কাউকে ভয় করতে হবে না। আর যদি আমার কাজকর্মে গলদ থেকে থাকে অর্থাৎ আল্লাহর ভয় না থাকে, তাহলে প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাকে মানুষকে ভয় পেতে হবে, সবসময় ডানে-বামে-পেছনে তাকাতে হবে কেউ দেখল কিনা। সারাক্ষণ মনে হবে চোরের মন পুলিশ-পুলিশ, কোন কাজ করে সত্যিকার শাস্তি পাওয়া যাবে না। সব সময় মনে হবে এই বুঝি কেউ দেখে ফেলল। উঠতে-বসতে মানুষকে ভয় করতে হবে, আত্মীয়-স্বজনকে ভয় করতে হবে, অফিসের বসকে ভয় করতে হবে, স্ত্রীকে ভয় করতে হবে, সন্তানদেরকে ভয় করতে হবে, বাড়ির কাজের লোক বা দারোয়ানকে ভয় করতে হবে, বন্ধু-বান্ধবকে ভয় করতে হবে, পাড়া-প্রতিবেশীকে ভয় করতে হবে, থানা-পুলিশকে ভয় করতে হবে ইত্যাদি।

এখন একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখি আমি কার ভয়ে নিজের জীবনকে গড়বো! তাই সবসময় মনে রাখতে হবে আমি গোপনে বা প্রকাশ্যে যা কিছু করছি তা সবজাওয়া আল্লাহ দেখছেন এবং দুই কাঁধের ফিরিশতারা তা লিখছেন। সুতরাং ভয় অবশ্যই আল্লাহকেই করতে হবে যিনি সর্বদ্রষ্টা এবং সর্বশ্রোতা। তাছাড়া তাঁর কুরআনে আল্লাহ মানুষকে অসংখ্যবার আদেশ দিয়েছেন, “আমাকে ভয় কর”। আল্লাহকে ভয় করা আমাদের ঈমানেরই অংশ, ঈমানের দাবী। তাকওয়া অর্জনের ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করাই হচ্ছে প্রথম পদক্ষেপ।

## কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে নিজেই নিজের মূল্যায়ণ করি

- ১) আমি যখন কোন অন্যায় কাজ করে ফেলি তখন কি আমার খুব অনুশোচনা হয়? তখন কি আমার মনে হয়, কেন এই কাজটা করলাম?

- ২) আমার মন যখন কোন খারাপ কাজ করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে তখন কি আমার বিবেক বাধা দেয়?
- ৩) আমি যখন খুব বড় ধরনের কোন অপরাধ করে ফেলি তারপর থেকে কি আমি অপরাধবোধে ভুগতে থাকি?
- ৪) আমার কাছে কি অন্যায়কে অন্যায় বলে মনে হয়? যেমন : মিথ্যা কথা বলা, অহংকার করা, গর্ব করা, গীবত করা, পরনিন্দা, পরচর্চা করা, লোভ করা, সুদ দেয়া বা নেয়া, কাউকে ঠকানো, সরকারের ট্যাক্স ফাঁকি দেয়া, প্রতারণা করা, চোগলখুরী করা, অন্যের হক আদায় না করা, যিনা করা, মদ খাওয়া, জুয়া খেলা ইত্যাদি ইত্যাদি ।
- ৫) আমার কি টিভি বা ইন্টারনেটে অশ্লীল কিছু দেখতে ভাল লাগে?
- ৬) মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও নিয়মিত ফরয সলাত আদায় না করার কারণে কি আমার নিজেকে অপরাধী মনে হয়?
- ৭) সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও প্রতি বছর ফরয যাকাত ঠিকমতো আদায় না করেও আমি কি কোন অপরাধ অনুভব করি?
- ৮) আমার কি অবৈধ আয়/সরকারের ট্যাক্স ফাঁকি দিতে বিবেক বাধা দেয়?
- ৯) আমার ফরয হাজ্জের দৈহিক-মানসিক-আর্থিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হাজ্জ করছি না । এজন্য কি নিজেকে অপরাধী মনে হয়?
- ১০) অন্যের সাথে খারাপ ব্যবহার করার পর কি আমার মন খারাপ হয়?
- ১১) আমার কি বাজে বন্ধুদের সাথে চলাফেরা করতে ভাল লাগে বা তাদের আড্ডায় বসতে ভাল লাগে?
- ১২) আমার কি ক্লাবে বা খারাপ আড্ডাচ যেতে অথবা মদ খেতে ভাল লাগে?
- ১৩) আমার কি হারাম লটো (লটারী) খেলতে ভাল লাগে?
- ১৪) আমার কি পরপুরুষ বা পরস্ত্রীর সাথে গল্পগুজব করতে ভাল লাগে?
- ১৫) আমি যদি পর্দা না করে থাকি কুরআনে নির্দেশিত ফরয আইন পর্দা না করার কারণে কি আমার নিজেকে অপরাধী মনে হয়?
- ১৬) আমি যখন কোন দান-সদাকা করি তখন কি আমার গর্ববোধ হয়?
- ১৭) আমার কি দান-সদাকা করতে খুব কষ্ট হয়?
- ১৮) আমার কি দ্বীন-ইসলামের পথে টাকা-পয়সা খরচ করতে খুব কষ্ট হয়?
- ১৯) আমি কি সবসময় নিজেকে অন্যের চাইতে জ্ঞানী মনে করি?
- ২০) আমি কি সবসময় নিজেকে অন্যের চাইতে বড় মনে করি?
- ২১) আমার ডিগ্রি এবং অগাধ সম্পদের কারণে কি আমার দম্ভ প্রকাশ পায়?

- ২৪) আমার যৌবন কালের অপরাধের কথা কি আমার মনে পড়ে এবং অনুশোচনা হয়?
- ২৫) আমি কি গরীবদের তুচ্ছ ভাবি আর সম্পদশালীদের বেশী গুরুত্ব দেই?
- ২৬) আমি কি আমার গরীব আত্মীয়-স্বজনদেরকে সমাজে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করি?
- ২৭) আমার অর্জিত আয় কি শুধু আমি নিজ এবং নিজ পরিবারের জন্যই বেশী ব্যয় করি, না কি অন্যের জন্যও খরচ করি?
- ২৮) আমার কি অন্যের প্রশংসা করতে ভাল লাগে বা অন্যের প্রশংসা শুনতে ভাল লাগে? নাকি অন্যের প্রশংসা শুনলে আমার গা-জ্বালা করে?
- ২৯) অন্যের ভাল দেখলে কি আমার ভাল লাগে, নাকি হিংসা লাগে?
- ৩০) অন্যের ক্ষতি দেখলে কি আমার আনন্দ লাগে?
- ৩১) আমি কি আমার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে ক্যারিয়ার (career), বাড়ি, গাড়ি আর ধন-দৌলত নিয়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকি?
- ৩২) আমার ভাল কাজ কি আমাকে আনন্দ দেয় আর মন্দ কাজ পীড়া দেয়?
- ৩৩) আমার মন কি মসজিদের দিকে টানে বা মসজিদে বেশী বেশী সময় কাটাতে কি আমার ভাল লাগে?
- ৩৪) কোন ইসলামিক প্রোগ্রামে বসলে কি আমার ভাল লাগে? নাকি একটু পরেই মন ছটফট করে উঠে যাওয়ার জন্যে?
- ৩৫) আমি যখন সলাতে থাকি তখন কি আমার সলাতে মন বসে? নাকি কতক্ষণে সলাত শেষ করবো সেই চিন্তা থাকে?
- ৩৬) আমি যখন সিজদায় থাকি তখন কি আমার খুব ভাল লাগে?
- ৩৭) আমার কি সিজদায় দীর্ঘ সময় কাটাতে ভাল লাগে?
- ৩৮) আমি যখন সিজদায় থাকি তখন কি নিজের অপরাধের অনুশোচনায় চোখের পানি বেরিয়ে আসে?
- ৩৯) লাশ দেখলে বা মৃত্যু সংবাদ শুনলে বা কবরের কাছে গেলে কি আমার নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়?
- ৪০) আমার অপরাধের জন্য যে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হতে পারে সেটা কি আমার কখনো মনে হয়?

**পরীক্ষার ফলাফল :** উপরের এই ৪০টি প্রশ্নের উত্তর হয় ‘হ্যাঁ’ হবে অথবা ‘না’ হবে। আমরা আলাদা একটি সাদা কাগজে ‘হ্যাঁ’ এবং ‘না’ নাম্বারিং করে নিজের তাকওয়ার মান যাচাই করে দেখতে পারি।



## সুদ ও তাকওয়া

### সুদ সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশ

- “যারা সুদ খায় তারা (মাথা উঁচু করে) দাঁড়াতে পারবে না, (দাঁড়ালেও) তার দাঁড়ানো হবে সে ব্যক্তির মতো, যাকে শয়তান নিজস্ব পরশ দিয়ে (দুনিয়ার লোভ লালসায়) মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে; এটা এ কারণে, যেহেতু এরা বলে, ব্যবসা বাণিজ্য তো সুদের মতোই।” (সূরা বাকারা : ২৭৫)
- “অথচ আল্লাহ তা’আলা ব্যবসা হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন, তাই তোমাদের যার যার কাছে তার মালিকের পক্ষ থেকে (সুদ সংক্রান্ত) এ উপদেশ পৌঁছেছে, সে অতঃপর সুদের কারবার থেকে বিরত থাকবে।” (সূরা বাকারা : ২৭৫)
- “আল্লাহ তা’আলা সুদ নিশ্চিহ্ন করেন, (অপর দিকে) দান সদাকা (-র পবিত্র কাজ)-কে তিনি (উত্তরোত্তর) বৃদ্ধি করেন; আল্লাহ তা’আলা (তাঁর নিয়ামতের প্রতি) অকৃতজ্ঞ পাপিষ্ঠ ব্যক্তিদের কখনো পছন্দ করেন না।” (সূরা বাকারা : ২৭৬)
- “হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা (সুদের ব্যাপারে) আল্লাহকে ভয় করো, আগের (সুদী কারবারের) যে সব বকেয়া আছে তোমরা তা ছেড়ে দাও, যদি সত্যিই তোমরা আল্লাহর ওপর ঈমান আনো।” (সূরা বাকারা : ২৭৮)
- “যদি তোমরা এমনটি না করো, তাহলে অতঃপর আল্লাহ তা’আলা ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে (তোমাদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধের (ঘোষণা থাকবে)।” (সূরা বাকারা : ২৭৯)

### সুদ সম্পর্কে রসূল ﷺ এর নির্দেশ

- নিশ্চয়ই আল্লাহর নাবী ﷺ সুদগ্রহীতা, সুদ প্রদানকারী, সুদী কারবারের সাক্ষী এবং সুদ চুক্তি লিখককে অভিশাপ দিয়েছেন। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)
- যে ব্যক্তি জেনে শুনে সুদের একটি টাকা খায়, তার এই অপরাধ ছত্রিশ বার ব্যভিচারের চাইতেও অনেক কঠিন। (আহমদ, বায়হাকী)

- সুদের তিয়ান্ডরটি দরজা । তন্মধ্যে সহজতর দরজার দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যে কোন ব্যক্তি তার মাকে বিয়ে করল । আর সর্বোচ্চ সুদের কাজটি হচ্ছে মুসলিম ব্যক্তির সম্মান ও ধন মাল হরণ । (ইবনে মাজাহ, বায়হাকী)

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক মানবতাবোধ প্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ ﷺ ৪০টিরও অধিক হাদীস দ্বারা সুদ নিষিদ্ধ করেছেন । সুতরাং এখানে অবশ্যই বুঝতে হবে এটি কতটা মানবতা বিরোধী একটি জঘন্যতম কাজ । এখন আমি এই মানবতা বিরোধী কাজের সাথে কতোটুকু জড়িত হবো তা নির্ভর করছে আমার তাকওয়ার উপর ।

### সুদ একটি সুস্পষ্ট কবীরাহ গুনাহ

আমরা জানি নিঃসন্দেহে সুদ গ্রহণ ও প্রদান বা দেয়া নেয়া একটি কবীরাহ গুনাহ । আমরা অনেকেই সুদী অর্থনীতির সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে আল্লাহর আইন অমান্য করে নিজেদেরকে কবীরাহ গুনাহর সাথে জড়িয়ে ফেলছি এবং আল্লাহ তা'আলার সীমালংঘন এবং নাফরমানী করে ফেলছি । আমরা হয়তো কেউ কেউ বলে থাকি যে এই আধুনিক যুগে সুদ থেকে দূরে থাকা সম্ভব নয়! কিন্তু চৌদ্দশ বছর আগে আল্লাহ ও তার রসূল ﷺ বর্তমান আধুনিক যুগ এবং ভবিষ্যৎ যুগের কথাও চিন্তা করে সুদকে হারাম করেছেন । মহান আল্লাহ অবশ্যই জানতেন যে এমন এক যুগ আসবে যখন মানুষ অমুসলিম দেশে বসবাস করবে, এমনকি মুসলিম দেশেও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা থাকবে না, ইসলামিক ফাইন্যান্স থাকবে না । তাই আল্লাহও এই যুগের কথা মাথায় রেখেই সুদ ভিত্তিক অর্থনীতির একটি রাস্তা বের করে রাখতেন এবং রসূল ﷺ -কে দিয়েও তা বাস্তবতার উদাহরণ সৃষ্টি করে রাখতেন । কিন্তু তিনি তা করেননি, যতটুকু আমাদের কল্যাণের জন্য প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই নির্দেশ দিয়েছেন । তাই সুদ সুদই, এটা সবসময়ের জন্য হারাম এবং কবীরাহ গুনাহ । কোনভাবেই এটাকে ঘুরিয়ে পঁচিয়ে হালাল করার কোন উপায় নেই । আর আল্লাহর হুকুমের সাথে যুক্তি তর্কেরও কিছু নেই, তিনি যা করেছেন আমাদের মঙ্গলের জন্যই করেছেন ।

সুদ এমন একটি কবীরাহ গুনাহ যা সামাজিক ব্যাধি এবং গোটা সমাজের ক্ষতি করে । যিনাও একটি কবীরাহ গুনাহ যা মানুষ গোপনে একাকী করে থাকে । কিন্তু সুদ একটি প্রকাশ্য কবীরাহ গুনাহ যা মানুষ সকলের সামনে করে থাকে ।

সেজন্য রসূল ﷺ বলেছেন সুদের গুনাহর ৭০টি দরজা তার মধ্যে সবচেয়ে নিম্নতম গুনাহ হচ্ছে নিজ মার সাথে যিনা করা ।

### শয়তানের প্ররোচনা

আমরা জানি শয়তান নানাভাবে আমাদেরকে প্ররোচনা দিয়ে থাকে । তবে সে খুব সহজেই দুর্বল ঈমানের অধিকারীদেরকে প্ররোচনা দিতে পারে কিন্তু শক্ত ঈমানদারদের খুব সহজে ধোকা দিতে পারে না, তখন সে ভিন্ন পথ অবলম্বন করে । যেমন : আমি একজন খুবই ভালমানের দ্বায়ী অর্থাৎ দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনকে নিয়োজিত করেছি, দ্বীন কায়েমের জন্য জান-মাল-সময় ব্যয় করছি অর্থাৎ দ্বীন ইসলামকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে নিয়েছি । কিন্তু দেখা গেল শয়তান আমার মনের মধ্যে এমন চিন্তা ঢুকিয়ে দিল যে - “তুমি তো ইসলামের জন্য অনেক কিছু করেছো, সারাদিন এর জন্যই কাজ করছো, নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছো, এখন তুমি দুই একটা গুনাহ করলে তেমন কিছু আসে যাবে না, কারণ তোমার ত্যাগের কাছে এই দুই একটা গুনাহ তেমন কিছুই না” । তখন আমরা শয়তানের এই ধরণের ধোকায় পরে মনে করতে পারি যে ঠিকই তো আমি তো সব কিছু করছি দ্বীনের জন্য, আমি সুদ লেন-দেন করছি, সুদে বাড়ি কিনছি, গাড়ি কিনছি তাও দ্বীনের জন্য, এতে দ্বীন উপকৃত হবে, এতে তো দোষের কিছু দেখছি না । এভাবে আস্তে আস্তে আমরা কবীরাহ গুনাহর সাথে জড়িয়ে যাচ্ছি । মহান আল্লাহ যে সকল নির্দেশ সরাসরি কুরআনে দিয়ে দিয়েছেন তা কোন ভাবেই অমান্য করা যাবে না ।

**তাকওয়া :** সব কিছুর মূলে হচ্ছে তাকওয়া । যে যতো তাকওয়াবান সে ততো দ্রুত আল্লাহর হুকুম পালনের জন্য সদাজাগ্রত, সে কোন ভাবেই আল্লাহর কোন আইনের ব্যাপারে কোন প্রকার অজুহাত খুঁজবে না, যা শুনবে তাই মনে প্রাণে মেনে নিয়ে পালন করার চেষ্টা করবে । আমরা জানি যার তাকওয়া যতো উন্নতমানের তার ঈমান ততো মজবুত । এখন আমি যদি মনে করি আমার ঈমান খুব মজবুত কিন্তু আমি নিয়মিত সলাত আদায় করি না বা সুদ আদান প্রদান করি বা মিথ্যা কথা বলি! তাহলে এটা কেমন মজবুত ঈমান হলো?

### অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ দ্বীনের পথে খরচ করা

অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ আল্লাহর কাজে লাগালে কোন কাজে আসবে না এবং অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থের যাকাত দেয়ার প্রশ্নই উঠে না । বরং এ অর্থ বহন

করা মানে জলন্ত অঙ্গার বহন করা। রসূল ﷺ বলেছেন, হারাম পথে সম্পদ উপার্জন করে বান্দা যদি তা দান করে দেয় আল্লাহ সে দান গ্রহণ করেন না। প্রয়োজন পূরণের জন্যে সে সম্পদ ব্যয় করলেও তাতেও কোন বরকত হয় না। সে ব্যক্তি যদি সে সম্পদ রেখে ইন্তিকাল করে তা জাহান্নামের সফরে তার পাথেয় হবে। আল্লাহ অন্যায় দিয়ে অন্যায়কে মিটান না। বরং তিনি নেক কাজ দিয়ে অন্যায়কে মিটিয়ে থাকেন। নিশ্চয়ই মন্দ মন্দকে দূর করতে পারে না।

**একটি বাস্তব উদাহরণ :** আমি যদি বলি যে, আমি লটারী খেলি এজন্য যে, এতে যদি কোটি টাকা পাই তাহলে গরিবদের জন্য হসপিটাল বানাবো, এতিমখানা বানাবো, স্কুল বানাবো ইত্যাদি। কিন্তু মহান আল্লাহ এই ধরনের কাজ করতে কোথাও বলেননি। অর্থাৎ অবৈধভাবে আয় করে সেই টাকা সদাকা করা নিষেধ।

**কার জন্য এই এতো কষ্ট?** আমি কার জন্য এই এতো কষ্ট করছি? কার জন্য এই গাড়ি, বাড়ি, ব্যাংক ব্যালেন্স করছি? মনে রাখতে হবে যাদের জন্য আমি আজ এই অবৈধ উপায়ের আশ্রয় নিচ্ছি তারাই একদিন আখিরাতের ময়দানে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে এবং বলবে, আমরা তো তাকে এভাবে আয় করতে বলিনি। সূরা মুনাফিকুন-এর ৯ নং আয়াতে আল্লাহ সতর্ক করে বলেন-

“মু'মিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন করে না দেয় যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত”।

আল্লাহ আরো বলেন : “কোন বোঝা বহনকারী অন্য কোন লোকের বোঝা বহন করবে না। মানুষের জন্য তাই যার জন্য সে চেষ্টা করেছে। তার চেষ্টা-প্রচেষ্টা খুব শীঘ্রই দেখানো হবে।” (সূরা আন নাজম, ৫৩ : ৩৮-৪০)

আমরা এই একটা বিষয়ে নিজের নফসের কাছে খুব দুর্বল। খুব কম মানুষই পাওয়া যাবে যে লেনদেনে পরিস্কার। তাই রসূল ﷺ বলেছেন, যে লেনদেনে ভাল তার চরিত্র ভাল। এখানেও সব কিছুর মূলে আল্লাহভীতি অর্থাৎ এই বিষয়ে নিজেকে রক্ষা করার একমাত্র ঔষধ হচ্ছে তাকওয়া অবলম্বন করা, তাকওয়া ছাড়া খুব কম লোককেই এই বিষয়ে ঠেকিয়ে রাখা যাবে। সে শিক্ষিত হোক আর অশিক্ষিত হোক, যখনি সুযোগ পাবে তখনি সে অবৈধ আয়ের দিকে হাত বাড়াবে। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : “মানুষ বলে বেড়ায় আমার সম্পদ! আমার সম্পদ! কিন্তু হে আদমসন্তান, তোমার সম্পদ শুধু সেটুকুই যা তুমি খেয়ে-পড়ে

ভোগ করে গেছ, আর যা তুমি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে [আখিরাতের পুঁজি হিসেবে] অগ্রীম পাঠিয়েছ” । (সহীহ মুসলিম)

## ইসলাম কী বলে আর আমরা কী করি!!

ইসলাম বলে	আমরা করি
<p><u>গোপনে দান</u> ডান হাত দিয়ে দান করলে বাম হাত যেন না জানে ।</p>	<p><u>প্রকাশ্যে দান</u> কিন্তু আমরা চাই সবাই যেন জানে, কোন না কোনভাবে যেন দানটা প্রকাশ পায় ।</p>
<p><u>সদাকার প্রকৃত সওয়াব</u> গরীব সদাকা গ্রহণ করে সদাকারীর উপকার করেন । কারণ সদাকা গ্রহণকারী সদাকা গ্রহণ না করলে দানকারী আল্লাহর থেকে রিওয়ার্ড পেতো না ।</p>	<p><u>সদাকা</u> দানকারী দান করে মনে করে যে সে গরীবের অনেক উপকার করছে ।</p>
<p><u>দানের বিনিময়</u> দান করে তার বিনিময়ে দান গ্রহণকারীর নিকট হতে কোন প্রকার প্রতিদান আশা করা যাবে না । দান হতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য ।</p>	<p><u>দানের বিনিময়</u> দান করে দাতা কোন না কোন ভাবে দান গ্রহীতার নিকট থেকে প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা, সম্মান ইত্যাদি আশা করে ।</p>
<p><u>নীচের হাতের চেয়ে উপরের হাত উত্তম</u> যে সবসময় দিয়ে থাকে সে অবশ্যই যে গ্রহণ করে তার থেকে উত্তম ।</p>	<p><u>নীচের হাতের চেয়ে উপরের হাত উত্তম</u> কিন্তু আমরা অন্যকে দেয়ার চেয়ে বেশী নিতে পছন্দ করি । সারাক্ষণ শুধু চাই আর চাই ।</p>
<p><u>দান করে খোটা না দেয়া</u> কুরআনের নির্দেশ হচ্ছে- দান করে কাউকে খোটা দেয়া যাবে না । যেমন, তোমাকে তো অনেক দিয়েছি, তোমার জন্য তো আমি অনেক করেছি!</p>	<p><u>দান-সদাকার বিকৃতরূপ</u> কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা গরীব আত্মীয়-স্বজনকে দান করে আবার খোটা দেই, তাদেরকে দানের কথা মনে করিয়ে দেই ।</p>

ইসলাম বলে	আমরা করি
<p><u>হাজ্জ ফরয হিসেবে আদায়</u></p> <p>সলাত-সিয়াম-যাকাতের মতো হাজ্জও একটি ফরয ইবাদত, সামর্থবানদের জন্য এটি জীবনে একবার ফরয ।</p>	<p><u>হাজ্জ করে তার প্রচার</u></p> <p>হাজ্জ আদায় করার পর কোন না কোন ভাবে আমরা চাই লোকে আমাকে এখন আগের চেয়ে বেশী সম্মান করুক, বেশী পরহেজগার মনে করুক বা হাজী সাহেব বলে ডাকুক ।</p>
<p><u>কুরবানী হতে হবে শুধু মাত্র আল্লাহর জন্য</u></p> <p>যে কোন পশু কুরবানী করতে হবে একমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য । মানুষকে দেখানোর জন্য কোন কাজ করা যাবে না ।</p>	<p><u>কুরবানীর বিকৃতরূপ</u></p> <p>অনেকেই কুরবানী দি়ে কুরবানী নিয়ে এক প্রকার প্রতিযোগিতায় পরে যায় যে, কে কত বড় গরু কুরবানী দিচ্ছে! কে কয়টি গরু কুরবানী দিচ্ছে!</p>
<p><u>বাবা-মায়ের প্রতি দায়িত্ব</u></p> <p>বাবা-মা বৃদ্ধ হয়ে গেলে তাদেরকে এতো বেশী করে যত্ন করতে হবে যে তারা যেন উহ্ শব্দটিও না বলেন ।</p>	<p><u>বাবা-মায়ের প্রতি দায়িত্ব</u></p> <p>বাবা-মা বৃদ্ধ হয়ে গেলে তাদেরকে আমরা বোঝা মনে করি । সন্তানরা সবাই মিলে বৃদ্ধ বাবা-মাকে নিয়ে ঠেলাঠেলি করি যে সে কার কাছে থাকবে ।</p>
<p><u>গীবত করা</u></p> <p>গীবত করা একটি কবিরাহ গুনাহ এবং গীবত করা নিজ মরা ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সমতুল্য ।</p>	<p><u>গীবত করা</u></p> <p>অন্যের গীবত করতে আমাদের খুবই মজা লাগে । যেকোন আড্ডায় অনুপস্থিত কোন ভাই বা বোনকে নিয়ে সমালোচনা করতে খুবই আনন্দ উপভোগ করি ।</p>
<p><u>হিংসা করা</u></p> <p>হিংসা করা কবিরাহ গুনাহ এবং যার অন্তরে তিল পরিমান হিংসা থাকবে সে জান্নাতে যেতে পারবে না ।</p>	<p><u>হিংসা করা</u></p> <p>অন্যের ভাল দেখলে সহ্য করতে পারি না । কেউ বাড়ি কিনলে, গাড়ী কিনলে, ভাল চাকুরী পেলে, সন্তানদের পরীক্ষায় ভাল ফলাফল দেখলে হিংসায় মরে যাই ।</p>

ইসলাম বলে	আমরা করি
<p><u>অন্যের প্রশংসা</u></p> <p>অন্যের ভালোর জন্য দু'আ করতে হয় আরো ভাল করার জন্য প্রশংসা করতে হয়, উৎসাহ দিতে হয়।</p>	<p><u>অন্যের প্রশংসা</u></p> <p>অন্যের প্রশংসা শুনতেই পারি না, গা জ্বালা-পোড়া করে।</p>
<p><u>অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়া</u></p> <p>যেমন কয়েকজন একসাথে খেতে বসেছি, নিজে খাওয়ার আগে অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়া, নিজে না নিয়ে ভাল জিনিসটি অন্যের পেটে আগে তুলে দেয়া।</p>	<p><u>নিজকে অগ্রাধিকার দেয়া</u></p> <p>যেটি ভাল সেটি আগে নিজের জন্য নিয়ে নেয়া বা রিজার্ভ করে রাখা।</p>
<p><u>ভালটি অন্যের জন্য</u></p> <p>নিজের জন্য যা পছন্দ করবে তা অপর ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ করতে হবে।</p>	<p><u>নিম্ন মানেরটি অন্যের জন্য</u></p> <p>যখন কোন কিছু ক্রয় করি তখন নিজের জন্য ভাল ভাল থেকে উৎকৃষ্টটা কিনি আর অপর ভাইয়ের জন্য উপহারস্বরূপ একটু কমদামী দেখে কিনি।</p>
<p><u>সত্য প্রকাশ করা</u></p> <p>সত্য বলা।</p>	<p><u>সত্য প্রকাশে লজ্জা বোধ করা</u></p> <p>সত্য প্রকাশ করতে আমরা লজ্জা পাই। যেমন, আমি ছোট চাকুরী করি বা আমার ঢাকায় বাড়ি নেই বা আমার ডিগ্রি কম বা আমার শ্বশুর বাড়ি গরীব ইত্যাদি।</p>
<p><u>সালামের ব্যবহার</u></p> <p>সালামের অর্থ একে অপরের জন্য দু'আ করা কল্যাণ কামনা করা। যিনি সালাম আগে দিবেন তিনি সওয়াব বেশী পাবেন। সালাম আদান-প্রদানের বিষয়ে কোন বয়সের ভেদাভেদ নেই।</p>	<p><u>সালামের ব্যবহার</u></p> <p>শুধুমাত্র বড়রা ছোটদের থেকে সালাম আশা করেন। বড়রা সাধারণত ছোটদের সালাম দেন না। শিক্ষক সবসময় ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে সালাম আশা করেন। মসজিদের ইমাম বা কোন ছজুর সবসময় অন্যদের থেকে সালাম আশা করেন।</p>

ইসলাম বলে	আমরা করি
<p><u>দ্বীন কাজে প্রতিযোগীতা করা</u></p> <p>দ্বীন ইসলামের কোন কাজে তাকওয়ার ভিত্তিতে এক মু'মিন অপর মু'মিনের সাথে প্রতিযোগীতা করবে।</p>	<p><u>দুনিয়াদারীতে প্রতিযোগীতা করা</u></p> <p>কিন্তু আমরা প্রতিবেশীর সাথে প্রতিযোগীতা করি বাড়ি, গাড়ি, শাড়ি, অলংকার ইত্যাদি নিয়ে।</p>
<p><u>বিয়েতে মাহর</u></p> <p>বিয়েতে মাহর নির্ধারণ করা হয়েছে স্বামীর জন্য স্ত্রীকে হালাল করার জন্য। এবং মাহর আদায় করতে হবে বাসর রাতের আগে এবং স্বামী যে পরিমাণ অর্থ নগদ দিতে পারবে তাই ধার্য করতে হবে, অতিরিক্ত নয়। এটা কোন সামাজিক স্ট্যাটাস রক্ষা নয়। এটা আল্লাহর আদেশ।</p>	<p><u>বিয়েতে দেনমোহর</u></p> <p>মোহর এখন এমন একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছে যে তা আত্মীয়স্বজনের মধ্যে টাকার অংক নিয়ে এক প্রকার প্রদর্শন করা যে কত বড় অংক ধার্য করা হয়েছে, পাত্র এই টাকা দিতে পারবে কি পারবে না সেটা বিষয় না। আর এই টাকা পাত্রীকে বাসর রাতের আগে সম্পূর্ণ দেয়াও হয় না। এছাড়া দুই পক্ষের মধ্যে মাহর নিয়ে এক প্রকার দর কষাকষি হয়।</p>
<p><u>পর্দা করা ফরয</u></p> <p>সলাত আদায় করা যেমন ফরয তেমনি নারীদের পর্দা করাও ফরয এবং তাদের সাজগোজ, রূপ-সৌন্দর্য পর পুরুষকে দেখানো যাবে না।</p>	<p><u>পর্দার বিকৃত ব্যবহার</u></p> <p>কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মেয়েরা সাধারণত সাজগোজ করে থাকে অন্যকে দেখানোর জন্য এবং রূপ-সৌন্দর্য প্রকাশ করে কোন অনুষ্ঠানে গেলে। খুব কম মেয়েই আছে শুধু স্বামীকে দেখানোর জন্য সাজগোজ করে।</p>
<p><u>কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য</u></p> <p>আল কুরআনের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষ এবং মানব জাতির কল্যাণের জন্য কুরআন নাযিল হয়েছে। মানব জাতি কী করলে ভাল থাকবে, কিভাবে চললে অকল্যাণ হবে তা রয়েছে গোটা কুরআনে।</p>	<p><u>কুরআনের অপব্যবহার</u></p> <p>কিন্তু আমরা বাস্তবে কুরআনকে ব্যবহার করছি মানুষ মারা গেলে খতম পড়ানোর জন্য, সূরা ইয়াসিন পড়ে শুনানো হচ্ছে মরা লাশকে, কুরআনের আয়াত লিখে তাবিজ বানিয়ে গলায় ঝুলিয়ে রাখা হচ্ছে।</p>



ইসলাম বলে	আমরা করি
<b>ফরযের গুরুত্ব</b> অনেকেই ফরয ইবাদতের গুরুত্ব দেই না। যেমন, নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করি না, হাজ্জের সামর্থ হয়েছে কিন্তু হাজ্জ করি না।	<b>নফলের গুরুত্ব</b> ফরয ঠিক মতো আদায় করি না কিন্তু নফলকে খুব বেশী গুরুত্ব দেই। যেমন, শবেবরাতে (বিদ'আত) সারারাত সলাত আদায় করি।
<b>সুন্নাহ অনুযায়ী ইবাদত</b> রসূল ﷺ তাঁর জীবনে যেভাবে ইবাদত করেছেন শুধুমাত্র সেটুকুই ইবাদত, সেটুকুই ইসলাম।	<b>বিদ'আতের মাধ্যমে ইবাদত</b> রসূল ﷺ জীবনে যা করেন নি সেই কাজগুলো আমরা ইবাদত মনে করে বেশী বেশী করছি যা সুস্পষ্ট বিদ'আত। যেমন, মিলাদ, চল্লিশা, মৃত্যুবার্ষিকী।

## তাকওয়া অবলম্বনের কিছু সুস্পষ্ট উদাহরণ

- আমি আমার অফিসের ফটোকপি মেশিন ব্যবহার করে কিছু কুরআনের আয়াত ও হাদীস ফটোকপি করে ইসলামের দাওয়াতী কাজে বিলি করলাম। এখানে আমার ভাল কাজ অবৈধ কাজের সাথে সংমিশ্রণ হয়ে গেল। অর্থাৎ প্রথম কাজটি ছিল অন্যায় কিন্তু দ্বিতীয় কাজটি ছিল ভাল।
- আমি সরকারী বাসায় থাকি এবং সেই বাসার একটা অংশ পার্ট টাইম ব্যবসার কাজে ব্যবহার করছি বা ভাড়া দিয়েছি যা হাউজিং অথরিটি থেকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আবার সরকারী বাসা ব্যবসার কাজে ব্যবহার করছি এবং ব্যবসার ইনকামের কোন ট্যাক্স ফাইলও করছি না। এখানেও হালাল - হারাম মিশ্রণ হয়ে যাচ্ছে।
- আমি যেখানে চাকুরী করি সেখানে নিয়মিত কাজে ফাঁকি দেই তা সাধারণভাবে ধরার কোন উপায় নেই। কিন্তু আমি যদি আল্লাহকে ভয় করি তাহলে অফিসে কোন বস না থাকলেও আমি আমার সব কাজকর্ম প্রতিদিন ঠিকমতোই করবো। কারণ আল্লাহ তো আমার ফাঁকিবার্জিটা দেখছেন।
- আমি জাহাঙ্গির নগর ইউনিভার্সিটির একজন ছাত্র। বাসে উঠে দেখলাম প্রতিটি দুই সিটের আসনে একটি করে সিট খালি আছে কিন্তু প্রতিটি সিটে

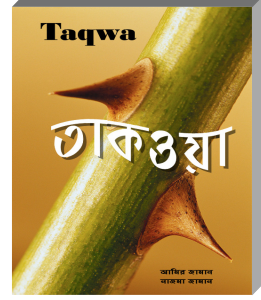
একজন করে মেয়ে বসে আছে। অর্থাৎ তিনজন মেয়ের পাশে একটি করে মোট তিনটি সিট খালি আছে আর মাত্র একটি সিট খালি আছে একজন ছেলের পাশে তাও আবার একেবারে বাসের পিছন দিকে। আমি এবার কোন সিটটিতে বসবো?

- আমার স্ত্রী-কন্যা যখন কোন ইসলামী অনুষ্ঠানে যান তখন সুন্দর হিযাব পরে যান অর্থাৎ পর্দা করেন। কিন্তু যখন অন্য কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে যান তখন পর্দা করেন না। এখানেও মূল বিষয়টি তাকওয়ার, কারণ আমি পর্দা কেন করি বা পর্দা কেন করবো তা পরিষ্কার না।
- আমি দিন দিন মোটা হয়ে যাচ্ছি। একজন আমাকে পরামর্শ দিলেন যে আপনি প্রতি সপ্তাহে দুই দিন নফল সিয়াম রাখেন তাহলেই স্লিম হয়ে যাবেন এছাড়া রসূল ﷺ ও সপ্তাহে দুই দিন সিয়াম পালন করতেন। আমরা সিয়াম পালন কেন করি? উদ্দেশ্য মহান আল্লাহকে খুশি করা। এখানে ঐ লোকের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নফল সিয়াম পালন করার মাধ্যমে শরীর স্বাস্থ্য কমানো। এক্ষেত্রেও তাকওয়ার বাস্তবতা দেখা যাচ্ছে।

**অতি দুঃখের বিষয় :** তাকওয়ার বিষয়টা খুবই সুক্ষ্ম। অনেক সময় দেখা যায় যে খুবই ঈমানদার লোক, ইসলামের সকল কাজকর্মই করেন কিন্তু অন্যের ভাল দেখে হিংসা করেন। তখন আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। কেন জানি অন্যের ভাল দেখলে সহ্য করতে পারেন না।

আজকাল টেকনোলজির যুগে বিভিন্ন দোকান, শপিংমল, অফিস, এপার্টমেন্ট বিভিন্ন জায়গাতেই নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগানো থাকে এবং সতর্কতামূলক সাইন লিখা থাকে যে “You are under video surveillance”। এ কারণে সেইসব এলাকায় অপরাধ খুবই কম হয়। ঠিক তেমনি আমরা যদি এটা বিশ্বাস করে থাকি যে আল্লাহও আমাদের সব কর্মকাণ্ড ২৪ ঘন্টা দেখছেন এবং রেকর্ড করছেন তাহলেও কিন্তু আমাদের মধ্যেও তাকওয়া বৃদ্ধি পাবে এবং অপরাধ প্রবণতা কমে যাবে। ভিডিও ক্যামেরাতো শুধু আমাদের বাহ্যিক দৃশ্যগুলো রেকর্ড করছে কিন্তু আল্লাহ শুধু আমাদের বাহ্যিক কর্মকাণ্ডই নয় মনের অবস্থাটাও জেনে যাচ্ছেন এবং তা রেকর্ড করছেন।

## অধিকার আদায়ে তাকওয়া



### মানব জীবনে তাকওয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মানব চরিত্রের অন্যতম সম্পদ তাকওয়া। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের মূল ভিত্তিও হচ্ছে এটি। মানুষের ব্যক্তিগত ও জাতীয় পর্যায়ে সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবনযাপনের চালিকা শক্তি হচ্ছে তাকওয়া। মানব জীবনে তাকওয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে :

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর।” (সূরা আলে ইমরান : ১০২)

আরো ইরশাদ হয়েছে : “আল্লাহর নিকট পৌঁছে না গোশত ও রক্ত (কুরবানীর পশুর)। বরং পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া।” (সূরা হাজ্জ : ৩৭)

তাকওয়া আল্লাহর নৈকট্য ও ভালোবাসা লাভ করার উপায়। কুরআনে আল্লাহ বলেন : “নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালবাসেন।” (সূরা তাওবা : ০৪)

আরো ইরশাদ হয়েছে : “এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর মনে রেখ, নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।” (সূরা বাকারা : ১৯৪)

মূলত তাকওয়া অবলম্বন জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায়। এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীসে আছে, দু’টি চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করতে পারবে না, একটি চোখ যা আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে, আর অপর চোখ যা আল্লাহর রাস্তায় পাহারারত অবস্থায় রাত্রি যাপন করে।

তাকওয়া শুধু জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয় না, বরং তা জাহান্নাতে প্রবেশ করতেও সাহায্য করে। যেমন আল্লাহ বলেন : “আর যে ব্যক্তি তার রবের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং নিজেকে কুপ্রবৃত্তি থেকে ফিরিয়ে রাখে নিশ্চয়ই জান্নাত হবে তার আবাসস্থল।” (সূরা নাযি‘আত : ৪০-৪১)

আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্রের ইরশাদ করেন : “মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে।” (সূরা দুখান : ৫১)

মুত্তাকী আল্লাহর নিকট সম্মানিত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন : “তোমাদের মাঝে সে ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানিত যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী।” (সূরা হুজুরাত : ১৩)

বস্তুত তাকওয়া সমাজ জীবনে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করে সমাজে একে অপরের মাঝে ইতিবাচক মূল্যবোধ গঠন করে অন্যদিকে তাকওয়ার অভাবে মানুষ চারিত্রিক পাপকর্মে লিপ্ত হয়ে সামাজিক জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে, যার নজীর বর্তমান বিশ্বের কোথাও-কোথাও বিরাজমান। সুতরাং মানব জীবনকে মানবতার কল্যাণে তথা সকল সৃষ্টির কল্যাণে নিবেদিত করলে তাকওয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য একান্তই অপরিহার্য।

## ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনে তাকওয়া

আমাদের অনেকের মধ্যেই একটা ভুল ধারণা বিদ্যমান যে যারা মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল বা শিক্ষক, খানকা বা মাজারের খাদেম, পীর সাহেব, যারা লম্বা জুব্বা পরেন, যাদের লম্বা দাড়ি আছে, যারা লম্বা পাগড়ী পরেন, যারা কালো বোরকা পরেন, যারা নিকাব করেন প্রমুখ ব্যক্তিগণই তাকওয়াবান এবং তাকওয়ার বিষয়টি শুধু তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর যারা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, প্রফেসর, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পাইলট, ব্যাংক ম্যানেজার, উকিল, ব্যারিস্টার, আর্মি অফিসার, থানার ওসি, ড্রাইভার, রিক্সাওয়ালা, বাদাম ওয়ালা, কৃষক, কন্ট্রাকটর, রাজনীতিবিদ, চেয়ারম্যান, এমপি, মিনিষ্টার, দেশের প্রেসিডেন্ট ইত্যাদি প্রফেশনের লোকদের জন্যে তাকওয়া নয়।

আসলে তাকওয়ার বিষয়টি নির্ভর করে ইলম এবং আমলের উপর। ইসলামের পরিভাষায় পরিষ্কার ভাবে বলা যায়, যার ভেতর দ্বীন ইসলামের জ্ঞান আছে এবং সেই অনুযায়ী যিনি আমল করেন তিনিই তাকওয়াবান। এখন একজন ইঞ্জিনিয়ার

বা একজন ডাক্তার বা একজন পাইলট বা একজন ব্যাংক ম্যানেজার বা একজন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর বা একজন ব্যারিস্টার বা একজন এমপি বা একজন মিনিষ্টার বা একজন থানার ওসি বা একজন বাস ড্রাইভারের মধ্যেও দ্বীন ইসলামের সঠিক জ্ঞান থাকতে পারে এবং সেই জ্ঞান অনুযায়ী যদি সে ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালনা করে থাকেন তাহলেই বাস্তবে তার তাকওয়ার প্রমাণ মিলবে।

এখন একটু বিশ্লেষণে আসি। কুরআন নাজিলের উদ্দেশ্য কী? কুরআন-হাদীসের মধ্যে আছেটা কী? আমরা জানি কুরআনের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষ। উদাহরণস্বরূপ এই পৃথিবীতে যতো জিনিস তৈরী হচ্ছে, যেমন, রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার, ফ্রিজ, গাড়ি, প্লেন, ট্রেন, সেলফোন ইত্যাদি বাজারজাত করার সময় কোম্পানী পণ্যের সাথে একটা করে অপারেটিং ম্যানুয়্যালও দিয়ে দেয়। ঠিক তেমনি, আল্লাহ যখন মানুষকে তৈরী করে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তখনও একটা ম্যানুয়্যাল সাথে দিয়ে দিয়েছেন, যার ভেতরে আছে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবন কিভাবে পরিচালনা করব এসব নিয়মাবলীর সেই ম্যানুয়্যাল হচ্ছে আল কুরআন। এরপর মহান আল্লাহ এতই দয়ালু যে তিনি শুধু ম্যানুয়্যাল পাঠিয়েই ক্ষান্ত হননি, তিনি আবার সাথে একজন ট্রেনারও পাঠিয়েছেন যিনি ঐ ম্যানুয়্যালটা তার বাস্তব জীবনে বাস্তবায়ন করে আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, আর সেই ট্রেনার হচ্ছেন মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ। রসূল ﷺ পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পরিচালনা পর্যন্ত সবকিছুই নিজে করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। এই আল-কুরআন হচ্ছে মানব জাতীর সকল সমস্যার সমাধান। যেমন : ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, অর্থনীতি, পৌরনীতি, রাষ্ট্রনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধনীতি, শিক্ষানীতি, চিকিৎসানীতি, ধর্মনীতি, আইননীতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি। এককথায়, There is no Deen without Dunya, অর্থাৎ দ্বীন ইসলাম এসেছেই দুনিয়াকে চালাবার জন্য। আর আমাদের সামাজিক জীবন হচ্ছে social engineering, আর এই social engineering হচ্ছে Islamic science এর একটা অংশ।

একটা সাধারণ common-sense হচ্ছে যারা বাস্তব জীবনের সাথে জড়িত যেমন : ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পাইলট, ব্যাংক ম্যানেজার, ব্যারিস্টার, এমপি, মিনিষ্টার, থানার ওসি, ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ইত্যাদি বিভিন্ন পেশার লোকেরা যদি কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপর পড়াশোনা করে তাকওয়ার উপর ভিত্তি

করে এই সমাজ এবং দেশকে পরিচালনা করেন তাহলেই কুরআনের সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভব। আর যারা কুরআন-হাদীস পড়ছেন ঠিকই কিন্তু বাস্তব জীবনের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই তাহলে কে এই সমাজ বা দেশকে কুরআনের আলোকে পরিবর্তন করবে? যেমন, যিনি finance বা economics-এ পড়াশোনা করেছেন বা M.B.A করেছেন তিনি যাকাত বা ইসলামিক ব্যাংকিং ভাল বুঝবেন। তাই আমাদের প্রয়োজন এমন শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে থাকবে general education এবং Islamic education এর combination।

সত্যিকার চিত্রটা হওয়ার কথা ছিল এমন যে, যখন মাগরিবের আজান হবে ডিউটিরত থানার ওসি সকল পুলিশদের সাথে নিয়ে জামাতে নামাযে দাঁড়িয়ে যাবেন এবং ইমামতি করবেন ওসি সাহেব নিজে, সলাত আদায় শেষে ১০/১৫ মিনিট কুরআন হাদীস থেকে ওসি সাহেব সিপাহীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষামূলক দিকনির্দেশনা নসিহত করবেন। একইভাবে যখন যোহরের আজান হয়ে যাবে তখন প্রত্যেকটা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীসাহেবগণ তার নিজ নিজ ডিপার্টমেন্টের সকলকে নিয়ে জামাতে নামাযের ইমামতি করবেন এবং মন্ত্রণালয় চালাবেন তাকওয়ার উপর ভিত্তি করে। আবার একইভাবে যোহর-আসর নামাযের আজান হলে ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলরের ইমামতিতে সকল ছাত্র-ছাত্রীরা জামাতের সাথে সলাত আদায় করবেন। জেলখানার জেলার সাহেব ডিউটিরত পুলিশ এবং সকল কয়েদীদের নিয়ে জামাতে সলাত তো আদায় করবেনই তার পাশাপাশি সাপ্তাহিক ইসলামী মাহফিল ও তাদেরকে নিয়ে জামাতে তাহাজ্জুদ এর সলাত আদায় করবেন। এভাবে যার যার এলাকার এমপি সাহেব জুম্মার সলাতের খুতবা দিবেন এবং ইমামতি করবেন। তিন বাহিনীর প্রধান সেনাদের নিয়ে মাসিক ইসলামিক সেমিনার ও ওয়ার্কসপ করবেন এবং কুরআনের শিক্ষা অন্যান্য অফিসারদের মাধ্যমে সারা দেশে ছড়িয়ে দিবেন। ঈদের সবচেয়ে বড় জামাতের ইমামতি করবেন রাষ্ট্রপতি নিজে এবং দেশবাসীর উদ্দেশ্যে তাকওয়া ভিত্তিক দেশ গঠনের জন্য খুতবা দিবেন। হ্যাঁ, কুরআন বলে যে, মুসলিমগণের মাঝে যারা সমাজ পরিচালনা করবেন বা দেশ পরিচালনা করবেন অথবা কোন নেতৃস্থানীয় স্থানে থাকবেন, তাদের অবশ্যই কুরআনের উপর যথেষ্ট দখল থাকতে হবে। আমাদের সকলের মধ্যে একটা ভুল ধারণা সবসময় কাজ করে যে, যারা মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেছেন কুরআন-হাদীস নিয়ে শুধু তারাই ইসলাম চর্চা করবেন এবং এই বিষয়টা শুধু তাদের, অন্যদের নয়।

সকল সেক্টরের প্রাফেশনালরা যদি তাকওয়ার উপর ভিত্তি করে নিজ নিজ ডিপার্টমেন্ট পরিচালনা করেন তাহলেই শুধু মাত্র ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সম্ভব। শিক্ষণীয় হিসেবে আমরা শ্রেষ্ঠ আদর্শ রাষ্ট্র পরিচালক চার খলিফার জীবনি থেকে দুই একটা ঘটনা দেখি।

### ঘটনা এক :

আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু যখন রাষ্ট্র প্রধান ছিলেন তখন তিনি উমর রাদিআল্লাহু আনহু -কে দেশের প্রধান বিচারপতি (Chief Justice) হিসেবে নিয়োগ দেন। উমর রাদিআল্লাহু আনহু দীর্ঘ দিন এই পদে থাকার পর একদিন রাষ্ট্র প্রধানের নিকট এসে অভিযোগ করলেন যে - “মোহতারাম, আমাকে প্রধান বিচারকের পদ থেকে অব্যাহতি দেন। কারণ আমি কাজ বিহীন দীর্ঘ দিন অলস জীবনযাপন করছি।” আবু বকর এর কারণ জানতে চাইলে, উমর রাদিআল্লাহু আনহু জানালেন যে - “আমি এই দায়িত্ব পদ পাওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত কোর্টে একটি কেইস ও আসিনি। তার কারণ হচ্ছে দেশের জনগন আল্লাহর আইন পালনে এতই তাকওয়াবান হয়ে গেছে যে কারো বিরুদ্ধে কারো কোন অভিযোগ নেই। যারা এক সময় সম্পদের ভক্ষক ছিল তারা সম্পদের রক্ষক হয়ে গেছে, যারা নারীর সতিত্বের হরণকারী ছিল তারা নারীর অভিভাবক হয়ে গেছে।” আলহামদুলিল্লাহ। আর এর সব কিছুর মূলে হলো তাকওয়া।

### ঘটনা দুই :

উমর রাদিআল্লাহু আনহু যখন রাষ্ট্র প্রধান ছিলেন তখন তিনি গভীর রাতে ঘুরে ঘুরে দেখতেন দেশের জনগণের প্রকৃত অবস্থা। এক রাতে তিনি মরুভূমির মধ্যে কোন এক তাবু থেকে বাচ্চাদের কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন। এতো গভীর রাতে বাচ্চাদের কান্না! তাই তিনি ঘটনা জানবার জন্য এগিয়ে গেলেন। কাছে গিয়ে দেখলেন এক মহিলা হাড়ির মধ্যে কিছু একটা রান্না করছেন এবং বাচ্চাদের এই বলে শান্তনা দিচ্ছেন যে মাংস রান্না হচ্ছে অপেক্ষা কর। উমর রাদিআল্লাহু আনহু মহিলার কাছে আসল ঘটনা জানতে চাইলেন, মহিলা প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করলেন যে - “আমি খুবই দরিদ্র, আমি মদীনা স্টেটের লোক নই, আমি অন্য স্টেট থেকে এসেছি, আমার ঘরে কোন খাবার নেই। বাচ্চারা ক্ষুধার যন্ত্রনায় কান্না-কাটি করছে। আমি বাচ্চাদের শান্তনা দেয়ার জন্য হাড়ির মধ্যে পাথর আর পানি দিয়ে জাল দিচ্ছি যেন এক সময় তারা কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে যায় কিন্তু ক্ষুধা এমনই প্রকট যে ক্ষুধার তাড়নায় তাদের ঘুম আসছে না।” উমর

রাদিআল্লাহ্ আনহু মহিলাকে বললেন, আপনি একটু অপেক্ষা করুন আমি এক্ষুনি আসছি। উমর রাদিআল্লাহ্ আনহু দ্রুত গতিতে চলে গেলেন রাষ্ট্রীয় বায়তুলমাল গোড়াউনে এবং নিজে কাঁধে বোঝা বহন করে নিয়ে এলেন ঐ মহিলার নিকট। মহিলা রুটি তৈরী করলেন ও তরকারী রান্না করলেন এবং উমর রাদিআল্লাহ্ আনহু তাকে রান্নার কাজে সহায়তা করলেন যাতে দ্রুত খাবার তৈরী হয়। রান্না শেষে উমর রাদিআল্লাহ্ আনহু বাচ্চাদের নিজ কোলে বসিয়ে তাদেরকে আহার করালেন। এসময় উমর রাদিআল্লাহ্ আনহু -র দুই চোখ দিয়ে পানি ঝড়ছে আর দাড়ি বেয়ে বেয়ে পরছে। এই দৃশ্য দেখে ঐ মহিলা উক্তি করছেন যে - “এই দেশের রাষ্ট্র প্রধান যদি উমর রাদিআল্লাহ্ আনহু না হয়ে আপনি হতেন তাহলে কতোই না ভাল হতো!” উমর ঐ মুহূর্তে নিজ পরিচয় না দিয়ে মহিলাকে আগামী কাল দিনে খলিফার দরবারে আসতে অনুরোধ করলেন। পরবর্তী দিনে মহিলা খলিফার দরবারে গিয়ে দেখতে পেলেন যে গত রাতের ঐ ব্যক্তিটিই তো খলিফা উমর রাদিআল্লাহ্ আনহু। মহিলা উমর রাদিআল্লাহ্ আনহু-র কাছে ক্ষমা চাইলেন। কিন্তু উমর রাদিআল্লাহ্ আনহু মহিলাকে বললেন - “আপনি তো উল্টো করছেন, ক্ষমা তো আমি আপনার কাছে চাইবো, কারণ এই ঘটনার জন্য না জানি মহান আল্লাহর দরবারে আমাকে কী জবাবদিহি করতে হয়! আসামীর কাঠগড়ায় দাড়াতে হয়! সেজন্য আমি সংকিত, দয়া করে আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন, কারণ আমি আপনার দুঃসময়ে খোঁজ নিতে পারিনি, আপনি চাওয়ার আগে আপনার ঘরে খাবার পৌছাতে পারিনি।” এই হলো প্রকৃত তাকওয়ার পরিচয়। একজন রাষ্ট্র প্রধানকে তার দেশের প্রতিটি জনগনের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে।

## স্বামী-স্ত্রীর অধিকার আদায় ও তাকওয়া

ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়কেই যেমন সৃষ্টিকুলের মধ্যে বিশেষ সম্মানিত মর্যাদায় ভূষিত করেছে তেমনি নারী ও পুরুষের মধ্যে তাকওয়ার ভিত্তিতে বিশেষ কতগুলো গুণের উপস্থিতিও ইসলামের দৃষ্টিতে কাম্য। এ গুণগুলোই তাদের পূর্ণ আদর্শবাদী বানিয়ে দেয় এবং এ আদর্শবাদ চিরউজ্জ্বল ও বাস্তবায়িত রাখতে পারলেই ইসলামের দেয়া সে মর্যাদা নারী ও পুরুষ পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করতে পারে। আল্লাহ তা’আলা কুরআনে এরশাদ করেছেন :

“আল্লাহর অনুগত পুরুষ ও স্ত্রীলোক, ঈমানদার পুরুষ ও স্ত্রীলোক, আল্লাহর দিকে মনোযোগদানকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক, সত্য ন্যায্যবাদী পুরুষ ও স্ত্রীলোক,



সত্যের পথে দৃঢ়তা প্রদর্শনকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক, আল্লাহর নিকট বিনীত নম্র পুরুষ ও স্ত্রীলোক, দানশীল পুরুষ ও স্ত্রীলোক, সিয়ামদার পুরুষ ও স্ত্রীলোক, নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক, আল্লাহকে অধিক মাত্রায় স্মরণকারী পুরুষ ও স্ত্রীলোক – আল্লাহ তা’আলা এদের জন্যে স্বীয় ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন। কোনো ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার স্ত্রীলোকের জন্যে – আল্লাহ ও তাঁর রসূল যখন কোনো বিষয়ে চূড়ান্তভাবে ফয়সালা করে দেন, তখন সেই ব্যাপারে তার বিপরীত কিছুই ইখতিয়ার ও স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করার অধিকার কোন মু’মিনের নেই। আর যে লোক আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করে, সে সুস্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে লিপ্ত হয়।”  
(সূরা আহযাব : ৩৫-৩৬)

## স্ত্রীর অধিকার আদায়

হে মুসলিম জনতা! স্ত্রীদের অধিকার সম্পর্কে তোমরা আল্লাহকে অবশ্যই ভয় করতে থাকবে। মনে রেখো, তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে পেয়েছ এবং আল্লাহর কালেমার সাহায্যে তাদের ভোগ করাকে নিজের জন্যে হালাল করে নিয়েছো। (সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ)

## সম্মান ও সদাচার

তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন কর। (সূরা নিসা, ৪ : ১৯ অংশ)

রসূল ﷺ তার কন্যাদেরকে নিজের আসন ছেড়ে দিতেন কপালে চুমু খেতেন। ইবনে আব্বাস বলেন : নাবী ﷺ তার স্ত্রী ও কন্যাসহ ঈদে গমন করতেন। (ইবনে মাযাহ)

## অর্থনৈতিক অধিকার...মোহরানা

এবং স্ত্রীদের মোহর মনের সন্তোষ সহকারে আদায় কর। (সূরা নিসা, ৪ : ৪)

...সুতরাং বিনিময়ে তোমরা তাদের থেকে যে স্বাদ আশ্বাদন করেছ তার চুক্তি অনুযায়ী তাদের মোহর পরিশোধ কর। (সূরা নিসা, ৪ : ২৪)

...এবং ন্যায়সঙ্গত পরিমাণে মোহর আদায় কর..। (সূরা নিসা, ৪ : ২৫)

...নারীদের তোমাদের জন্যে হালাল করা হল, তবে শর্ত হচ্ছে— তোমরা তাদেরকে মোহর প্রদানের বিনিময়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করবে। (সূরা মায়দা : ৫)

## চাকুরী বা ব্যবসায়িক অর্থ একান্তই নারীর নিজের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত অর্থও নারীর নিজের সম্পদ

উত্তরাধিকারের হিস্যা আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, মহাজ্ঞানী। (সূরা নিসা, ৪ : ১১)

### ভরণপোষণ

ধনী ব্যক্তির ওপর তার সামর্থ অনুযায়ী এবং গরীব ব্যক্তির ওপর তার সামর্থ অনুযায়ী ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা কর্তব্য। (সূরা বাকারা, ২ : ২৩৬)

...আর পিতার কর্তব্য হল তাদের (স্ত্রী ও সন্তানদের) যথাবিধি ভরণপোষণ করা...। (সূরা বাকারা, ২ : ২৪১)

স্ত্রী রেখে মৃত্যুবরণ করলে স্ত্রীকে ১ বছরের ভরণপোষণের অসিয়ত করে যাবে। (সূরা বাকারা, ২ : ২৪০)

### ভালোবাসা ও দয়া

আর তাঁর নিদর্শনবলীর মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি লাভ কর এবং সৃষ্টি করেছেন ভালোবাসা ও দয়া। (সূরা রুম, ৩০ : ২১)

## স্বামীর অধিকার আদায়

### স্বামীর আনুগত্য করা

“নারীদের তেমনি ন্যায়-সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের কিছুটা মর্যাদা আছে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়”। (সূরা বাকারা : ২২৮)

“পুরুষ নারীর কর্তা। কারণ, আল্লাহ তাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এ জন্য যে পুরুষ [তাদের জন্য] সম্পদ ব্যয় করে।” (সূরা নিসা : ৩৪)

মহানাবী صلی اللہ علیہ وسلم বলেন, মহিলা যখন তার পাঁচ ওয়াক্তের সলাত আদায় করে, রমাদানের সিয়াম পালন করে, নিজের ইজ্জতের হিফায়ত করে এবং স্বামীর কথা মত চলে, তখন জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছামত প্রবেশ করতে পারবে। (আহমাদ)

এক মহিলা নাবী صلی اللہ علیہ وسلم-এর নিকট কোন প্রয়োজনে এলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তোমার কি স্বামী আছে?’ মহিলাটি বলল, ‘জী হ্যাঁ।’ তিনি বললেন, ‘তার কাছে তোমার অবস্থান কী?’ সে বলল, ‘যথাসাধ্য আমি তার সেবা করি।’ তিনি বললেন, ‘খেয়াল করো, তার কাছে তোমার অবস্থান কোথায়। যেহেতু সে তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম।’ (আহমাদ, নাসাঈ, বায়হাকী)

তবে আনুগত্য হবে বৈধ বিষয়ে, হারাম বিষয়ে নয়। স্বামী পর্দা করতে নিষেধ করলে, সলাত-সিয়াম করতে নিষেধ করলে, তা মানা যাবে না। যেহেতু ‘স্রষ্টার আবধ্যতা করে কোন সৃষ্টির আনুগত্য বৈধ নয়।’ (আহমাদ)

### স্বামীর আবধ্য ও অকৃতজ্ঞ না হওয়া

ইবনু আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী صلی اللہ علیہ وسلم বলেছেন, আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়। (আমি দেখি), তার অধিবাসীদের বেশীরভাগই নারীজাতি; (কারণ) তারা কুফরী করে। জিজ্ঞেস করা হল, ‘তারা কি আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করে?’ তিনি বললেন : ‘তারা স্বামীর আবধ্য হয় এবং অকৃতজ্ঞ হয়।’ তুমি যদি দীর্ঘদিন তাদের কারো প্রতি ইহসান করতে থাক, অতঃপর সে তোমার সামান্য অবহেলা দেখতে পেলেই বলে ফেলে, ‘আমি কক্ষণো তোমার নিকট হতে ভাল ব্যবহার পাইনি।’ (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, আহমাদ)

স্বামীকে না মানলে স্ত্রীর সলাত কবুল হয় না। মহানাবী صلی اللہ علیہ وسلم বলেন, ‘তিন ব্যক্তির সলাত তাদের কান অতিক্রম করে না; পলাতক ক্রীতদাস, যতক্ষণ না সে ফিরে এসেছে, এমন স্ত্রী যার স্বামী তার উপর রাগান্বিত অবস্থায় রাত্রিযাপন করেছে, [যতক্ষণ না সে রাজী হয়েছে], [অথবা যে স্ত্রী তার স্বামীর আবধ্যাচারণ করেছে, সে তার বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত] এবং সেই সম্প্রদায়ের ইমাম, যাকে লোকে অপছন্দ করে।’ (তিরমিযী, ত্বাবারানী)

## স্বামীর সম্পদ ও গোপন বিষয়সমূহের হিফাজত

এবং তাদের অবর্তমানে আল্লাহর অনুগ্রহে তার যাবতীয় অধিকার সংরক্ষণশালিনী হয়ে থাকে। (সূরা নিসা, ৪ : ৩৪)

সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা তাদের স্বামীদের অনুগত হয়ে থাকে। (সূরা নিসা : ৩৪)

## স্বামীর যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা

রসূল ﷺ আরো বলেছেন : যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিজ বিছানায় ডাকে এবং সে না আসে, অতঃপর সে [স্বামী] তার প্রতি নারাজ অবস্থায় রাত কাটায়, তাহলে ফিরিশতাগণ তাকে [স্ত্রীকে] সকাল অবধি অভিসম্পাত করতে থাকেন। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুমলিম)

## সন্তান প্রতিপালনে তাকওয়া

সূরা মুনাফিকুন এর ৯ নং আয়াতে মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সতর্ক করে বলেছেন : “মু'মিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে না দেয়।” আবার সূরা আত-তাগাবুন এর ১৫ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : “তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষাস্বরূপ। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে মহাপুরস্কার”।

সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমরা কত কিছুই না করছি। আর সেই সন্তান যদি সত্যিকার অর্থে “মুসলিম” না হয় তাহলে আমাদেরকে আখিরাতের ময়দানে কঠিন জবাবদিহি করতে হবে। এবং এই সন্তানই ঐদিন তার পিতা-মাতার বিরুদ্ধে সাক্ষি দেবে। তাই আমরা যেন সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে one-way চিন্তা না করি।

পিতামাতারা সন্তানদের ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে ব্যর্থ হলে এর জন্যে একদিন চরম মাশুল দিতে হবে। যদি মনে করি যে ভাল স্কুলে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিলেই আমি চিন্তামুক্ত, এখন কেবল সন্তানের ভাল, রিজাল্টস্ আর ভাল চাকুরীর অপেক্ষা, আর এভাবেই আমার সন্তান একজন বড় কর্মকর্তা হবেন। এভাবে ওয়ান ওয়ে চিন্তা করলে আমার সন্তান একজন বড় কর্মকর্তা হওয়ার পাশাপাশি একজন অমানুষ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। কারণ স্কুল, কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার এমন কোন ব্যবস্থা নেই যেখানে নীতি

নৈতিকতা শেখানো হয় যা ইসলামের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই আমাদের প্রজেক্ট হবে সন্তানদের তাকওয়ার ভিত্তির উপর একজন ভাল একাডেমিক হওয়ার পাশাপাশি একজন ভাল মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলা।

## মাতা-পিতার অধিকার ও তাকওয়া

ইসলামে মাতা-পিতার অধিকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাতা-পিতা বৃদ্ধ হয়ে গেলে তাদের সমস্ত দায়-দায়িত্ব সন্তানের। বাবা-মা বৃদ্ধ হয়ে গেলে তারা খুবই অসহায় হয়ে পড়েন, তারা সন্তানদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। অনেক সন্তানই এই বিষয়টা বুঝেন না। তারা বৃদ্ধ বাবা-মাকে বাড়তি বোঝা মনে করেন। নিজেদের ব্যস্ততা নিয়ে নিজেদের মতো সময় কাটান কিন্তু বাবা-মাকে সময় দেন না যা খুবই কষ্টকর। মনে রাখতে হবে মাতা-পিতা যদি কষ্টে জীবনযাপন করেন তাহলে সন্তানকে এজন্য আল্লাহর দরবারে কঠিন জবাবদিহি করতে হবে। তাই মা-বাবার সাথে সবসময় তাকওয়ার ভিত্তিতে উত্তম ব্যবহার করতে হবে, তাদেরকে দেখাশোনা করতে হবে।

## ছোট ভাইবোনদের প্রতি বড় ভাইয়ের অবহেলা

বাবা মারা গেলে অথবা বাবা বৃদ্ধ হয়ে গেলে অথবা বাবা শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে গেলে বড় ভাইয়ের দায়িত্ব ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনা করা। এই দায়িত্ব হতে হবে তাকওয়ার ভিত্তিতে। ছোট ভাইবোনদের পড়াশোনা থেকে শুরু করে অন্যান্য প্রয়োজন মিটানো বড় ভাইয়ের দায়িত্ব। অতি দুঃখের বিষয় যে, বাস্তবে আমাদের সমাজে দেখা যায় যে বাবা মারা যাওয়ার পর অনেক বড় ভাই-ই ছোট ভাইবোনদের ঠিক মতো দেখেন না। তাদেরকে অবহেলা করেন, তাদেরকে বোঝা মনে করেন। আর বড় ভাই যদি বিবাহিত হন তাহলে তো অবস্থা আরো করুণ আকার ধারণ করে। আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা যে কত বড় অন্যায় তা বড় ভাইয়েরা জানেন না। এই ছোট ভাইবোনরা যদি ঠিক মতো মানুষ না হয় তাহলে তার জন্য বড় ভাইকে মহান আল্লাহর দরবারে জবাব দিতে হবে। আমাদের সমাজে আবার কিছু ব্যতিক্রমও আছে, যেমন বড় ভাই তার ছোট ভাইবোনদের জন্য যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেন, তাদেরকে একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি দ্বীনি শিক্ষায়ও শিক্ষিত করে গড়ে তুলেন।

## অন্যান্যদের অধিকার ও তাকওয়া

অন্যান্যদের অধিকারের মধ্যে আরো রয়েছে প্রতিবেশীর অধিকার এবং আত্মীয়ের অধিকার। প্রতিবেশীর অধিকার এবং আত্মীয়ের অধিকার নিয়ে কুরআন এবং হাদীসে অনেক জায়গায় বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এছাড়া রয়েছে শ্রমিকের অধিকার যেমন রিক্তাওয়ালার অধিকার, গার্মেন্টস শ্রমিকদের অধিকার, যারা ইট ভাঙেন তাদের অধিকার, বাসার দাড়াওয়ানের অধিকার, মালির অধিকার ইত্যাদি। সবার ক্ষেত্রেই তাকওয়া অবলম্বন করার কথা। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় হচ্ছে অনেক গার্মেন্টস মালিক পক্ষই তাদের শ্রমিকদের ঠকিয়ে থাকেন, অনেক কন্ট্রাকটররাই ইট ভাঙার পর ঠিকমতো শ্রমিককে মুজুরী দেন না, অনেক সাহেবরাই তাদের বাড়ির দাড়াওয়ান বা মালিকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেন না, বরং তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করেন। অথচ এদের পরিশ্রমের মাধ্যমেই একটি শ্রেণী বড়লোক থেকে আরো বড়লোক হচ্ছে।

## কাজের বুয়ার অধিকার ও তাকওয়া

বিভিন্ন মানুষের অধিকারের মধ্যে কাজের বুয়া বা কাজের লোকের অধিকারও গুরুত্বপূর্ণ। তেমনি রয়েছে দারওয়ান, ড্রাইভার এবং মালির অধিকার। যেমন কাজের বুয়ার অধিকার আদায়ের জন্য সিংগাপুর সরকার আইন করে দিয়েছে। কোন মালিক যদি নিজ বাসায় কাজের বুয়া রাখতে চায় তাহলে তাকে আগে একটি সিলেবাস পড়ে পরীক্ষা দিয়ে সার্টিফিকেট নিতে হয়। এই সিলেবাসের মধ্যে রয়েছে কাজের বুয়ার সমস্ত অধিকার। এই নিয়ম একটি অমুসলিম দেশের সরকার বাস্তবায়ন করেছে কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক মুসলিম দেশেও এই আইন নেই। কাজের বুয়ার অধিকারগুলো ১৪শত বছর আগেই আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দিয়ে রেখেছেন যা আমরা মুসলিমরা মান্য করি না বরং তাদেরকে নির্যাতন করি।

## আয়-রোজ্জগারের ক্ষেত্রে তাকওয়া

### ইবাদত কবুলের পূর্ব শর্ত হালাল ইনকাম

প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর হালাল রজির সন্ধান করা অবশ্য কর্তব্য। কেননা হালাল সম্পদ বা খাদ্যই হলো ইবাদত কবুলের শর্তসমূহের মধ্যে অন্যতম প্রধান শর্ত। হালাল উপায়ে অর্জিত ও শরীয়ত অনুমোদিত অর্থ-সম্পদ বা খাদ্যগ্রহণ ছাড়া আল্লাহর দরবারে কোন ইবাদতই কবুল হয় না।

জীবিকা নির্বাহের জন্য উপার্জনের গুরুত্ব ইসলামে যেমনি রয়েছে, ঠিক তেমনি হালাল উপার্জনের গুরুত্বও অত্যাধিক। ইসলাম অর্থসম্পদ উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের পার্থক্য সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে। সমাজ রাষ্ট্র ও ব্যক্তির জন্য কল্যাণকর যাবতীয় ব্যবস্থাকে ইসলাম হালাল করেছে।

### এক. হালাল উপার্জন একটি অলঙ্ঘনীয় বিধান

ইসলাম মানুষের জন্য হালাল ও হারামের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নিরূপন করেই শেষ করেনি, বরং হালাল উপার্জনে রয়েছে এর সুস্পষ্ট নির্দেশনা। ফরয ইবাদত সমূহের আদায়ের পর এ মহতি কর্মে ঝাপিয়ে পরতে উৎসাহিত করা হয়েছে। উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল ও বৈধ উপায় অবলম্বন করা ব্যবসায়ীসহ সকল মানুষের উপর ইসলামের একটি অলঙ্ঘনীয় বিধান। যারা উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল ও হারামের প্রশ্নে সতর্কতা অবলম্বন করে না তাদের ব্যপারে রসূলুল্লাহ ﷺ সতর্কবাণী করেছেন। তিনি বলেন : মানুষের নিকট এমন একটি সময় আসবে, যখন ব্যক্তি কোন উৎস থেকে সম্পদ আহরন করছে, তা হালাল না হারাম, সেদিকে কোন ভ্রক্ষেপ করবে না। (সহীহ বুখারী)

### দুই. হালাল উপার্জন দু'আ কবুলের পূর্বশর্ত

মানুষের প্রাত্যহিক ও জাগতিক জীবনের চাহিদার কোন অন্ত নেই। তবে এগুলো মানুষের কাঙ্ক্ষিত হলেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মহান স্রষ্টার অনুগ্রহের, ভূমিকাই সবচেয়ে বেশী। আর এর জন্য প্রয়োজন একান্তে তাঁর দরবারে আরাধনা করা। মহান আল্লাহও মানুষকে এ ব্যাপারে সাড়া দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এটি অন্যতম ইবাদতও বটে। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : “দু'আ হচ্ছে ইবাদত” (আবু দাউদ)

অতএব দু'আ ইসলামে অন্যতম একটি ইবাদতে পরিণত হয়েছে, যার মাধ্যমে বান্দার সাথে আল্লাহর গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং যাবতীয় প্রয়োজন পূরণে সহায়ক হয়। এ গুরুত্বপূর্ণ কর্মটি আল্লাহর দরবারে গৃহীত হতে হলে উপার্জন অবশ্যই হালাল হতে হবে। কেননা আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র ছাড়া কোন কিছুই গ্রহণ করেন না, অতএব অবৈধ উপার্জন যারা করে তাদের খাদ্যের উপার্জন অবৈধ অর্থে হওয়ায় তার যাবতীয় রক্ত মাংস সবই হারাম দ্বারা পুষ্টি হয়। ফলে এ ধরনের ব্যক্তির প্রার্থনাকে ইসলামে কখনো সমর্থন করেনা। এ মর্মে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা পবিত্র। তিনি শুধু পবিত্র বস্তুই গ্রহণ করেন। তিনি মু'মিনদের সেই আদেশই দিয়েছেন, যে আদেশ তিনি দিয়েছিলেন রসূলদিগকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন : “হে ইমানদারগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু-সামগ্রী আহার কর, যেগুলো আমি তোমাদেরকে রক্ষী হিসেবে দান করেছি।” অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে দীর্ঘ সফরে থাকা অবস্থায় এলোমেলো চুল ও ধূলি-ধুসরিত ক্লান্ত-শ্রান্ত বদনে আকাশের দিকে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে প্রার্থনা করে ডাকছে : হে আমার প্রভূ! হে আমার প্রভূ! অথচ সে যা খায় তা হারাম, যা পান করে তা হারাম, যা পরিধান করে তা হারাম এবং হারামের দ্বারা সে পুষ্টি অর্জন করে। তার প্রার্থনা কিভাবে কবুল হবে?” (সহীহ মুসলিম)

### তিন. হালাল উপার্জনে বরকত লাভ হয়

উপার্জনে বরকত লাভ করতে হলে একমাত্র হালাল পন্থায় হতে হবে। কেননা বরকত দানের মালিক মহান আল্লাহ। তিনি শুধু বৈধ উপার্জনেকেই বরকত মণ্ডিত করেন এবং যাবতীয় অবৈধ উপার্জনের বরকত নষ্ট করে দেন। আর সেখানে অপচয় বৃদ্ধি পায় ফলে সম্পদের প্রাচুর্যতা লাভে বিলম্ব হয়। অন্যদিকে হালাল উপার্জন কম হলেও তাতে বরকতের কারণে খুব স্বল্প সময়েই বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

### চার. হালাল উপার্জন জ্ঞানাত লাভের একমাত্র উপায়

মানুষের দু'টি জীবন রয়েছে, একটি ইহলৌকিক, অপরটি পরলৌকিক। অতএব হালাল পন্থায় উপার্জনকারী পরকালে জ্ঞানাতে যাবে। আর অবৈধ পন্থায় উপার্জনকারী ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে সম্পদের পাহাড় গড়লেও পরকালীন জীবনে তার জন্য ভয়াবহ আযাব ও শাস্তি অপেক্ষা করছে।

### পাঁচ. অবৈধ উপায়ে সম্পদ উপার্জনকারীর জন্য জাহান্নাম অবধারিত

ইবন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : “আর যে দেহ হারাম খাদ্য দ্বারা গড়ে উঠে তার জন্য দোযখের আগুনই উত্তম।”

কাব ইবন উজরাহ রাদিআল্লাহু আনহু রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন : “যে শরীর হারাম পেয়ে হ্রষ্ট পুষ্ট হয়েছে, তা জাহান্নামে যাবে না।”



ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর নির্ধারিত রিযিক পূর্ণ মাত্রায় লাভ না করা পর্যন্ত কোন লোকই মারা যাবে না। সাবধান! আল্লাহকে ভয় কর এবং বৈধ পন্থায় আয় উপার্জনের চেষ্টা কর। রিযিক প্রাপ্তিতে বিলম্ব যেন তোমাদেরকে অবৈধ পন্থা অবলম্বনে প্ররোচিত না করে। কেননা আল্লাহর কাছে যা কিছু রয়েছে তা কেবল আনুগত্যের মাধ্যমে লাভ করা যায়। (সুনান ইবনে মাজাহ)

দুনিয়ার জীবনের কৃতকর্মের উপর ভিত্তি করে মহান আল্লাহ মানুষের জন্য পুরস্কার ও শাস্তি উভয়ের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। যারা তাঁর অনুগত বান্দা তারাই পুরস্কার প্রাপ্ত হবে। যেহেতু অবৈধ উপায়ে উপার্জনকারী ব্যক্তি তার অবাধ্য ও শত্রু তাই তাদের জন্যও শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। অতএব এ পন্থা অবলম্বনকারী ব্যক্তি জাহান্নামী।

## হয়. হালাল উপার্জন ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত

অর্থ-সম্পদ দ্বারাই মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে, খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে তার দেহের বৃদ্ধি ঘটে এবং সুস্বাস্থ্য লাভ হয়। কিন্তু এ উপকরণ ক্রয়ের অর্থ যদি অবৈধ উপায়ে উপার্জিত হয় তবে তা কিভাবে বৈধ শারিরিক বৃদ্ধি হতে পারে! ফলে তার শরীরের রক্তে ও মাংসে অবৈধ বিষয়ের সংমিশ্রণ ঘটে। আর এর দ্বারা যত ইবাদতই করা হোক না তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কেননা আল্লাহ অপবিত্র কোন কিছুই গ্রহণ করে না। অতএব হালাল উপার্জন ইবাদত কবুলের পূর্ব শর্ত। সলাত, যাকাত ও হাজ্জ ইত্যাদি ফরয ইবাদতসমূহ কবুল হওয়ার জন্য অবশ্যই বৈধ পন্থায় উপার্জন করতে হবে। খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন হালাল উপার্জনের অশ্বেষক তাঁরা যাবতীয় লেনদেন হালাল পন্থা অবলম্বন করতেন। হারামের ভয়াবহতা সম্পর্কে তারা খুবই সচেতন ছিলেন।

আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু এর একটি ঘটনা থেকে তাঁর হারাম বর্জন প্রবণতা ও হালালের বিষয়ে কঠোরতা সহজেই অনুমেয়। বর্ণিত আছে যে, আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু এর এক দাস ছিল সে তাঁর সঙ্গে কিছু অর্থের বিনিময়ে মুক্তির চুক্তি পত্র করে। অতঃপর সে যখন প্রতিদিন মুক্তিপনের কিছু অর্থ নিয়ে আসতো, তখন আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু তাকে জিজ্ঞাসা করতেন, এ অর্থ কিভাবে সংগ্রহ করেছে? যদি সে সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারতো, তবেই তিনি তা গ্রহণ ও ব্যবহার করতেন। অন্যথায় ব্যবহার করতেন না। এক রাতে সে আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু এর জন্য কিছু খাবার নিয়ে এলো। সেদিন তিনি সিয়াম

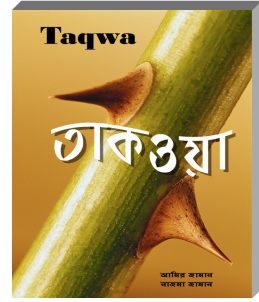
পালন করেছিলেন। তাই সেই খাবার সম্পর্কে প্রশ্ন করতে ভুলে যান এবং তা থেকে এক লোকমা খেয়ে ফেলেন। অতঃপর মনে হওয়া মাত্র তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ খাবার তুমি কিভাবে অর্জন করেছ? সে বললো : জাহিলিয়াতের আমলে আমি মানুষের ভাগ্য গণনা করতাম। আমি ভাল গণক ছিলাম না। তাই মানুষকে শুধু ধোঁকা দিতাম। এই খাবার সেই ধোঁকার মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ দিয়ে সংগৃহীত। আবু বকর (রা.) বললেন : সর্বনাশ তুমি আমায় একি করেছ! অতঃপর তিনি গলায় আংগুল দিয়ে বমি করার চেষ্টা করেন, কিন্তু সে খাবারের কিছুই বের হয়নি। অতঃপর তিনি পানি পান করে ইচ্ছাকৃত বমির মাধ্যমে পেটের সব খাবার বের করে দিলেন। তিনি আরো বললেন : উক্ত খাবার বের করতে গিয়ে আমার মৃত্যুর ঝুঁকি থাকত তাহলেও তা বের করে ছাড়তাম। কেননা রসূল ﷺ বলেছেন : “যে শরীর হারাম খাদ্য দিয়ে স্বাস্থ্য লাভ করে, তার জন্য জাহান্নাম উপযুক্ত স্থান। তাই আমি ভয় পেয়ে যাই, যে এক লোকমা হারাম খাবার দিয়ে আমার শরীর কিভাবে মোটা-তাজা হতে পারে।”

## পরহেজগারী

“পরহেজ” ফার্সি শব্দ যার অর্থ সকল গুনাহের কাজ বর্জন করা। সমাজে আমরা অনেকে পরহেজগার (দ্বীনদার) বলে পরিচিত, অনেকে সলাত আদায় করতে করতে কপালে দাগ ফেলে দিয়েছি, কেউ কেউ পরহেজগারীকে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত, আর কয়েকবার হাজের মধ্যে সীমিত করে ফেলেছি। অনেকে চিল্লা দিতে দিতে অনেক বড় বুজুর্গ বনে গেছি। অনেকে সারা রাত জেগে তাহাজ্জুদ সলাত পড়তে পড়তে দুই চোখ ফুলিয়ে ফেলেছি। অনেকে মোরাকাবা আর যিকর করতে করতে আল্লাহর ওলি হয়ে গেছি বলে মনে করছি। অনেকে ইসলামী আন্দোলন করতে করতে অনেক বড় মাপের নেতা বা নেত্রী হয়ে গেছি। আবার অনেকে উচ্চমাত্রার পর্দা করেও চলছি।

অথচ আল্লাহর ফরয হুকুম হালাল রুজীর বেলায় আমরা উদাসীন, তখন আমরা এই সিম্পল ব্যাপারটা আর বুঝি না। অন্যকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বেড়াচ্ছি কিন্তু অবৈধ রুজীর সাথে হারামের আশ্রয় নিচ্ছি নানা কায়দায়। এটা ইবাদতের ক্ষেত্রে নিছক আত্মপ্রতারণা। আসুন একটি বার ভেবে দেখি।

## শিরক-বিদ'আত মিশ্রিত তাকওয়া



### তাকওয়ার ক্ষেত্রে আকীদার তাৎপর্য ও গুরুত্ব

ইসলামের দৃষ্টিতে আকীদার তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। প্রথমত, আকীদা হলো ইসলামের ভিত্তি ও মূল। আকীদা ব্যতীত ইসলামের কথা চিন্তাই করা যায় না। কারণ ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত মানুষের জন্য জীবন-বিধান। তাই আল্লাহর দেয়া জীবন-বিধান মানতে হলে সর্বপ্রথমে আকীদা ঠিক থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, আকীদা হলো আমল করুল হওয়ার পূর্বশর্ত। কেননা আকীদা যদি বিশুদ্ধ না হয়, তাহলে যাবতীয় কথা ও কাজ আল্লাহর নিকট বাতিল বলে গণ্য হয়।

### তাকওয়ার ক্ষেত্রে তাওহীদ ও শিরক

ইসলামের সব নিয়ম-কানুন চর্চা করলেও কোন মুসলিম যদি তাওহীদের মূল সূত্রাবলী না বুঝেন অথবা না মানেন তবে তিনি ইসলামী জীবন-বিধানে পূর্ণভাবে প্রবেশ করেছেন বলা যাবে না। আর এভাবেই তাওহীদ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে বর্তমানে বহু মুসলিম কুরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত শরীয়াহ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। তাওহীদ ও শিরক এবং সুন্নাহ ও বিদ'আত এই চারটি বিষয় সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেক মুসলিমের পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। শিরক তাওহীদের বিপরীত (Negation) আর বিদ'আত সুন্নাহের বিপরীত। শিরক হলো “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ” এই কালিমার প্রথম অংশের অস্বীকৃতি। আর বিদ'আত হচ্ছে এই কালিমার শেষাংশের বিপরীত এবং অন্তর থেকে তার অস্বীকৃতি।

**তাওহীদ কী?** ‘তাওহীদ’ মানে আল্লাহর নির্ভেজাল একত্ব। আল্লাহর এ একত্ব সার্বিক, পূর্ণাঙ্গ এবং সর্বাঙ্গিক। এ দৃষ্টিতে আল্লাহ শুধু সৃষ্টিকর্তাই নন তিনি একমাত্র পালনকর্তা, মালিক, রিযিকদাতা, রক্ষাকর্তা ও আইন-বিধানদাতাও বটে। অতএব মানুষ ভয় করবে কেবল আল্লাহকে, ইবাদত-বন্দেগী ও দাসত্ব করবে একমাত্র আল্লাহর।

**বাস্তব চিত্র :** বাস্তবে আজ মুসলিম সমাজে আল্লাহকে এক ও অনন্য বলে সাধারণভাবে স্বীকার করা হয় বটে। কিন্তু কার্যত দেখা যায়, আল্লাহর উলুহিয়াতী (ইবাদত) তাওহীদের প্রতি যদিও বিশ্বাস রয়েছে কিন্তু তাঁর রব্বিয়াতের (প্রভুত্ব) তাওহীদ স্বীকার করা হচ্ছে না। মুখে স্বীকার করলেও বাস্তবে রব হিসেবে মেনে নেয়া হচ্ছে আরো অনেক শক্তিকে। আর এটাই হচ্ছে শিরক। শব্দগত আকীদা হিসেবে যদিও আল্লাহকে-ই রিযিকদাতা, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা, সৃষ্টিকর্তা, প্রভাবশালী, কর্তৃত্বসম্পন্ন, বিশ্বব্যবস্থাপক এবং রব বলে স্বীকার করা হয়, কিন্তু এ শ্রেণীর লোকেরাই মৃত ‘বুযুর্গ’ (?) লোকদের নিকট প্রার্থনা করে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরই ভয় করে চলে, তাদেরই নিকট থেকে কোনো কিছু পেতে আশা পোষণ করে। বিপদে পড়লে তাদের নিকটই নিষ্কৃতি প্রত্যাশা করে, তাদের নিকটই সকল উন্নয়ন প্রত্যাশা করে। এক শ্রেণীর লোকেরা মনে করে : এরা অলৌকিকভাবে মানুষের দু’আ শুনতে ও কবুল করতে পারে, সাহায্য করতে পারে, ফায়েয দিতে পারে। ভালমন্দ করাতে ও ঘটাতে পারে। এই উদ্দেশ্যে তাদের সন্তোষ কামনা করে। আর তাদের সন্তোষ বিধানের জন্যেই তাদের উদ্দেশ্যে মানত মানে, পশু জবাই করে, মরার পর তাঁদের কবরের ওপর সিজদায় মাথা লুটিয়ে দেয়, নিজেদের ধন-সম্পদের একটা অংশ তাদের জন্যে ব্যয় করা কর্তব্য মনে করে। আর এসব কারণেই দেখা যায়, এ শ্রেণীর লোকদের কবরকে নানাভাবে ইজ্জত করা হচ্ছে, বহু অর্থ খরচ করে কবরের ওপর পাকা ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে। এসব কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে দেশ-দেশান্তর সফর করা হয়। এক নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে চারিদিক থেকে তাদের ভক্তেরা এসে মিলিত হয়। ঠিক যেমন মুশরিক জাতিগুলো গমন করে তাদের ধর্মীয় তীর্থভূমে।

ইসলামে তাওহীদী আকীদার দৃষ্টিতে আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিকট দু’আ (প্রার্থনা) করা বা আর কাউকে সম্বোধন করে দু’আ করা সুস্পষ্ট শিরক। ইসলামে তা স্পষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধ। কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা হলো :

- “আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাকে ডাকছো তারা তোমাদের সাহায্য করতে সক্ষম নয়। বরং নিজের সাহায্যেও অক্ষম।” (সূরা আল আরাফ, ৭ঃ ১৯৭)
- “কোনো দুঃখ বা বিপদ যদি তোমাকে গ্রাস করে থাকে তবে তা (আল্লাহর মজীতেই হয়েছে মনে করতে হবে এবং তা) দূর করার কেউ নেই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। এমনভাবে তুমি যদি কোন কল্যাণ লাভ করে থাকো তবে তিনিই তো সর্বশক্তিমান।” (সূরা আল আনআম, ৬ঃ ১৭)
- “আল্লাহ যদি তোমাকে কোন ক্ষতি বা বিপদ দেন, তবে তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ-ই দূর করতে পারবে না। আর তিনিই যদি তোমার প্রতি কোন কল্যাণ দান করতে ইচ্ছা করেন, তাহলে দানকে প্রত্যাহার করতে পারে এমন কেউ নেই। তবে তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান কল্যাণ দেন, তিনিই ক্ষমা দানকারী, করুণাময়।” (সূরা ইউনুস, ১০ঃ ১০৭)
- “আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা আর যারই নিকট দু’আ কর, তাদের কেউই একবিন্দু জিনিসের মালিক নয়। তা সত্ত্বেও যদি তোমরা তাদেরই ডাক, তাদের নিকটই দু’আ কর, তবে [জেনে রাখ যে] তারা তো তোমাদের ডাক শুনতেও পায় না।” (সূরা ফাতির, ৩ঃ ১৩-১৪)
- আর তারা তাঁর (আল্লাহর) পরিবর্তে ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে অন্যদেরকে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং ওরা নিজেরাই সৃষ্টি এবং ওরা নিজেদের অপকার অথবা উপকার কিছুই করার ক্ষমতা রাখেনা, এবং মৃত্যু, জীবন ও পুনরুত্থানের উপরও কোন ক্ষমতা রাখে না। (সূরা আল ফুরকান, ২ঃ ২৫৩)
- “সমস্ত গায়েবের চাবিকাঠি তাঁরই (আল্লাহর) নিকট, তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানে না।” (সূরা আল আনআম, ৬ঃ ৫৯)
- “(হে রসূল) বল : আল্লাহ ব্যতীত কেউই আকাশ ও পৃথিবীতে গায়েব বা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।” (সূরা আন নামল, ২ঃ ৬৫)

**শিরক কী?** শিরক হলো অংশীদারিত্ব; শরীক হলো অংশীদার। ইসলামের পরিভাষায় শিরক হচ্ছে আল্লাহর নামের সাথে, আল্লাহর গুণের সাথে, আল্লাহর কাজের সাথে, আল্লাহর সত্ত্বার সাথে অথবা আল্লাহর ইবাদতে অন্য কাউকে অংশীদার করা, তুলনা করা অথবা আল্লাহর সমকক্ষ বানানো। আল্লাহ বলেন :

সার্বভৌমত্বে তাঁর কোন শরীক নাই। (সূরা আল ফুরকান, ২ঃ ২২)

যে সব মুসলিম রসূল ﷺ-এর কাছে প্রার্থনা করে অথবা সূফীদের বিভিন্ন আউলিয়া এবং পীর-বুজুর্গের কাছে প্রার্থনা করে এই বিশ্বাসে যে, এরা তাদের প্রার্থনায় সাড়া দিতে পারেন, সেই সব মুসলিম শিরক আল-আকবর করে।

শিরক-এর পরিণাম জাহান্নাম এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন : “আল্লাহর সাথে শিরক করলে তিনি তা কখনও ক্ষমা করবেন না। শিরক ছাড়া অন্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। যে কেউ আল্লাহর শরীক করে সে এক মহাপাপ করে।” (সূরা আন নিসা, ৪: ৪৮, ১১৬)

## পীরের প্রতি ভয় না আল্লাহর প্রতি ভয় - একটি বাস্তব উদাহরণ

তরিকতের অনেক ভাই আছেন যারা পীরের মুরিদ এবং সরাসরি কবির গুনাহর সাথে জড়িত অর্থাৎ হারাম সুদের সাথে জড়িত। যেমন অনেকেই সুদে বাড়ি কিনে তাতে পরিবার নিয়ে বসবাস করছেন এবং ঐ সুদের বাড়িতে বসেই মোরাকাবা (আধ্যাতিক ধ্যান) আর যিকর করে কলব পরিষ্কার করছেন।

### এখন প্রশ্ন :

সূরা বাকারার ২৭৫ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন : “আল্লাহ ব্যবসাকে করেছেন হালাল এবং সুদকে করেছেন হারাম।”

আবার সূরা বাকারার ৪৪ নং আয়াতে আরো বলছেন যে, “তোমরা মানুষকে ভাল কাজের আদেশ করো কিন্তু নিজের জীবন সংশোধনের ব্যাপারে উদাসীন থাক অথচ তোমরা কুরআন পড়। তোমরা কি চিন্তা কর না?”

দেখা যায় এই তরিকতের ভাইরা অনেক ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর চেয়ে তাদের পীরকে বেশী মান্য করে থাকেন। যেমন : আল্লাহ কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বলেছেন সুদ একটি কবির গুনাহ এবং তা সুস্পষ্ট হারাম। তারপরেও তারা সুদের সাথে জড়িত কিন্তু এই মুহূর্তে যদি তাদের পীর সাহেব বলেন যে সুদ একটি জঘন্যতম অপরাধ, তোমরা তা ত্যাগ কর, তাহলে ঐ মুহূর্তে তরিকতের ভাইয়েরা সুদের বাড়ি বিক্রি করে দিবেন। কিন্তু আল্লাহ যে বারেবারে আল কুরআনে বলছেন সেটাকে তারা গুরুত্ব দিচ্ছেন না। এরকম অনেক বিষয় আছে যা আল-কুরআনে সুস্পষ্ট নিষেধ যা তারা অনেকেই করে যাচ্ছেন কিন্তু যখনই পীর সাহেব তা থেকে বিরত থাকতে বলবেন শুধু মাত্র তখনই তারা বিরত থাকবেন। অনেক ক্ষেত্রেই তারা মহান আল্লাহর চেয়ে পীর সাহেবকে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকেন যা সুস্পষ্ট শিরক।

## তাকওয়ার ক্ষেত্রে সুন্নাহ ও বিদ'আত

### বিদ'আত কী?

যে সব ধরণের কাজ বা অনুষ্ঠান ইবাদত বা সওয়াবের কাজ বলে কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা স্বীকৃত নয়, রসূল ﷺ নিজে যা কখনো করেননি বা কাউকে কখনো করতে বলেননি, তাঁর সাহাবাদের সময়ও তা ইবাদত হিসেবে প্রচলিত ছিলোনা এমন সব কাজ বা অনুষ্ঠানাদি সওয়াবের উদ্দেশ্যে পালন করার নামই বিদ'আত। বিদ'আত বলতে বুঝায় দ্বীন পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও দ্বীনের মধ্যে পরিবর্তন আনার অযথা চেষ্টা করা।

### বিদ'আতের বিপক্ষে কুরআনের দলিল :

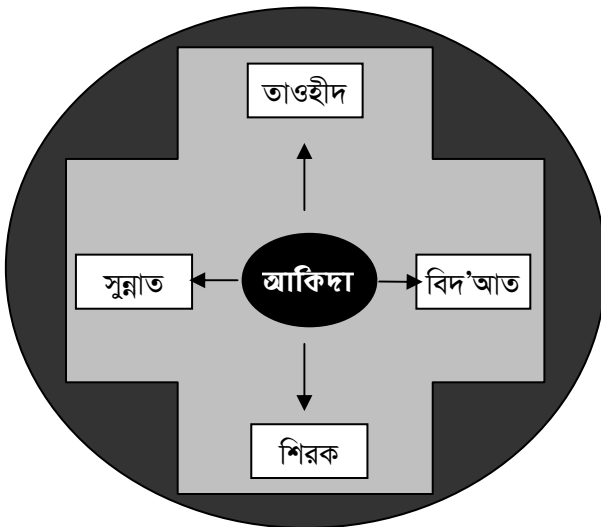
“আজকার দিনে তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে সম্পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে সম্যকভাবে সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্যে ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম (মনোনীত করলাম)।” (সূরা মায়িদা, ৫ : ৩)

এ আয়াত থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, দ্বীন-ইসলাম পরিপূর্ণ। তাতে নেই কোন কিছুর অভাব। অতএব তা মানুষের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত সকল দ্বিনি প্রয়োজন পূরণে পূর্ণমাত্রায় সক্ষম। এই দ্বীনে বিশ্বাসীদের দিক নির্দেশনা বা গাইডেন্সের জন্য এই দ্বীন ছাড়া অন্য কোন দিকে তাকাবার প্রয়োজন অতীতেও হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না। এতে মানুষের সব মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা যেমন রয়েছে তেমনি এতে নেই কোন অপ্রয়োজনীয় বা বাহুল্য জিনিস। ফলে দ্বীন থেকে যেমন কোন কিছু বাদ দেয়া যাবে না, তেমনি এর সাথে কোন কিছু যোগ করাও যাবে না। এ দুটোই দ্বীনের পরিপূর্ণতার বিপরীত এবং সূরা আল মায়িদার ৩ নম্বর আয়াতে দেয়া আল্লাহর ঘোষণার পরিপন্থী।

ইসলামী ইবাদতের ক্ষেত্রে সওয়াবের কাজ বলে এমন সব অনুষ্ঠানের উদ্ভাবন করা যা নাবী কারীম ﷺ ও সাহাবায়ে কিরামের জামানায় চালু হয়নি, তা যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন তা স্পষ্ট বিদ'আত। মহান আল্লাহ বলেন :

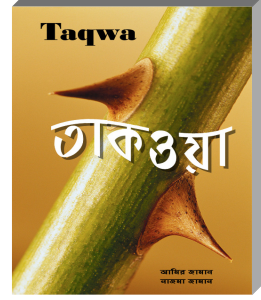
(হে নাবী!) তাদেরকে বলুন, আমি কী তোমাদেরকে জানানো যে, আমলের দিক দিয়ে কারা সবচেয়ে বেশি ব্যর্থ? (তারা হলো ঐ সব লোক) দুনিয়ার জীবনে যাদের সকল চেষ্টা-সাধনা ভুল পথে চলেছে এবং যারা মনে করে, তারা সব কিছু ঠিকই করছে। (সূরা আল কাহ্ফ, ১৮ঃ ১০৩-১০৪)

- ❑ আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, রসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের ধর্মে কোন নতুন পদ্ধতি আনলো যা আমাদের দ্বীনে নেই তা গ্রহণ করা হবে না। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)
- ❑ দ্বীনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নতুন আবিষ্কৃত বিষয় বিদ'আত, প্রত্যেক বিদ'আতই পথদ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক পথদ্রষ্টতার পরিণাম হল জাহান্নাম। (সহীহ মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)
- ❑ যে ব্যক্তি এমন কাজ করল যে কাজ আমাদের দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় তা গ্রহণ করা হবে না। (সহীহ মুসলিম)
- ❑ তোমরা আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি কর না, যেভাবে নাসারাগণ ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করেছে। বরং তোমরা বল যে, আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)





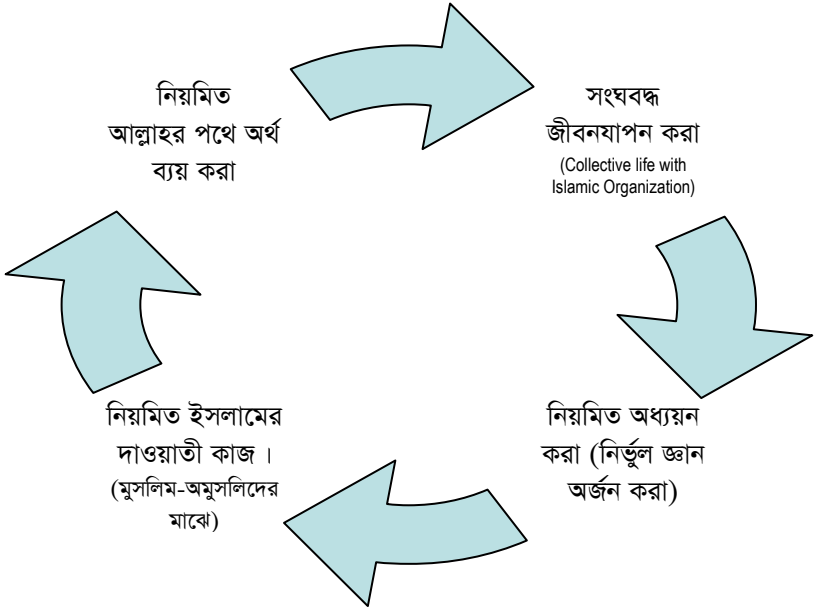
## তাকওয়া বৃদ্ধির উপায়



### তাকওয়া বৃদ্ধির সাইকেল

তাকওয়া বৃদ্ধির অনেক উপায় রয়েছে তবে তারমধ্যে মূল কাজ হচ্ছে নিম্নের এই চারটি। যে ব্যক্তি এই চারটি কাজ নিয়মিত করবে ইন্শাআল্লাহ, তার তাকওয়ার মান দিন-দিন বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আবার যে এই কাজগুলো শুধু মহান আল্লাহ তা'আলাকে খুশি করার জন্য নিয়মিত করে যাবে, তার জীবনে থাকবে না কোন অশান্তি, থাকবে না কোন দুঃখ। এই চারটি কাজই প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয ইবাদত।

- ১) প্রত্যেক মুসলিমের জন্য সংঘবদ্ধ জীবনযাপন অর্থাৎ জামাতবদ্ধ জীবনযাপন করা ফরয। (সূরা আলে-ইমরান : ১০৩)
- ২) দ্বীন ইসলামের জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর জন্য ফরয। (ইবনে মাজাহ, বাইহাকী)
- ৩) সার্বক্ষণিক দ্বীন ইসলামের দাওয়াতী কাজ করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয। (সূরা বাকারা : ১৪০, সূরা আলে-ইমরান : ১০৪)
- ৪) দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর পথে নিজের হালাল উপার্জন থেকে নিয়মিত অর্থ ব্যয় করা। (সূরা তাওবা : ৩৮, সূরা নিসা : ৭৪)



এছাড়া কারোর জীবনে যদি কোন-রকম হতাশা থাকে তাহলেও এই চারটি কাজ হচ্ছে হতাশা দূর করার মহৌষধ। এই চারটি কাজ আজ থেকে নিয়মিত শুরু করি ইনশাআল্লাহ দেখবো জীবন থেকে হতাশা নামক রোগটি দূর হয়ে গেছে।

## সংঘবদ্ধ জীবনযাপন করা

ঈমানদারদের দাওয়াতী কাজ সংঘবদ্ধভাবে করার ব্যাপারটিও শরীয়তের বাধ্যবাধকতার আওতাভুক্ত। একদল লোক সংঘবদ্ধভাবে নিজেদের আত্মগঠন ও দীন প্রচারের কাজ চালিয়ে যাবে। এর মূল কাঠামো ও মডেল হবে আল্লাহর রসূল ﷺ এর যুগ ও জিন্দেগী হতে নেয়া। সংঘবদ্ধ জীবন - সুশৃংখল জীবন গঠন, দীন বুঝা ও এর চর্চায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। জামাতবদ্ধ জীবনের গুরুত্ব কুরআন ও সুন্নাহে সমভাবে উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন : শয়তান একাকী পেলে সঙ্গী হয়, দলবদ্ধ থাকলে সে সটকে পড়ে। অর্থাৎ দ্বীনের কাজ একা একা করা যায় না। ঈমানদারদেরকে তাওহীদের ভিত্তিতে কোন না কোন ভাবে সংঘবদ্ধ থাকতেই হবে। এ সংঘবদ্ধতার ভিত্তি হবে আল্লাহর দীন, রসূলের সুন্নাহ। অন্য কোন মানুষের আদর্শের ভিত্তিতে নয়।

অর্থাৎ মুসলিম জনগোষ্ঠীর জীবন শুধু তাসবীহ-তাহলীল পড়ার জন্য নয়। শুধু কিছু আনুষ্ঠানিক ইবাদত-বন্দেগী করার জন্য আল্লাহ মুসলিম জাতির সৃষ্টি করেননি। শুধু তাসবীহ তো গাছপালা, পশু-পাখীরাই করে যাচ্ছে। বরং এক মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ ঈমানদারদের সৃষ্টি করেছেন। এদের দায়িত্ব হলো সারা জাহানের মানুষকে হেদায়াতের পথ দেখানো। প্রত্যেক রসূল এ কাজ করেছেন, রসূলের সঙ্গীরা এ কাজে সারাজীবন অতিবাহিত করেছেন, পরবর্তী যুগের ঈমানদারগণও এ কাজ করেছেন। প্রত্যেক মুসলিম বান্দার উপর এ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে এবং সে তার সামর্থ অনুযায়ী তা পালন করবে। দ্বীন বুঝেও চুপচাপ বসে থেকে শুধু যিকর করা আর সলাত আদায়ের মধ্যে স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। ঈমানের মত মহাসম্পদকে কাজে লাগিয়ে কলুষিত সমাজের কালিমা দূর করতে হবে, সমাজকে ঈমানের আলোকে আলোকিত করতে হবে। সূরা আলে ইমরান (৩)-এর ১০৪, ১১০ এবং ১১৪ নম্বর আয়াতগুলো দ্রষ্টব্য।

## নিয়মিত দ্বীনের জ্ঞানার্জন করা

রসূল ﷺ বলেছেন : দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর জন্য ফরয তথা আবশ্যকরণীয়। (ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী)

আমার যদি দ্বীন সম্পর্কে নূন্যতম জ্ঞানই না থাকে তাহলে কিভাবে নিজ পরিবারকে দ্বীনের আলোকে গাইড করবো? ঈমানের অন্যতম দাবী হলো দ্বীনের জ্ঞানার্জন করা। কিভাবে সন্তানদের অন্তরে সামান্য হলেও দ্বীনের আলো ঢুকাবো? যুগ পরিবর্তন হয়ে গেছে। আমার ভাসাভাসা আর আবোলতাবোল দ্বীন জ্ঞান দিয়ে আর উঠতি বয়সের সন্তানদের বুঝ দিতে পারবো না। তারা এখন লজিক চায়, তারা দ্বীনের ইনটেলেকচুয়াল ব্যাখ্যা চায়। গোটা কুরআনে রয়েছে সকল মৌলিক সমস্যার সমাধান। সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জটিল বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীগণ সারাজীবন চেষ্টা করে একটি সমস্যার যে সমাধান দিয়েছেন, আল কুরআনে মাত্র এক দুই শব্দে বা এক লাইনে আল্লাহ সে সমস্যার নির্ভুল সমাধান দিয়ে দিয়েছেন।

আমি যদি মনে করি আমি ইসলাম সম্পর্কে অনেক জানি তাহলে আমি আমার জানার বা জ্ঞান অর্জনের দরজা নিজেই বন্ধ করে দিলাম। তাই দ্বীন সম্পর্কে জানলেও Authentic source থেকে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে এবং এক

সময় দেখতে পাবো যে আসলে আমি অনেক কিছুই জানতাম না। আমি যে অনেক কিছুই জানি না তা উপলব্ধি করার জন্যও একটা Level of Knowledge প্রয়োজন।

## ইসলামের দাওয়াতী কাজ করা

দাওয়াতী কাজ এমন এক মহৌষধের নাম – যা আমাকে অবশ্যই সঠিক লাইনে এনে ছাড়বে। আমার চরিত্র থেকে সমস্ত দোষ-ত্রুটি ধুয়ে-মুছে দূর করে আমাকে একজন প্রকৃত মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে। অর্থাৎ আমার দোষ-ত্রুটিগুলি দিন-দিন কমতে থাকবে। সুতরাং দাওয়াতী কাজ সকল ঈমানদারের জন্য সার্বক্ষণিক ফরয। মহান আল্লাহ বলেন –

তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া সত্যকে গোপন রাখে? (সূরা আল বাকারা, ২ : ১৪০)

আর সেই ব্যক্তির কথা অপেক্ষা অধিক ভাল কথা আর কার হতে পারে? যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, নেক আমল করে এবং বলে আমি মুসলিম (আল্লাহর অনুগত)। (সূরা হা-মীম সাজদা, ৪১ : ৩৩)

আমরা অনেকেই মনে করি যে আমাদের উপর কেবল সলাত, যাকাত, সাওম ও হাজ্জ এ ক’টি জিনিসই ফরয। এর বাইরে আমরা আর কিছু নিয়ে মাথা ঘামাই না। অথচ সলাত যেমন ফরয, দাওয়াতী কাজ করাও তেমনি ফরয। বরং সর্বাবস্থায় সকল ঈমানদারের জন্য ফরয এক কাজ হলো দাওয়াতী কাজ। নাবীর রিসালতের প্রথম দায়িত্ব ছিল এ দাওয়াত। আল্লাহর বাণীকে জনতার মাঝে পৌঁছে দেয়াই ছিল সকল নাবী ও রসূলের প্রধান কাজ। নাবীর অবর্তমানে এ কাজ সকল ঈমানদারগণের ওপর অবশ্যকরণীয়। নাবী মুহাম্মাদ صلی اللہ علیہ وسلم বিদায় হাজ্জের ভাষণেও সকল ঈমানদারগণের উপর এ নির্দেশ দিয়েছিলেন,

“তোমরা আমার অনুপস্থিতিতে উম্মতের নিকট আমার এ বাণী পৌঁছে দেবে।” (আহমদ, তিরমিযী)।

আল্লাহ বলেন : “ডাকো তোমার প্রভুর দিকে হিকমত ও উত্তম নসিহতের সাহায্যে, আর লোকদের সাথে বিতর্ক করবে সর্বোত্তম পন্থায়।” (সূরা আন নহল, ১৬ : ১২৫)।

এখানে আল্লাহ হুকুম করছেন সবাইকে। এটা আল্লাহর আদেশ যে আমরা পথহারা মানুষকে কেবল আল্লাহর দিকে ডাকবো। আর ডাকবো উত্তম ভাষা ও পদ্ধতি অবলম্বন করে। আরো হুকুম করছেন সর্বোত্তম ভাষায় বিতর্ক করার জন্য। সলাত একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফরয করা হয়েছে। ফরয নামাযের জন্য ওয়াক্ত জরুরী। যাকাত আদায়ের জন্য সম্পদের মালিক হতে হয়। যাকাতের দেয় অর্থও একটা নির্দিষ্ট হারের আওতায় আবদ্ধ। হাজ্জ ফরয হয় কেবল সামর্থ্যবানদের উপর। তাও আবার সারা জীবনে মাত্র একবার তা সম্পাদন করলেই দায়িত্ব শেষ। ফরয সিয়াম সারা বছরে কেবল একটা নির্দিষ্ট মাসের জন্য।

কিন্তু “ডাকো তোমার প্রভুর দিকে” বলে আল্লাহ ঈমানদারদের উপর এ কাজটি সর্বক্ষণের জন্য ফরয করে দিয়েছেন। এখানে বলা হয়নি কোন নির্দিষ্ট সময়, কোন নির্দিষ্ট ধরনের ব্যক্তি বা অন্য কোন শর্ত। অর্থাৎ এ ডাকার কাজ সকল মুসলিম-মুসলিমাহ ঈমানদারের ওপর এক সার্বক্ষণিক ফরয। হিকমত অবলম্বন করে এ দাওয়াত দিতে হবে। প্রয়োজনে উপযুক্ত সময় ও সুযোগ খুঁজে নিতে হবে। অনুকূল পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টিও হিকমতের অংশ।

## দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর পথে ব্যয় করা

আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার খাতে আমাদেরকে মাল সম্পদ খরচ করতে হবে কেন? আল্লাহর তা’আলা তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে তাঁর পথে জিহাদের যে আহবান দিয়েছেন তার মধ্যেই উপরিউক্ত প্রশ্নটির উত্তর রয়েছে। আল্লাহ তা’আলার ঘোষণা : “তোমরা সংগ্রাম কর আল্লাহর পথে মাল দিয়ে এবং জান দিয়ে।” অর্থাৎ দ্বীন প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রামে অর্থের কুরবানী এবং শ্রম ও সময়ের কুরবানীর প্রয়োজন আছে। এই দুটো জিনিসের কুরবানী দেয়ার মত একদল মু’মিন, মুজাহিদ তৈরি হলেই আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বিজয় হবে। যেমন বিজয়ী হয়েছিল রসূলে পাক ﷺ -এর নেতৃত্বে সাহাবায়ে কিরামের (রাদিআল্লাহু আনহু) মালের কুরবানী ও জানের কুরবানীর বিনিময়ে। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার এই মহান সংগ্রাম দাবী করে যে এ সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের কাছে তাদের নিজের জান ও মালের তুলনায় তথা ইহ জাগতিক যাবতীয় স্বার্থ ও লোভ-লালসার তুলনায় আল্লাহর রহমত ও সন্তোষই হতে হবে অধিকতর প্রিয়। আল্লাহ তা’আলা এরশাদ করেছেন :

“তাদের আল্লাহ্র পথে লড়াই করা উচিত যারা আখিরাতের বিনিময়ে এই দুনিয়ার জীবনকে বিক্রি করতে পারে। আর যারাই আল্লাহ্র পথে সংগ্রামে অংশ নেবে অতঃপর নিহত হবে অথবা বিজয়ী হবে, উভয় অবস্থায় আমি তাদেরকে মহান প্রতিদানে ভূষিত করবো।” (সূরা নিসা : ৭৪)

উল্লিখিত আয়াতে কথা পরিষ্কারভাবে এসেছে। আল্লাহ্ তা’আলা যাকে-তাকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের অংশ নিতে বলেননি। যারা এই দুনিয়ার জীবনের তুলনায় আখিরাতের জীবনকে অগ্রাধিকার দিতে সক্ষম, কেবলমাত্র তারাই এ কাজের যোগ্য। আর যারা এর বিপরীত অর্থাৎ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দেয় তারা এ কাজের যোগ্য হতে পারে না। আল্লাহ্ তা’আলা এ সম্পর্কেও বলেন :

“হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমাদের আল্লাহ্র পথে বেরিয়ে পড়ার ডাক দিলে তোমরা মাটি কামড়ে ধর। তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গেলে। অথচ দুনিয়ার এই ধন-সম্পদ আখিরাতে অতি সামান্যই কাজে আসবে।” (সূরা তাওবা : ৩৮)

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র পথে চলার ক্ষেত্রে এই দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের মোহই প্রধান অন্তরায়। এই মোহ কাটিয়ে উঠতে যাতে আমরা সক্ষম হই সে জন্যেই আল্লাহ্ তা’আলা আমাদের জানের কুরবানী পেশ করার ব্যাপারে বেশি বেশি করে তাকিদ করেছেন। এভাবে আল্লাহ্র পথে বেশি বেশি করে মাল খরচের মাধ্যমেই আমরা দুনিয়ার বৈষয়িক ও পার্থিব জীবনের মোহ কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হতে পারি এবং আল্লাহ্র পথে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে যেতে পারি। আল্লাহ্র পথে অর্থ ব্যয়ের প্রধান উদ্দেশ্য এটাই।

## তাকওয়া বৃদ্ধির আরো কিছু উপায়

- ১) শুরুতেই অন্তরে তাকওয়ার চাষ করা;
- ২) গুনাহের জন্যে অনবরত আল্লাহ্র কাছে তওবা করা;
- ৩) সর্বদা আত্মশুদ্ধির চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া;
- ৪) সৎকাজ (আমলে সলেহা) করা;
- ৫) আল্লাহতে অকপটভাবে ঈমানী নির্ভরতা রাখা;
- ৬) সর্বাবস্থায় সবর করা;
- ৭) সর্বক্ষেত্রে ন্যায়নীতি (Justice) মেনে চলা।

## আল্লাহর রহমত ও ভালোবাসা হারানোর কারণগুলো, যেগুলোকে বর্জন (পরহেজ) করা অতি জরুরী -

- ১) অন্যায় কাজ, অবিচার, অত্যাচার;
- ২) দুর্নীতি ও দুর্কর্ম;
- ৩) অকৃতজ্ঞতা;
- ৪) দ্বীনকে অস্বীকার করা;
- ৫) অপচয়;
- ৬) বদমেজাজ, উদ্ধত-গর্বিত আচরণ।

## তাকওয়ার সুফলগুলো [সূরা আনফাল (৮) : ২৯]

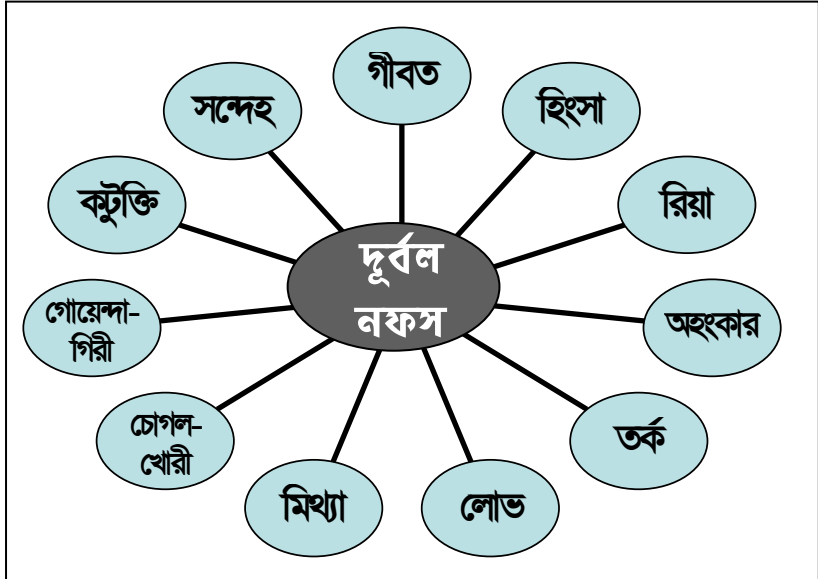
- ১) আল্লাহর হিদায়াত লাভ করা;
- ২) আল্লাহর রহমত লাভ করা;
- ৩) আল্লাহর ক্ষমা লাভ করা;
- ৪) আল্লাহর কাছে থেকে স্বচ্ছ দৃষ্টি, বিচক্ষণতা ও সৎ-সঠিক জ্ঞান লাভ;
- ৫) আল্লাহ তাঁর বান্দার কাজ সহজ করে দেবেন;
- ৬) দুনিয়া ও আখিরাতে সাফল্য লাভ করা।

সঠিক পথ ও ভ্রান্ত পথ এই দুই পথেরই বর্ণনা কুরআনে রয়েছে। নিজেদের বিবেক-বিবেচনাকে কাজে লাগিয়ে সঠিক পথে চলার নির্দেশও সেখানে রয়েছে। ভ্রান্ত পথে চললে শেষ পরিণতি অতি মন্দ সেকথাও বলা হয়েছে। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পূর্ণভাবে মেনে আত্মাকে পরিশোধন করে আল্লাহর দেখানো পথে চলার পুরস্কারের নিশ্চয়তাও রয়েছে। তাকওয়া অবলম্বনে হিদায়াত পাওয়া যাবে, অন্তর নির্মল-নিষ্কলুষ থাকবে, আল্লাহ খুশী হবেন। আখিরাত আনন্দময় হবে। একথাগুলো বুঝতে হবে, পালন করতে হবে, তবেই আল্লাহর নৈকট্য ও রহমত লাভ করা যাবে। মু'মিনের তাকওয়াই তাকে আলোর সন্ধান দেবে।

## আমাদের মৌলিক দুর্বলতা

কিছু কিছু মৌলিক দুর্বলতা প্রতিটি মানুষের ভিতরে তার জন্মলগ্ন থেকেই থাকে, কিন্তু সেই দুর্বলতাগুলো থাকে সুপ্ত অবস্থায়। মানুষ যখন দিন দিন বড় হতে থাকে, তার ঈমানী দুর্বলতার কারণে সেগুলো ক্রমশঃ প্রকাশ পেতে থাকে। যেমন : মানুষের মন চায় রিয়া করতে, গীবত করতে, হিংসা করতে, দাম্ভিকতা করতে, মিথ্যা কথা বলতে, চোগলখুরী করতে, লোভ করতে, ঝগড়া করতে,

কাউকে ঠকাতে, যিনা করতে, অবৈধ আয়-রোজগার করতে, ইবাদতে অনিহা, শিরক-বিদ'আত ইত্যাদি ইত্যাদি । কিন্তু তার ভিতরের তাকওয়ামিশ্রিত মজবুত ঈমান তা করতে বাধা দেয়; যার কারণে সে এগুলো থেকে বিরত থাকে । আর যার ভিতরে তাকওয়ার গভীরতা কম বা দুর্বল এবং যার ঈমান নড়বড়ে, সেই সুপ্ত মৌলিক দুর্বলতাগুলো তখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং বাইরে প্রকাশ পায় । নীচের diagram টির প্রতি লক্ষ্য করা যাক :



আমাদের চরিত্র থেকে উপরের মৌলিক দুর্বলতাগুলো দূর করতে তাকওয়ার গভীরতা বাড়াতে হবে । আর সেই তাকওয়া বাড়ানোর প্রথম ধাপ হচ্ছে ঐ তিনটি পদক্ষেপ যা পরবর্তী পাতায় উল্লেখ করা হয়েছে (তাহাজ্জুদ সলাত, ইতিকাফ ও মৃত্যুচিন্তা) ।

## তাকওয়া অর্জনের উপায়

উপায়টা আল্লাহ তাঁর কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, আর সেটা হলো আল্লাহর ইবাদত । ইবাদতের ফসলই হলো তাকওয়া । আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন যে -



- ক) হে মানুষ! তোমরা তোমাদের সেই প্রভুর [রবের] ইবাদত কর যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, এবং তোমাদের পূর্বপুরুষগণকেও সৃষ্টি করেছিলেন যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী [মুত্তাকী] হতে পার। (সূরা বাকারা, ২ : ২১)
- খ) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্যে সিয়ামের [রোযার] বিধান দেয়া হলো যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেয়া হয়েছিল যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার। (সূরা বাকারা, ২ : ১৮৩)

## তাহাজ্জুদ সলাতের মাধ্যমে তাকওয়ার মান বৃদ্ধি

কুরআন ও হাদীসে বহুবার মানুষের কল্যাণের সহজ ও কঠিন উপায় বলে দেয়া হয়েছে। কঠিন উপায়গুলোর মধ্যে আছে তাহাজ্জুদ সলাত। অর্থাৎ তাকওয়া বৃদ্ধির লক্ষ্যে গভীর রাতে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া। তাকওয়া বৃদ্ধির জন্য রাত জেগে আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি করে রুকু-সাজদা করলে আল্লাহ বান্দার আকাজ্জা পূরণ করেন এবং দিন দিন বান্দার তাকওয়ার মান উন্নত হতে থাকে।

## ইতিকাকের মাধ্যমে তাকওয়া বৃদ্ধি

বিশেষ নিয়তে বিশেষ অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের উদ্দেশ্যে মসজিদে অবস্থান করাকে ইতিকাক বলে। ইতিকাক একটি মহান ইবাদত। মদীনায় অবস্থানকালীন সময়ে রসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি বছরই ইতিকাক পালন করেছেন। দাওয়াত, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা এবং জিহাদে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও রমাদানে তিনি ইতিকাক ছাড়েননি। ইতিকাক ঈমানী প্রশিক্ষণের একটি স্কুল, এবং রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিদায়াতে আলোর একটি প্রতীক। ইতিকাকের অবস্থায় বান্দা নিজেকে আল্লাহর ইবাদতের জন্য দুনিয়ার অন্যান্য সকল বিষয় থেকে আলাদা করে নেয় একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। ইতিকাক ঈমান বৃদ্ধির মাধ্যমে তাকওয়া অবলম্বনের একটি সুযোগ। আমরা এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিজের ঈমানী চেতনাকে শাণিত করে তাকওয়ার উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারি।

রসূলুল্লাহ ﷺ রমাদানের শেষের দশ দিনে ইতিকাক করেছেন, ইশ্তেকাল পর্যন্ত। এরপর তাঁর স্ত্রীগণ ইতিকাক করেছেন। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ তা'আলাও তাঁর বান্দাদেরকে নিরাশ করেন না, বরং তিনি বান্দাদেরকে নিরাশ হতে নিষেধ করে দিয়ে বলেছেন :

(হে নাবী!) বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছে তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা আয যুমার, ৩৯ : ৫৩)

“আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে- বস্ত্ত আমি রয়েছি সন্নিহিত। প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল করি যখন সে প্রার্থনা করে। কাজেই তারা যেন আমার হুকুম মান্য করে এবং আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। সম্ভবত তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে।” (সূরা আল-বাকার, ২ : ১৮৬)

## তাকওয়ার বাস্তব রূপ

### প্রথম বিভাগ (শাখা)

- ১) পথনির্দেশ (guidance), কারণ আল্লাহ বলেছেন কুরআন মুত্তাকীদের জন্যে পথনির্দেশ। (২ : ২)
- ২) সাহায্য, কারণ আল্লাহ বলেছেন তিনি মুত্তাকীদের সংগে আছেন। (২:১৯৪)
- ৩) গভীর বন্ধুত্ব [আল্লাহর সংগে], কারণ আল্লাহ বলেছেন যে তিনি মুত্তাকীদের অন্তরঙ্গ বন্ধু। (২ : ২৫৭; ৯ : ৪)
- ৪) ভালোবাসা, কারণ আল্লাহ বলেছেন যে তিনি মুত্তাকীদের ভালোবাসেন। (৩ : ৭৬)
- ৫) পাপ ঢেকে রাখা, কারণ আল্লাহ বলেছেন তিনি মুত্তাকীদের পাপ কাজ ঢেকে রাখবেন। (৮ : ২৯; ৩৩ : ৭১)
- ৬) দুঃখ থেকে মুক্তি ও রিযিক লাভ, কারণ আল্লাহ বলেছেন যে মুত্তাকীদের তিনি দুঃখ-দুর্ভাবনা থেকে মুক্তির উপায় বের করে দেবেন এবং অপ্রত্যাশিত উৎস থেকে তাদের রিযিক দান করবেন।
- ৭) পাপমুক্তি ও অগাধ পুরস্কার, কারণ আল্লাহ বলেছেন যে মুত্তাকীদের তিনি পাপমুক্ত করবেন এবং অগাধ পুরস্কার দেবেন। (৬৫:৫; ৫৭:২৮; ৮২:৯)
- ৮) সংকট থেকে উদ্ধার, কারণ আল্লাহ বলেছেন যে মুত্তাকীদের জন্যে সবকিছু সহজ করে দেবেন।
- ৯) আমল গ্রহণ, কারণ আল্লাহ বলেছেন যে তিনি শুধু মুত্তাকীদের আমলই কবুল করবেন। (৫ : ২৭)

- ১০) সফলতা লাভ, কারণ আল্লাহ বলেছেন যে তাকওয়া অবলম্বন করলে তিনি সফলতা দেবেন । (২ : ৫)
- ১১) সুসংবাদ (শুভ সংবাদ), কারণ আল্লাহ বলেছেন যে মুত্তাকীদের জন্যে দুনিয়া ও আখিরাতে সুসংবাদ রয়েছে ।
- ১২) জান্নাতে প্রবেশ, কারণ আল্লাহ বলেছেন যে বাস্তবিকই মুত্তাকীদের স্থান হবে আল্লাহর শান্তিময় জান্নাতে । (১৫ : ৪৫)
- ১৩) উদ্ধার, মুক্তি, নাজাত লাভ (salvation), কারণ আল্লাহ বলেছেন যে আমি মুত্তাকীদের রক্ষা করবো, জাহান্নামের আগুন থেকে ।

### দ্বিতীয় বিভাগ (শাখা)

- ১) আখিরাতে শান্তির (আযাবের) ভয় ।
- ২) দুনিয়াতে শান্তির ভয় ।
- ৩) দুনিয়াতে পুরস্কার লাভের আশা ।
- ৪) আখিরাতে পুরস্কার লাভের আশা ।
- ৫) আখিরাতে বিচারের ভয় ।
- ৬) আল্লাহর সম্মুখে লজ্জা ।
- ৭) আল্লাহর রহমতের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ।
- ৮) জ্ঞান লাভ করা, কারণ আল্লাহ বলেছেন যে তাঁর সেই সব বান্দাই তাঁকে ভয় করে যারা জ্ঞানী ।
- ৯) আল্লাহর অকুণ্ঠ প্রশংসায় মুখর থাকা ।
- ১০) আল্লাহর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ।

### তৃতীয় বিভাগ (শাখা)

- ১) বান্দা নিজেকে কুফর থেকে বাঁচিয়ে রাখবে, সত্যকে ঢেকে রাখবে না । এটা ইসলামের স্তর (মোকাম) ।
- ২) সে আল্লাহর আদেশের অবাধ্যতা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে, নিষিদ্ধ বস্তু থেকে দূরে থাকবে । এটা তাওবার স্তর (মোকাম) ।
- ৩) সে সন্দেহজনক বস্তু ও বিষয় থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে । এটা সতর্ক থাকার (ওয়ারার) স্তর (মোকাম) ।

বান্দার হৃদয়ে তখন শুধু সে আল্লাহরই উপস্থিতি অনুভব করবে যেন সে সেই মহান সত্তাকেই দেখছে ।

## হাশরের ময়দানে কঠিন প্রশ্ন ও জবাব

রসূল ﷺ বলেছেন, হাশরের ময়দানে ৫টি প্রশ্নের উত্তর দেয়া না পর্যন্ত কোন আদম সন্তানই এক কদমও নড়তে পারবে না।

- ১) তার জীবনকাল কোন কাজে অতিবাহিত করেছে?
- ২) যৌবনের শক্তি-সামর্থ্য কোন কাজে লাগিয়েছে?
- ৩) কোন উপায়ে টাকা-পয়সা উপার্জন করেছে?
- ৪) এবং কোন পথে সেই টাকা-পয়সা খরচ করেছে?
- ৫) অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে? (আত-তিরমিযী)

এবার খুব গভীরভাবে চিন্তা করে দেখি আমার নিজের কী অবস্থা? উপরের এই পাঁচটি প্রশ্নের উত্তরের জন্য আমি প্রস্তুত আছি কি? যদি মনে করি জীবন থেকে অনেকটা সময় পার হয়ে গেছে, কিন্তু হতাশ হওয়া যাবে না। যে কোন সময়ই আমি আমার নিজ কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে আবার সঠিক পথে ফিরে আসতে পারি। আল্লাহর কাছে তওবার পথ সবসময়ের জন্য খোলা। কিন্তু তওবার সঠিক অর্থ ভালভাবে জানতে হবে। তওবার অর্থ এই নয় যে আমি বারে বারে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল করবো আর তওবা করবো এবং আবার সেই ভুল করবো। তওবার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে আমি যে ভুল করেছি ঐ ভুল আর দ্বিতীয়বার ইচ্ছাকৃতভাবে করবো না, (অর্থাৎ Complete submission) আমলে সলেহার দিকে পরিপূর্ণভাবে ফিরে আসবো।

## মৃত্যু-চিন্তার মাধ্যমে তাকওয়া বৃদ্ধি

মৃত্যু-চিন্তাও মানুষের মধ্যে তাকওয়া বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। শিরকের ভয়ে রসূল ﷺ প্রথম দিকে মুসলিমদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলেন এবং পরবর্তীতে তার অনুমতি দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে রসূল ﷺ বলেছেন তোমরা কবর যিয়ারত কর। কেননা তা তোমাদের আখিরাত স্মরণ করিয়ে দেবে। (সুনান ইবনে মাজাহ)

### তাঁই আমাদের উচিত :

- ১) প্রত্যহ একটি নির্ধারিত সময়ে মৃত্যুকে স্মরণ করা।
- ২) অতঃপর কবরের অবস্থা স্মরণ করা।
- ৩) অতঃপর হাশরের অবস্থা স্মরণ করা।

- ৪) এবং সেই দিনের ভয়াবহ অবস্থা ও মুসিবতের বিষয় চিন্তা করা ।
- ৫) আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়াতে হবে এটা স্মরণ করা ।
- ৬) সব কাজকর্মের হিসাব আল্লাহর কাছে দিতে হবে সে কথা স্মরণ করা ।
- ৭) সমস্ত বিষয়ের হক একটি একটি করে আল্লাহর কাছে আদায় করতে হবে সে কথা চিন্তা করা ।
- ৮) অতঃপর কঠিন আযাবের সম্মুখীন হতে হবে সে কথা চিন্তা করা ।

## মৃত্যু সংক্রান্ত দু'টি সত্য ঘটনা

**ঘটনা ১ :** অষ্ট্রেলিয়ার বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার ড. তৌফিক চৌধুরী ক্যান্সারে আক্রান্ত এক মৃত্যু পথযাত্রীর কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছিলেন । সেই চিঠিটি তিনি তার একটি লেকচারে আমাদের শিক্ষণীয় হিসেবে পড়ে শুনিয়েছিলেন । নিম্নে তা শিক্ষণীয় হিসেবে তুলে ধরা হলো ।

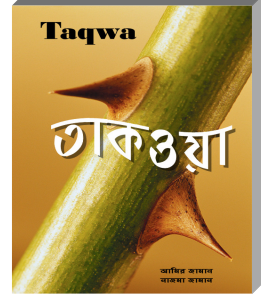
শ্রদ্ধেয় তৌফিক ভাই, আসসালামু 'আলাইকুম । আপনার কাছে এটি আমার শেষ চিঠি । আমি শায়িত অবস্থায় জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার জন্য অপেক্ষায় আছি । আপনি যখন আপনার ছাত্রদেরকে শিক্ষা দিবেন তখন হয়ত আমার এই চিঠি তাদের কাছে শিক্ষণীয় হিসেবে তুলে ধরতে পারবেন । আপনি আমাকে অনেক দিন ধরে চিনেন । আমি একজন সাধারণ মুসলিম । আমি সলাত আদায়, রমাদানে সিয়াম পালন এবং হাজ্জ পালন করার চেষ্টা করেছি । আমার সন্তান এবং স্ত্রী আছে কিন্তু তাদেরকে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারি নাই । আমি ধার্মিক স্ত্রী দেখে বিয়ে করি নাই । আমার সন্তানরা বড় হচ্ছে কিন্তু তারা ইসলাম সম্পর্কে তেমন কিছুই জানে না । আমার জীবনের শেষ ঘন্টা হয়ত অল্পক্ষণের মধ্যে বেজে যাবে । আমি প্যানক্রিয়েটিক ক্যান্সারে আক্রান্ত, ডাক্তার বলেছে এই সপ্তাহের বেশী আমি আর টিকব না । এখন আমি অপেক্ষা করছি মৃত্যুর ফিরিশতার জন্য । এই মুহূর্তে শুধু একটি কথাই আমার মনে আসছে এবং তা হচ্ছে 'দ্বীন ইসলামের প্রতি অবহেলা' । আমার অনেক কিছুই করার ছিল কিন্তু করতে পারিনি । কুরআন অধ্যয়ন করার কথা ছিল কিন্তু করা হয়নি । আমার মার সেবা করা উচিত ছিল কিন্তু করা হয়নি । আমার সন্তানদেরকে ইসলাম ও কুরআন শিক্ষা দেয়া উচিত ছিল কিন্তু দেয়া হয়নি । সহীহ দ্বীন পালন করে এমন লোকদের সংস্পর্শে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু নিয়ে যাওয়া হয়নি । আমি আর একটি রমাদান চেয়েছিলাম কিন্তু তা আমি আর কোনদিনও পাব না । মক্কায় মসজিদে হারামে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল কিন্তু আর কোনদিন

যাওয়া হবে না। আমার কুরআন সম্পর্কে আরো জানা উচিত ছিল কিন্তু আমি সূরা ফাতিহাসহ আর দু'টি সূরা ছাড়া আর তেমন কিছু জানি না। আমি মনে করি এ সবই আমার অবহেলার কারণ। আপনি ছাড়া আর হয়ত কেউই আমাকে মনে রাখবে না। আমার পরিবার হয়ত আমাকে মনে করবে সম্পত্তি ভাগের সময়। আমার বন্ধু-বান্ধবরাও কেউ আজ আমার পাশে নেই। আমি এ পৃথিবীতে ভাল কিছুই রেখে যাচ্ছি না শুধুমাত্র একটা অতিরিক্ত কবর বাড়ছে। ইতি : আপনার মুসলিম ভাই।

**ঘটনা ২ :** ইংল্যান্ডের ইস্ট লন্ডন মসজিদের ইমাম আবদুল কাইউম সাহেবও তার একটি লেকচারে একটি করুণ মৃত্যুর ঘটনা শিক্ষণীয় হিসেবে তুলে ধরেছিলেন।

একদিন এক ভদ্রলোক ইমাম সাহেবের নিকট এসে বলছেন : ইমাম সাহেব আমার ছোট ভাই হঠাৎ মারা গেছেন কিন্তু তিনি তেমন একটা দ্বীনদার ছিলেন না, এখন কি কিছু করার আছে? ইমাম সাহেব তখন উত্তরে বলছেন, ভাই আপনি বড্ড দেরী করে ফেলেছেন। আপনার এই পদক্ষেপটা নেয়া উচিত ছিল আপনার ভাইয়ের মৃত্যুর আগে। তখন ইমাম সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কিভাবে মারা গেলেন? তখন ঐ ভদ্রলোক বলছেন, আমার ভাই খুব বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। একদিন টাকা গুনছিলেন হঠাৎ ঐ টাকা গুনতে গুনতে এক সময় চেয়ার থেকে ঢলে পরে গেলেন এবং আর ফিরে এলেন না। তখন ইমাম সাহেব ঐ ভদ্রলোকটিকে বললেন, আপনার ভাই বেঁচে থাকতে আপনি তাকে নসিহত করেননি কেন? তখন ভদ্রলোকটি বললেন, আমি যে তাকে নসিহত করিনি তাও ঠিক নয় কিন্তু আমি বুঝিনি তিনি যে এতো তাড়াতাড়ি চলে যাবেন, আমার আগে তিনি চলে যাবেন! ইমাম সাহেব তখন বলছেন যে, এখন যদি তার সমস্ত টাকা-পয়সাও দান করে দেয়া হয় তাহলে তার এক ওয়াক্ত সলাত ছেড়ে দেয়ার মাসুল হবে না। তাই আমাদের সকলেরই সময় থাকতে সাবধান হওয়া উচিত।

## সলাত ও তাকওয়া



### খুশু ও খুযু (ভয়-বিনয়-আশা-একাত্মতা)

“এবং আল্লাহর জন্য দাঁড়াও বিনীত হয়ে।” (সূরা বাকারা : ২৩৮)

“আর তোমরা ধৈর্য ও সলাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় তা বিনয়ী ছাড়া অন্যদের উপর কঠিন। যারা বিশ্বাস করে যে, তারা তাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং তারা তাঁর দিকে ফিরে যাবে।” (সূরা বাকারা : ৪৫-৪৬)

সলাত ইসলামের একটি শরীরিক ইবাদত, বড় রুকন। একাগ্রতা ও বিনয়াবনতা এর প্রাণ, শরীয়তের অমোঘ নির্দেশও। এদিকে অভিশপ্ত ইবলিশ মানবজাতিকে পথভ্রষ্ট ও বিপদগ্রস্ত করার শপথ নিয়ে অঙ্গীকার করেছে,

“তারপর অবশ্যই তাদের নিকট উপস্থিত হব, তাদের সামনে থেকে ও তাদের পেছন থেকে এবং তাদের ডান দিক থেকে ও তাদের বাম দিক থেকে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না”। (সূরা আরাফ : ১৭)

কাজেই তার মূল উদ্দেশ্য মানবজাতিকে সলাত হতে অন্য মনস্ক করা। ইবাদতের স্বাদ ও সওয়াবের বিরাট অংশ থেকে বঞ্চিত করার নিমিত্তে সলাতে বিভিন্ন ধরনের প্ররোচনা ও সন্দেহের অনুপ্রবেশ ঘটানো। তবে বাস্তবতা হল, শয়তানের আহবানে মানুষের বিপুল সাড়া, সর্বপ্রথম সলাতের একাগ্রতা পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নেয়া এবং শেষ জমানা। এ হিসেবে আমাদের উপর হুজায়ফা (রা.) এর বাণী প্রকটভাবে সত্যতার রূপ নিয়েছে। তিনি বলেন, ‘সর্বপ্রথম তোমরা সলাতের একাগ্রতা হারা হবে, সর্ব শেষ হারাতে সলাত। অনেক সলাত আদায়কারীর ভেতর-ই কোনো কল্যাণ বিদ্যমান থাকবে না। হয়তো মসজিদে

প্রবেশ করে একজন মাত্র সলাত আদায়কারীকেও সলাতে বিনয়ী-একাগ্রতা সম্পন্ন দেখবে না ।’ (মাদারিজুস সালিকিন, ইবনুল কায়্যিম) আল্লাহ বলেন,

“মু’মিনগণ সফলকাম, যারা সলাতে মনোযোগী ।” (সূরা আল-মু’মিনুন : ১-২)  
অর্থাৎ আল্লাহ ভীরু এবং সলাতে স্থির ।

‘খুশু হল-আল্লাহর ভয় এবং ধ্যান হতে সৃষ্ট স্থিরতা, গাভীর্যতা ও নম্রতা । (‘দার-আশশুআব প্রকাশিত ইবনে কাসির : ৬/৪১৪)

‘বিনয়াবনত এবং আপাত-মস্তক দীনতাসহ আল্লাহর সমীপে দন্ডায়মান হওয়া’ ।  
(আল-মাদারেজ : ১/৫২০)

মুজাহিদ বলেন, ‘কুনুতের অর্থ : আল্লাহর ভয় হতে উদ্যোগ স্থিরতা, একাগ্রতা, অবনত দৃষ্টি, সর্বাঙ্গীন আনুগত্য । (তাজিমু কাদরিস সলাত ১/১৮৮)

ইজায়ফা (রা.) বলতেন, ‘নিফাক সর্বশ্ব খুশু হতে বিরত থাক । জিজ্ঞাসা করা হল, নিফাক সর্বশ্ব খুশু আবার কী? উত্তরে বললেন, শরীর দেখতে একাগ্রতাসম্পন্ন অথচ অন্তর একাগ্রতা শূন্য ।’

সলাতেই আমার চোখের শান্তি রাখা হয়েছে । (মুসনাদে আহমাদ : ৩/১২৮)

সূরা আহযাবের ৩৫ নং আয়াতে আল্লাহ কুরআনে মনোনীত বান্দাদের আলোচনায় খুশুর সহিত সলাত আদায়কারী নারী-পুরুষের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তাদের জন্য ধার্যকৃত ক্ষমা ও সুমহান প্রতিদানের ঘোষণা করেছেন । খুশু বান্দার উপর সলাতের দায়িত্বটি স্বাভাবিক ও হালকা করে দেয় । আল্লাহ বলেন,

“আর তোমরা ধৈর্য ও সলাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও । নিশ্চয় তা খুশুওয়ালা-বিনয়ী ছাড়া অন্যদের উপর কঠিন । (সূরা বাকারা : ৪৫)

অর্থাৎ সলাতের কষ্ট বড় কঠিন, তবে খুশু ওলাদের জন্য কোন কষ্টই নয় ।” (তাফসিরে ইবনে কাসির : (১/১২৫) খুশু যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমন কঠিন ও দুর্লভ, বিশেষ করে আমাদের এ শেষ জামানায় । রসূল ﷺ বলেন, এই উম্মত হতে সর্বপ্রথম সলাতের খুশু উঠিয়ে নেয়া হবে, এমনকি সন্ধান করেও তুমি কোনো খুশু ওয়ালা লোক খুঁজে পাবে না । (তাবরানি)



## খুশু তথা একাগ্রতার হকুম

“তোমরা ধৈর্য ও সলাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, তবে সলাতে একাগ্রতা বশিষ্ঠদের জন্য তা খুব কঠিন।” (সূরা আল-বাকারা : ৪৫)

এর মাধ্যমে খুশুহীনদের দুর্নাম ও নিন্দা করা হয়েছে। অর্থাৎ খুশু ওয়াজিব। কারণ, ওয়াজিব পরিত্যাগ করা ছাড়া কারো দুর্নাম করা হয় না। অন্যত্র বলেন,

“মু'মিনগণ সফল, যারা সলাতে একাগ্রতা সম্পন্ন...তারা ই জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী হবে।” (সূরা মু'মিনুন : ১-১১)

এ ছাড়া অন্যরা তার অধিকারী হবে না। এর দ্বারাও প্রমাণিত হয়, সলাতে খুশু ওয়াজিব। খুশু হল বিনয় ও একাগ্রতার ভাব ও ভঙ্গি। সুতরাং যে ব্যক্তি কাকের মত মাথা ঠোকরায়, রুকু হতে ঠিক মত মাথা উঁচু করে না, সোজা না হয়ে সিজদাতে চলে যায়, তার খুশু গ্রহণযোগ্য নয়। সে গুনাহগার-অপরাধী। (মাজমুউল ফতওয়া : ২২/৫৫৩-৫৫৮)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আল্লাহ তা'আলা ফরয করেছেন। যে ভাল করে ওয়ূ করবে, সময় মত সলাত আদায় করবে এবং রুকু-সিজদা ঠিক ঠিক আদায় করবে, আল্লাহর দায়িত্ব, তাকে ক্ষমা করে দেয়া। আর যে এমনটি করবে না, তার প্রতি আল্লাহর কোনো দায়িত্ব নেই। শান্তিও দিতে পারেন, ক্ষমাও করতে পারেন। (আবু দাউদ)

## খুশু ও খুযু (ভয়-বিনয়-আশা ও একাগ্রতা) সৃষ্টি করার কয়েকটি উপায়

এক. খুশু তৈরী ও শক্তিশালী করণের উপায় গ্রহণ করা।

দুই. খুশুতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বিষয়গুলো পরিহার ও দুর্বল করা। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, খুশুর সহায়ক দুটি জিনিস।

প্রথমটি হল- ব্যক্তির প্রতিটি কথা, কাজ, তিলাওয়াত, যিকির ও দু'আ গভীর মনোযোগ সহকারে আদায় করা। আল্লাহকে দেখে এসব আদায় করছি এরূপ নিয়ত ও ধ্যান করা। “আল্লাহর ইবাদত কর, তাকে দেখার মত করে। যদি তুমি তাকে না দেখ, সে তো অবশ্যই তোমাকে দেখে।” (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয়টি হল- প্রতিবন্ধকতা দূর করা। অন্তরের একাত্মতা বিনষ্টকারী জিনিস ও চিন্তা-ফিকির পরিত্যাগ করা। যা ব্যক্তি অনুসারে সকলের ভেতর হয়ে থাকে। যার ভেতর প্রবৃত্তি ও দ্বীনের ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কিংবা কোনো জিনিসের প্রতি আসক্তি রয়েছে, তার ভেতর প্ররোচনাও অধিক হবে। (মাজমুউল ফতওয়া)

### খুশ ও খুযু শক্তিশালী করণের উপায়সমূহ

**এক :** সলাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ ও তৈরী হওয়া। তারপর কাঁধে কাঁধ ও পায়ের টাখনুর সাথে টাখনু মিলে এবং কাতার সোজা করে দাঁড়ানো। কারণ, শয়তান কাতারের মাঝখানে ফাঁকা জায়গাতে আশ্রয় নেয়।

**দুই :** স্থিরতা অবলম্বন করা। রসূল ﷺ প্রতিটি অঙ্গ স্থায়ী স্থানে ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। রসূল ﷺ বলেছেন, “সলাতে যে চুরি করে, সেই সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর। সে বলল, হে আল্লাহর রসূল সলাতে কীভাবে চুরি করে? তিনি বললেন, রুকু-সিজদা ঠিক ঠিক আদায় করে না।” (আহমাদ ও হাকেম)

**তিন :** সলাতে মৃত্যুর স্মরণ করা। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তুমি সলাতে মৃত্যুর স্মরণ কর। কারণ, যে সলাতে মৃত্যুর স্মরণ করবে, তার সলাত অবশ্যই সুন্দর হবে। এবং সে ব্যক্তির ন্যায় সলাত পড়, যাকে দেখেই মনে হয়, সে সলাতে আছে।” (সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহিহাহ)

**চার :** পঠিত আয়াত ও দু’আ-দুরুদ অর্থসহ বুঝে বুঝে পড়া ও গভীর মনোযোগ দিয়ে তা অনুধাবন করার চেষ্টা করা এবং সাথে সাথে প্রভাবিত হওয়া। কারণ, কুরআন নাযিল হয়েছে মূলতঃ চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করার জন্যই।

**পাঁচ :** সব কথার মূল হচ্ছে রসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে সলাত আদায় করেছেন ঠিক ঐভাবে সলাত আদায় করা। তিনি বলেছেন : ‘তোমরা ঐভাবে সলাত আদায় কর যেভাবে আমাকে আদায় করতে দেখ।’ (সহীহ বুখারী)।

## আকীমুসসলাহ (সলাত প্রতিষ্ঠা করা)

### সলাত কী প্রশিক্ষণ দেয়?

এই পৃথিবীতে নেতৃত্ব দেয়ার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে মুসলিমদের উপর। নেতৃত্ব দিতে হলে নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জন করতে হয়। নেতৃত্বের মৌলিক গুণাবলী অর্জন করতে সক্ষম না হলে, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ- এই দায়িত্ব পালন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সলাত মানুষের মধ্যে নেতৃত্বের গুণ বৈশিষ্ট্য অর্জনে সর্বাঙ্গিক ভূমিকা পালন করে। আল্লাহ বিশ্বমানবতার মুক্তির লক্ষ্যে যে জীবন বিধান অবতীর্ণ করেছেন, সেই জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যারা নেতৃত্ব দিবেন তাদের প্রথম কাজ হলো, নিজেরা যাবতীয় সৎ গুণাবলীর অধিকারী হবেন। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় নেতৃত্বের সর্বপ্রথম গুণ-বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহকে ভয় করা। সলাত মানুষের মধ্যে মহান আল্লাহ তা'আলার ভয় সৃষ্টি করে দেয়।

কুরআনে অসংখ্যবার এই ভয়ের কথা বলা হয়েছে। একটি বিষয়ে বারবার তাগিদ দেয়ার একমাত্র কারণই হলো, যার মনে আল্লাহর ভয় থাকে, সে ব্যক্তির পক্ষে কোনোক্রমেই অসৎ কোনো কাজে নিজেকে জড়িত করা সম্ভব নয়। তার পক্ষে মিথ্যা কথা বলা, আমানতের খিয়ানত করা, অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করা, দায়িত্বে অবহেলা করা বা দেশ ও জাতির ক্ষতি হয় এমন ভূমিকা পালন করা সম্ভব নয়। আল্লাহর ভয় মুসলিমদের মধ্যে সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে জাগরুক রাখার লক্ষ্যেই তাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফরয করে দেয়া হয়েছে। মুসলিমরা সলাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহকে ভয় করে জীবন পরিচালনার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে। যে সলাত থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে মুসলিমরা পৃথিবীতে নেতৃত্ব দেবে, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে, সেই সলাত কি মুসলিমরা আদায় করছে? বরং বিষয়টি হয়েছে সম্পূর্ণ উল্টো। বিশ্ব শাসন করবে মুসলিম জনগোষ্ঠী, এখন লজ্জাজনকভাবে তারাই এমন জাতিসমূহের দ্বারা শাসিত হচ্ছে, যারা পৃথিবীতে যাবতীয় বিপর্যয় সৃষ্টির জন্য দায়ী।

### সলাত সাংগঠনিক জীবনের বাস্তব প্রশিক্ষণ

সলাত মুসলিমদের মধ্যে একতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করার বাস্তব প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এ কথা অনস্বীকার্য যে -ঐক্য, সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ শক্তিশালী না হলে পৃথিবীতে কোনো জাতি সুখী-সমৃদ্ধশালী ও উন্নতির শিখরে পৌঁছতে পারে

না এবং নিজেদের স্বকীয়তা নিয়ে পৃথিবীতে প্রাধান্য বিস্তারও করতে পারে না। ঐক্য, সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের অভাবে পৃথিবীর বহু শক্তিশালী জাতি পরাধীনতার অভিশাপে গোলামীর জীবন বরণ করে নিতে বাধ্য হয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী, মুসলিমদের মধ্যে যখন ঐক্য, সংহতি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত ছিলো, তখন সারা দুনিয়ার নেতৃত্বের আসন ছিলো তাদের পদতলে।

ঐক্য, সংহতি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের অভাব কতটা নির্মম পরিণতি ডেকে আনতে পারে, তার বাস্তব প্রমাণ হলো বর্তমানের মুসলিম দুনিয়া। সারা দুনিয়া ব্যাপী তারা নির্যাতিত হচ্ছে, তাদেরকে বন্য প্রাণীর মতো নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে, মুসলিম নারী ধর্ষিতা হচ্ছে, তাদের সহায়-সম্পদ ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে, একটির পর একটি মুসলিম দেশ অমুসলিম শক্তি দখল করে নিচ্ছে, মসজিদসমূহ অস্ত্রের আঘাতে ধূলিস্মাৎ করে দেয়া হচ্ছে, পবিত্র কুরআন জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে, অসহায় মুসলিম নারী, শিশু, তরুণ-যুবক ও বৃদ্ধদের ধরে কারাগারে অবর্ণনীয় নির্যাতন করা হচ্ছে, কিন্তু প্রায় দেড় শত কোটি মুসলিম নীরবে দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ সামান্য মৌখিক প্রতিবাদও করছে না। এর একমাত্র কারণ হলো, তাদের মধ্যে একতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ নেই। ঐক্য ও সংহতি মুসলিমদের মধ্যে থেকে বিদায় নিয়েছে। সলাতের অন্যতম শিক্ষা হলো ঐক্য, সংহতি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ। কিন্তু মুসলিমদের মধ্যে যারা সলাত আদায় করেন, তাদের অনেকেই সলাত থেকে এই শিক্ষাগ্রহণ করেন না বলেই আমাদের আজ এই অবস্থা।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ আমার উম্মাতকে কখনও ভুল সিদ্ধান্তের উপর সংঘবদ্ধ করবেন না। আর জামায়াত বা দলের উপরই আল্লাহর রহমত। সুতরাং যে জামায়াত বা দল থেকে বিছিন্ন হয়ে যাবে সে জাহান্নামে পতিত হবে। (তিরমিযী)

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি জামায়াত বা দল ত্যাগ করে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল সে যেন ইসলামের রশি থেকে তার গর্দানকে আলাদা করে নিলো। (আবু দাউদ)

ব্যক্তিগত জীবনে একটি লোক যতই আল্লাহভীরু হোক না কেন, যদি সে আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগঠিত মুসলিমদের কোন দলে নিজেকে शामिल না করে, তা হলে ইসলামের দৃষ্টিতে সে পরিপূর্ণভাবে ইসলামে

শামিল হলো না। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণে রাখতে হবে যে, নাবী ﷺ-এর নেতৃত্বে যে জামায়াত বা দল গঠিত হয়েছিল তার নাম ছিলো আল জামায়াত। অর্থাৎ মুসলিমদের একমাত্র জামায়াত বা দল। তখন প্রত্যেকটি লোকের উপর উক্ত দলে যোগ দেয়া ফরয ছিলো এবং উক্ত দলের বাইরে থাকা ছিল কুফরী। কিন্তু আল্লাহর রসূলের বিদায়ের পর তাঁর উম্মতের মধ্যে একাধিক লোকের নেতৃত্বে একাধিক জামায়াত বা দল হতে পারে। তবে তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হতে হবে এক ও অভিন্ন এবং সে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর প্রদর্শিত পন্থায় আল্লাহর দ্বীনের প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠা করা।

ফলে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অভিন্নতা একাধিক দলও পরস্পর পরস্পরের সহযোগিতা করবে কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না। নাবী ﷺ-এর বিদায়ের পর মুসলিমদের বিশেষ কোন একটি দল নিজেদের দলকে সমগ্র বিশ্বের জন্য একমাত্র জামায়াত বা দল বলে দাবী করতে পারে না, যার বাইরে থাকা কুফরী। পক্ষান্তরে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে মুসলিমদের কোন একটি দলে অংশগ্রহণ না করে নিজেকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের একজন সদস্য মনে করে আত্মতৃপ্তি লাভ করা বোকামী।

## দ্বীন প্রতিষ্ঠায় সলাতের গুরুত্ব

দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা ব্যতীত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব নয় এবং এই কাজে নিজেকে নিয়োজিত করার অর্থই হলো, সমাজ, দেশ তথা পৃথিবীতে আল্লাহদ্রোহীতার যে প্লাবন বয়ে যাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের এই পথ মোটেও সহজ নয়- এই পথ খুবই কঠিন। এই কাজ যেমন মর্যাদাপূর্ণ তেমনি বিপদসঙ্কুল। এই পথে অগ্রসর হবার সাথে সাথে অবশ্যম্ভাবীরূপে বিবিধ প্রকার বিপদ-মুসীবত অবতীর্ণ হবে, কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে, নানা প্রকার ক্ষতি স্বীকার করতে হবে। কিন্তু ধৈর্য, দৃঢ়তা, ত্যাগ-তিতীক্ষা, সঙ্কল্প, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অবিচল ভূমিকার মাধ্যমে এসব কঠিন বিপদের মোকাবেলা করে আল্লাহর পথে দুর্বীর গতিতে অগ্রসর হতে হবে আর তখনই তাদের উপরে আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ বৃষ্টির মতোই বর্ষিত হতে থাকবে।

দ্বীন প্রতিষ্ঠার এই মহান কাজ করার জন্য যে শক্তি-সামর্থ প্রয়োজন, তা দুটো জিনিসের মাধ্যমে লাভ করা যেতে পারে। প্রথম হলো “সবর” বা ধৈর্য ও

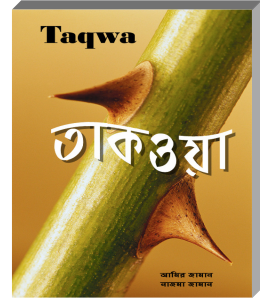
যাবতীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য নিজের মধ্যে বিকশিত করা। দ্বিতীয় হলো সলাত। সলাতের মাধ্যমে নিজেদেরকে অত্যন্ত দৃঢ় ও শক্তিশালী করে তোলা। এ জন্যই আল্লাহ দ্বীন প্রতিষ্ঠাকামী লোকদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন-

“হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ও সলাতের সাহায্য প্রার্থনা করো, আল্লাহ ধৈর্যশীল লোকদের সাথে রয়েছেন।” (সূরা বাকারা : ১৫৩)

দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ধৈর্যের গুরুত্ব অপরিসীম। এই পথে মানুষকে অবর্ণনীয় অত্যাচার, নির্যাতন, নিষ্পেষণ, লাঞ্ছনা-বঞ্চনা ইত্যাদি সহ্য করতে হয়। আর এসব বিপদ-মুসিবতের মোকাবেলায় মনকে সুদৃঢ় রাখার একমাত্র মাধ্যম হলো সলাত। এ কারণেই উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে, ‘ধৈর্য ও সলাতের মাধ্যমে প্রার্থনা করো’। ইসলামের বিপরীত মতবাদ-মতাদর্শের লোকজন দ্বীন প্রতিষ্ঠাকামী লোকদেরকে এমন এমন ভিত্তিহীন কথা বলবে, যা শুনলে মন-মানসিকতা ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়, উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভাটা পড়ে।

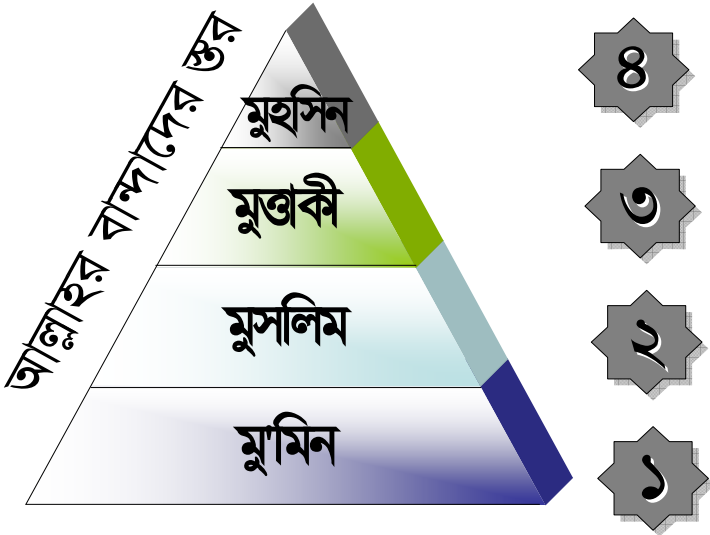
এই সলাতই যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মনকে প্রশান্তিতে ভরে তুলবে। সলাত যাবতীয় যন্ত্রণার উপশম, মানুষের ভেতরে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার জন্ম দেয়। আল্লাহর সৈনিকের সাহস ও শক্তি বৃদ্ধি করে এবং ঐ যোগ্যতা ভেতরে সৃষ্টি করে দেয়, দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অটল-অবিচল থাকার জন্য যে যোগ্যতা প্রয়োজন। একদিকে ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী তাকে গালিগালাজ করছে, তার বিরুদ্ধে অন্যায় অপবাদ ছড়াচ্ছে, তার পথে প্রতিরোধের দেয়াল তুলে দিচ্ছে, অন্য দিকে সে এসব কিছুই তোয়াক্কা না করে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে সম্মুখের দিকে দুর্বীর গতিতে অগ্রসর হচ্ছে- এই যোগ্যতা সলাতই সৃষ্টি করে দেয়। নাবী ﷺ ও সাহাবাদের উপরে পাহাড়-পর্বত সমান বিপদ-মুসিবত এসেছে, এ সময় আল্লাহ তাঁদেরকে সলাতের প্রতি দৃঢ়তা প্রদর্শনের আদেশ দিয়েছেন। কারণ এই সলাতই যাবতীয় বিপদ-মুসিবতকে অগ্রাহ্য করার মতো মনোবল সৃষ্টি করে।

## তাকওয়াবানদের পরিচয়



### আল কুরআনে তাকওয়াবানদের বিভিন্ন স্তর

নিয়মিত তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমে ঈমানের গভীরতা বৃদ্ধি পায় এবং ঈমান মজবুত হয়। এভাবে দিন-দিন ঈমানের গভীরতা বৃদ্ধির সাথে-সাথে মহান আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্কও ঘনিষ্ঠ হয়। নিচের পিরামিডের উদাহরণের মাধ্যমে তাকওয়াবানদের বিভিন্ন স্তর দেখানো হয়েছে।



**১) মু'মিন :** একজন মানুষ যখন ৬টি বিষয়ের উপর ঈমান (বিশ্বাস) আনে, এবং তাতে পরিপূর্ণভাবে দাখিল হয় তখন তাকে বলা হয় মু'মিন। যেমন : ১) আল্লাহতে বিশ্বাস ২) ফিরিশতাগণে বিশ্বাস ৩) আসমানী কিতাবে বিশ্বাস ৪) নাবী এবং রসূলদের উপর বিশ্বাস ৫) পরকাল এবং বিচার দিবসে বিশ্বাস এবং ৬) তকদীরে বিশ্বাস। কোন কোন স্কলারের গবেষণায় প্রথমে মুসলিম এবং দ্বিতীয় মু'মিন। তবে আমাদের এই আলোচনায় আগে এবং পরে মূল বিষয় না, এখানে তাকওয়ার গভীরতা বুঝানোর জন্য এই ধাপগুলো দেখানো হয়েছে।

**২) মুসলিম :** যারা ঈমান আনার পর অর্থাৎ মু'মিন হওয়ার পর মহান আল্লাহ তা'আলার সমস্ত ফরয হুকুমগুলো মেনে চলে তাদেরকে মুসলিম বলা হয়। যেমন : সূরা আলে ইমরানের ১০২ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন “হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর, তাকে যেরূপ ভয় করা উচিত। তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।”

**৩) মুত্তাকী :** যারা পরিপূর্ণভাবে মু'মিন ও মুসলিম হওয়ার পর তার প্রত্যেক দিনের প্রতিটি কাজকর্ম তাকওয়ার সাথে করবে অর্থাৎ প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহকে ভয় করে চলবে এবং যা করবে তা শুধু মহান আল্লাহর জন্যই করবে সে মুত্তাকী হতে পারবে। ঈমানের শাখা-প্রশাখাগুলো সত্যিকার অর্থে বাস্তবে করে দেখাতে হবে। এই বইয়ের প্রথম দিকে মুত্তাকীদের চারিত্রিক গুণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই শ্রেণীর লোকজনদেরকে সিদ্দিকিনও বলা হয়। যেমন আমরা যদি আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু এর জীবনী পড়ি তাহলে আমরা জানতে পারি রসূল ﷺ তাঁকে সিদ্দিক উপাধি দিয়েছেন।

**৪) মুহসিন :** এটা হচ্ছে তাকওয়াবানদের সর্বোচ্চ স্তর। ধাপে ধাপে মু'মিন, মুসলিম এবং মুত্তাকী হওয়ার পর এবার তাকওয়ার পরীক্ষার সর্বোচ্চ স্তর যা মহান আল্লাহ তা'আলার সাথে খুব গভীর সম্পর্ক স্থাপন বা আল্লাহ তা'আলার খুব কাছাকাছি পৌঁছার সুযোগ করে দেয় তা হলো এই স্তর (মুহসিন)। আর তা একমাত্র উন্নত ও বিশুদ্ধ তাকওয়ার মাধ্যমেই সম্ভব।

পূর্বে আমরা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর তাকওয়ার পরীক্ষাগুলো দেখেছি। যেমন : ১) আগুনের কুন্ডে নিক্ষিপ্ত করা, ২) নবজাতক শিশু সন্তানকে তার মাসহ মরুভূমির মধ্যে রেখে আসা, এবং ৩) নিজ হাতে নিজের সন্তানকে কুরবানী করা। এই তিনটি তাকওয়ার পরীক্ষাতেই ইবরাহীম আলাইহিস সালাম



কৃতিত্বের সাথে পাশ করেছেন। এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কে মুহসিন বলেছেন।

তাহলে আমরা তাকওয়াবানদের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পেলাম। আসুন, এবার আমরা নিজেদের তাকওয়া পরিমাপ করে দেখি আমাদের কার অবস্থান কোন স্তরে। আল্লাহর বান্দাদের এই চারটি ধাপ আল্লাহ কুরআনে এক সংগে কোথাও এভাবে উল্লেখ করেননি। ইসলামের স্কলারগণ বিভিন্ন আয়াত গবেষণা করে কুরআনের তাফসীরে তা ব্যাখ্যা করেছেন। তাই এই বিষয়টা তাকওয়া বুঝার সুবিদার্থে আমরা সহজভাবে নেই এবং আকীদার সাথে কোন প্রকার conflict তৈরী না করি।

## কে সর্বাধিক মুত্তাকী?

আল্লাহ বলেন : যে কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে [শা'আ-ইরা] সম্মান করলে সেটা তো তার হৃদয়ের তাকওয়া সজ্জাত (২২ : ৩২)

স্পষ্টতঃই তাকওয়া হচ্ছে অন্তরের বিষয় যা একমাত্র আল্লাহরই জ্ঞানায়ত্ত, সেটা জানা মানুষের অসাধ্য। আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে : মানুষের মাঝে এমন ব্যক্তি আছে পার্থিব জীবন সম্বন্ধে যার কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে এবং তার অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে। প্রকৃতপক্ষে সে একজন ঘোর বিরোধী (২ : ২০৪)

কুরআনে আল্লাহ বলেছেন যে তিনি তাঁর দাসদের (বান্দাদের) মাঝ থেকে ওয়ালি (বন্ধু) বাছাই করে থাকেন তাদের তাকওয়ার ভিত্তিতে। [ওয়ালি-বন্ধু; আউলিয়া-বন্ধুগণ] আল্লাহ তাঁর ওয়ালিদের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে তারা ভয়ে বা দুঃখে কাতর হয় না, আল্লাহতে ঈমান রাখে এবং অন্তরে তাকওয়া ধারণ করে থাকে (১০ : ৬২-৬৩) আল্লাহ আরো বলেছেন যে শুধু মুত্তাকীরাই তাঁর আউলিয়া কিন্তু সে কথা তারা উপলব্ধি করতে পারে না (৮ : ৩৪) সুতরাং আল্লাহর ওয়ালি একমাত্র সেই ব্যক্তি যার হৃদয়ে ঈমান আছে। তাকওয়া আছে, এবং আল্লাহর ভয় আছে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ বহু মুসলিম তাদের অনুমানের উপর নির্ভর করে কিছু লোককে আল্লাহর ওয়ালি খেতাব দিয়ে বসে আছে যা গ্রহণযোগ্য নয় কারণ সেই সব তথাকথিত আউলিয়াদের প্রকৃত যোগ্যতা (ঈমান, তাকওয়া, আল্লাহ-ভীতির

গভীরতা ইত্যাদির জ্ঞান) একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন সেসব লোক সত্যিই তাঁর আউলিয়া কিনা ।

ওয়ালি-আউলিয়া খেতাব দেয়ার প্রথাটা মুসলিমরা খৃষ্টান ও হিন্দু ধর্মীয় আচার-আচরণ থেকে ধার করে এনেছে । ওসব ধর্মে লোকেরা তাদের সমাজের কিছু লোককে উচ্চ পর্যায়ে আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব অনুমান করে [Saint, অবতার, মহাগুরু ইত্যাদি] অতি উঁচু ধরনের উপাধি দিয়ে অস্বাভাবিক রকম সম্মান প্রদর্শন করে থাকে ।

সেই সব তথাকথিত আউলিয়াদের কবরের উপর সুদৃশ্য বিল্ডিং গড়ে তুলে সেখানে তাদের মৃত আত্মাদের প্রতি নানা ধরনের সাহায্য-সহায়তা চেয়ে কাতর প্রার্থনা জানানো হয় মনে এই বিশ্বাস নিয়ে যে সেই সব আউলিয়ারা প্রার্থনাকারীদের আবেদন-নিবেদন কবুল করার জন্যে আল্লাহর কাছে ‘সুপারিশ’ করবেন । এই প্রথা সম্পূর্ণরূপে ইসলামী শিক্ষার বিরোধী । ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ভয় করে শুধু তাঁরই ইবাদত করা ।

## মুত্তাকীর গুণাবলী

যারা প্রকৃতই মুত্তাকী তাদের মাঝে এসব লক্ষণ/গুণাবলী লক্ষ্য করা যাবে –

- ১) তারা গীবত করা থেকে বিরত থাকে, কারণ আল্লাহ বলেছেন যে তোমরা একে অন্যের গীবত করবে না । (সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১২)
- ২) তারা সন্দেহজনক বিষয় ও বস্তু বর্জন করে, কারণ আল্লাহ বলেছেন যে অনুমান করাটা অনেক ক্ষেত্রেই গুনাহের কাজ (সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১২) । রসূলুল্লাহ ﷺ ও অনুমান করে কোন কথা বলাকে মিথ্যা বলার সমতুল্য জ্ঞান করে তা বর্জন করতে নির্দেশ দিয়েছেন । (মুসনাদে আহমাদ)
- ৩) তারা কাউকে বিদ্রূপ বা উপহাস করে না, কারণ আল্লাহ তা করতে নিষেধ করেছেন । (সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১১)
- ৪) তারা তাদের দৃষ্টিকে নিষিদ্ধ বস্তু থেকে অবনত রাখে, কারণ আল্লাহ সে রকম করতে নির্দেশ দিয়েছেন । (সূরা নূর, ২৪ : ৩০)
- ৫) তারা সদা সত্যবাদী, কারণ আল্লাহ সত্য ও ন্যায় কথা বলতে নির্দেশ দিয়েছেন । (সূরা আন’আম, ৬ : ১৫২)

- ৬) তারা তাদের উপর আল্লাহর রহমতের জন্যে শুকরিয়া আদায় করে, কপটতা বর্জন করে, কারণ তা করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। (সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১৭)
- ৭) তারা নিজেদের সম্পদ সৎপথে, সৎ উদ্দেশ্যে ব্যয় করে, অপব্যয় করে না, কৃপণতা করে না, তারা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে, কারণ আল্লাহ তা করতে বলেছেন। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৬৭)
- ৮) তারা উদ্ধত বা গর্বিত ব্যবহার করে না, কারণ আল্লাহ তা নিষেধ করেছেন। (সূরা কাসাস, ২৮ : ৮৩)
- ৯) খুশ-খুজুর সংগে সমস্ত নিয়ম-পদ্ধতি মেনে যথা সময়ে তারা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, কারণ আল্লাহ সেরকম করতে আদেশ দিয়েছেন। (সূরা বাকারা, ২ : ২৩৮)
- ১০) দৃঢ়তার সংগে কুরআন ও সুন্নাহের নির্দেশাবলী তারা পালন করে যাতে তারা মুত্তাকীদের দলভুক্ত থাকতে পারে, কারণ আল্লাহ সে রকম আদেশ করেছেন। (সূরা আন'আম, ৬ : ১৫৩)

**দুর্বলদের তাকওয়া :** এটা হচ্ছে এমন মানুষের তাকওয়া, যদিও তারা নিজেদেরকে গোনাহে লিপ্ত হওয়া ও পাপাচারে নিমজ্জিত হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে সুষ্ঠু ও শান্ত পরিবেশে। কিন্তু দুষিত ও আশান্ত পরিবেশ পরিস্থিতিতে এবং পাপাচার সংক্রামিত স্থান ও পরিবেশে তারা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে না। অনুরূপভাবে নিজে পাপাচার থেকে বিরত থাকতে পারলেও অন্যকে পাপের পঙ্কিলতা ও কদর্যতা থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় না।

**সবলদের তাকওয়া :** এটা এমন লোকদের তাকওয়া, যারা এমন সুদৃঢ় আত্মিক শক্তি ও চারিত্রিক গুণের অধিকারী যে, তারা যে কোন প্রতিকূল ও অশান্ত পরিবেশ-পরিস্থিতিতেও নিজেদেরকে গোনাহে জড়িয়ে পড়া থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয়। তাদের আত্মিক শক্তি তাদের ও গোনাহের মধ্যে বাধার প্রাচীর সদৃশ হয়ে দাঁড়ায় এবং তাদেরকে পাপের পঙ্কিলতা থেকে রক্ষা করে। সাথে সাথে অন্যদেরকেও নহীহত-উপদেশ, দিকনির্দেশনা, উত্তম নমুনা পেশ ও আল্লাহর আযাবের ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে বিরত রাখতে সক্ষম হয়।

## আল্লাহ কাদেরকে ভালবাসেন আর কাদেরকে ভালবাসেন না

কুরআনে আল্লাহ তা'আলা অনেক জায়গাতে আমাদের জানিয়েছেন তিনি কাদেরকে ভালবাসেন আর কাদেরকে ভালবাসেন না। তাকওয়ার আলোকে সেগুলো জানা যাক।

### আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে ভালবাসেন

- আর ব্যয় কর আল্লাহর পথে, তবে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন করো না। আর মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করো। আল্লাহ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন। (সূরা আল বাকারা : ১৯৫)
- নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী ও অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন। (সূরা আল বাকারা : ২২২)
- যে লোক নিজ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবে এবং পরহেজগার হবে, --- আর আল্লাহ তা'আলা পরহেজগারদেরকে ভালবাসেন। (সূরা আলে ইমরান : ৭৬)
- আর যারা সবর করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভালবাসেন। (সূরা আলে ইমরান : ১৪৬)
- অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার সওয়াব দান করেছেন যথার্থ আখিরাতের সওয়াব। আর যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। (সূরা আলে ইমরান : ১৪৮)
- অতঃপর যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলে তখন আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করুন, আল্লাহ তাওবাকারীদেরকে ভালবাসেন। (সূরা আলে ইমরান : ১৫৯)
- আপনি (রসূলুল্লাহ ﷺ) সর্বদা তাদের কোন না কোন --- সম্পর্কে অবগত হতে থাকেন, তাদের অল্প কয়েকজন ছাড়া। আর আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং মার্জনা করুন। আল্লাহ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন। (সূরা মায়িদা : ১৩)

- যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে, সে জন্য তাদের কোন গুনাহ নেই যখন ভবিষ্যতের জন্য সংযত হয়েছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে, এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেছে। এরপর সংযত থাকে এবং সৎকর্ম করে। আল্লাহ সৎকর্মীদেরকে ভালবাসেন। (সূরা মায়িদা : ৯৩)
- নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন। (সূরা মায়িদা : ৪২)
- নিশ্চয় আল্লাহ সাবধানীদের পছন্দ করেন। (সূরা তাওবা : ৪)
- নিঃসন্দেহে আল্লাহ সাবধানীদের পছন্দ করেন। (সূরা তাওবা : ৭)
- আল্লাহ পবিত্র লোকদের ভালবাসেন। (সূরা তাওবা : ১০৮)
- নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে পছন্দ করেন। (সূরা আল হুজুরাত : ৯)
- আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তার পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে। যেন তারা সীসাগালানো প্রাচীর। (সূরা আস সফ : ৪)
- ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ এবং ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালবাসেন। (সূরা আল মুমতাহিনাহ : ৮)

### আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে ভালবাসেন না

- নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (সূরা আল বাকারা : ১৯০)
- আল্লাহ ফাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা পছন্দ করেন না। (সূরা আল বাকারা : ২০৫)
- আল্লাহ পছন্দ করেন না কোন অবিশ্বাসী পাপীকে। (সূরা আল বাকারা : ২৭৬)
- আল্লাহ অশান্তি এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (সূরা মায়িদা : ৬৪)

- আল্লাহ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না । (সূরা মায়িদা : ৮৭)
- হে বনী আদম! তোমরা প্রত্যেক সলাতের সময় সাজসজ্জা পরিধান করে নাও, খাও ও পান কর এবং অপব্যয় করো না । তিনি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না । (সূরা আ'রাফ : ৩১)
- তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক, কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে তিনি সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না । (সূরা আ'রাফ : ৫৫)
- আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালবাসেন না । (সূরা বাকারা : ৩২)
- আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন না । (সূরা বাকারা : ৫৭, ১৪০)
- নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না দাঙ্গিক গর্বিতজনকে । (সূরা নিসা : ৩৬)
- আল্লাহ কোন মন্দ বিষয় প্রকাশ করা পছন্দ করেন না । তবে কারো প্রতি যুলুম হয়ে থাকলে সে কথা আলাদা । (সূরা নিসা : ১৪৭)
- এগুলোর ফল খাও, যখন ফলশু হয় এবং হক দান কর কর্তনের সময়ে এবং অপচয় করো না । নিশ্চয় তিনি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না । (সূরা আন'আম : ১৪১)
- নিশ্চয় আল্লাহ ধোকাবাজ, প্রতারণারকে পছন্দ করেন না । (সূরা আনফাল : ৫৮)
- নিশ্চতই আল্লাহ অহংকারকারীদের পছন্দ করেন না । (সূরা নাহল : ২৩)
- আল্লাহ কোন বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না । (সূরা হাজ্জ : ৩৮)
- আল্লাহ দাঙ্গিকদেরকে ভালবাসেন না । (সূরা কাসাস : ৭৬)
- আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন তদ্বারা পরকালের গৃহ অনুসন্ধান করো, এবং ইহকাল থেকে তোমার অংশ ভুলে যেওনা । তুমি অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়েনা । নিশ্চয় আল্লাহ অনর্থ সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না ।” (সূরা কাসাস : ৭৭)

- নিশ্চয় তিনি কাফিরদের ভালবাসেন না । (সূরা রুম : ৪৫)
- অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করোনা এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদাচরণ করো না । নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাস্তিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না । (সূরা লুকমান : ১৮)
- আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই । যে ক্ষমা করে ও আপোষ করে তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে রয়েছে, নিশ্চয় তিনি অত্যাচারীদেরকে পছন্দ করেন না । (সূরা আশ শুরা : ৪০)
- আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না । (সূরা হাদীদ : ২৩)

## প্রকৃত তাকওয়া এবং কৃত্রিম তাকওয়া

তাকওয়া কোনো বাহ্যিক ধরন-ধারণ এবং বিশেষ কোনো সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের নাম নয় । তাকওয়া মূলতঃ মানব মনের সেই অবস্থাকেই বলা হয় যা আল্লাহর গভীর ভীতি ও প্রবল দায়িত্বানুভূতির দরশন সৃষ্টি হয় এবং জীবনের প্রত্যেকটি দিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আত্মপ্রকাশ করে । মানুষের মনে আল্লাহর ভয় হবে, নিজে আল্লাহর দাসানুদাস-এ চেতনা জাগ্রত থাকবে আল্লাহর সামনে নিজের দায়িত্ব ও জবাবদিহি করার কথা স্মরণ থাকবে এবং এ একটি পরীক্ষাগার, আল্লাহ জীবনের একটি নির্দিষ্ট আয়ুদান করে এখানে পাঠিয়েছেন, এ খেয়াল তীব্রভাবে বর্তমান থাকবে । পরকালে ভবিষ্যতের ফায়সালা এ দৃষ্টিতে হবে যে, এ নির্দিষ্ট অবসরকালের মধ্যে এ পরীক্ষাগারে নিজের শক্তি, সামর্থ্য ও যোগ্যতা কিভাবে প্রয়োগ করেছে, আল্লাহর ইচ্ছানুক্রমে যেসব দ্রব্যসামগ্রী লাভ করতে পেরেছে, তার ব্যবহার কিভাবে করেছে এবং আল্লাহর নিজস্ব বিধান অনুযায়ী জীবনকে বিভিন্ন দিক দিয়ে যেসব মানুষের সাথে বিজড়িত করেছে, তাদের সাথে কিরূপ কাজকর্ম ও লেনদেন করা হয়েছে-একথাটিও মনের মধ্যে জাগরুক থাকবে ।

বস্তুত এরূপ অনুভূতি ও চেতনা যার মধ্যে তীব্রভাবে বর্তমান থাকবে, তার হৃদয় মন জাগ্রত হবে, তার ইসলামী চেতনা তেজস্বী হবে, আল্লাহর মর্জির বিপরীত প্রত্যেকটি বস্তুই তার মনে খট্কার সৃষ্টি করবে, আল্লাহর মনোনীত প্রত্যেকটি জিনিসই তার রুচিতে অসহ্য হয়ে উঠবে, তখন সে নিজেই নিজের যাচাই করবে । তার কোন ধরনের ঝোঁক ও ভাবধারা লালিত-পালিত হচ্ছে নিজেই তার

জরীপ করবে। সে কোন্ সব কাজ-কর্মে নিজের সময় ও শক্তি ব্যয় করছে, তার হিসাব সে নিজেই করতে শুরু করবে। তখন সুস্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ কোনো কাজ করা দূরের কথা সংশয়পূর্ণ কোনো কাজেও লিপ্ত হতে সে নিজে ইতস্তত করবে। তার অন্তর্নিহিত কর্তব্যজ্ঞানই তাকে আল্লাহর সকল নির্দেশ পূর্ণ আনুগত্যের সাথে পালন করতে বাধ্য করবে।

যেখানেই আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমালংঘন হওয়ার আশংকা হবে, সেখানেই তার অন্তর্নিহিত আল্লাহভীতি তার পদযুগে প্রবল কম্পন সৃষ্টি করবে-চলৎশক্তি রহিত করে দিবে। আল্লাহর হুক ও মানুষের হুক রক্ষা করা স্বতঃস্ফূর্ত রূপেই তার স্বভাবে পরিণত হবে। কোথাও সত্যের বিপরীত কোনো কথা বা কাজ তার দ্বারা না হয়ে পড়ে সেই ভয়ে তার মন সতত কম্পমান থাকবে। এরূপ অবস্থা বিশেষ কোনো ধরনের কিংবা বিশেষ কোন পরিধির মধ্যে পরিলক্ষিত হবে না, ব্যক্তির সমগ্র চিন্তা-পদ্ধতি এবং তার সমগ্র জীবনের কর্মধারাই এর বাস্তব অভিব্যক্তি হবে। এর অনিবার্য প্রভাবে এমন এক সুসংবদ্ধ সহজ, স্বাভাবিক এবং একই ভাবধারা বিশিষ্ট ও পরম সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রকৃতি গঠিত হবে, যাতে সকল দিক দিয়েই একই প্রকারের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা ফুটে উঠবে।

পক্ষান্তরে কেবল বাহ্যিক আকার-আকৃতি ও কয়েকটি নির্দিষ্ট পথের অনুসরণ এবং নিজেকে কৃত্রিমভাবে কোনো পরিমাপযোগ্য ছাঁচে ঢেলে নেয়াকেই যেখানে তাকওয়া বলে ধরে নেয়া হয়েছে, সেখানে শিথিলে দেয়া কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ ধরন ও পদ্ধতিতে ‘তাকওয়া’ পালন হতে দেখা যাবে, কিন্তু সেই সাথে জীবনের অন্যান্য দিকে ও বিভাগে এমনসব চরিত্র, চিন্তা-পদ্ধতি ও কর্মনীতি পরিলক্ষিত হবে, যা ‘তাকওয়া’ তো দূরের কথা ঈমানের প্রাথমিক স্তরের সাথেও এর কোনো সামঞ্জস্য হবে না। এটাকেই ঈসা (আ.) উদাহরণের ভাষায় বলেছেন : “এক দিকে মাছি বলে বের করো আর অন্যদিকে বড় বড় উট অবলীলাক্রমে গলধঃকরণ করো।”

প্রকৃত তাকওয়া এবং কৃত্রিম তাকওয়া পারস্পরিক পার্থক্য অন্য একভাবেও বুঝতে পারা যায়। যে ব্যক্তির মধ্যে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার একটি তীব্র ও জাগ্রত রুচি-অনুভূতি বর্তমান রয়েছে, সে নিজেই অপবিত্রতা ও পংকিলতাকে ঘৃণা করবে-তা যে আকারেই হোক না কেন এবং পবিত্রতাকে পূর্ণরূপে ও স্থায়ীভাবে গ্রহণ করবে। এর বাহ্যিক অনুষ্ঠান যথাযথভাবে প্রতিপালিত না হলেও কোনো আপত্তি থাকবে না। অপর ব্যক্তির আচরণ এর বিপরীত হবে। কারণ, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার কোনো স্বতঃস্ফূর্ত চেতনা তার মধ্যে নেই; বরং ময়লা



ও অপবিত্রতার একটি তালিকা কোথা হতে লিখে নিয়ে সবসময়ই সাথে রেখে চলে, ফলে এ ব্যক্তি তার তালিকায় উল্লেখিত ময়লাগুলো হতে নিশ্চয় আত্মরক্ষা করবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তা অপেক্ষা অধিক জঘন্য ও ঘৃণিত বহু প্রকার পংকিলতার মধ্যে সে অজ্ঞতাসারেই লিপ্ত হয়ে পড়বে, তা নিঃসন্দেহে।

কারণ, তালিকায় অনুল্লেখিত পংকিলতা যে কোনোরূপ পংকিল বা ঘৃণিত হতে পারে এটা সে মাত্রই বুঝতে পারে না। এ পার্থক্য কেবল নীতিগত ব্যাপারেই নয়, চারদিকে যাদের তাকওয়ার একেবারে ধুম পড়ে গেছে তাদের জীবনে এ পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। তারা একদিকে শরীরের খুঁটিনাটি বিষয়ে খুবই কড়াকড়ি করে থাকে, এমনকি দাড়ির দৈর্ঘ্য একটি বিশেষ পরিমাপ হতে একটু কম হলেই তাকে জাহান্নামী হওয়ার “সুসংবাদ” শুনিতে দিতে সঙ্কেচবোধ করে না এবং ফিকাহর শাস্ত্রীয় মত হতে কোথাও সমাজ বিচ্যুতিকেও তারা দ্বীন ইসলামের সীমালংঘন করার সমান মনে করে।

কিন্তু অন্যদিকে ইসলামের মূলনীতি ও বুনিয়াদী আদর্শকে তারা চরমভাবে উপেক্ষা করে চলে। গোটা জীবনের ভিত্তি তারা স্থাপিত করেছে অনুমতি ও রাজনৈতিক সুবিধাবাদী নীতির উপর। আল্লাহর দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা-সাধনা ও সংগ্রাম করার দায়িত্ব এড়ানোর জন্য তারা বহু সুযোগের পথ আবিষ্কার করে নিয়েছে। আনইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে তারা ইসলামী জীবন যাপনের প্রস্তুতি করার জন্যই সকল চেষ্টা ও সাধনা নিযুক্ত করে রেখেছে। শুধু তা-ই নয়, তাদেরই ভুল নেতৃত্ব মুসলিমদেরকে একথা বুঝিয়েছে যে, এক ইসলাম বিরোধী সমাজ ব্যবস্থার অধীন থেকে বরং এর ‘খিদমত’ করেও সীমাবদ্ধ গুণ্ডার মধ্যে ধর্মীয় জীবনযাপন করা যায় এবং তাতেই দ্বীন ইসলামের যাবতীয় নির্দেশ প্রতিপালিত হয়ে যায়-অতঃপর ইসলামের জন্য তাদেরকে আর কোনো চেষ্টা-সাধনা বা কষ্ট স্বীকার আদৌ করতে হবে না।

এটা অপেক্ষাও অধিকতর দুঃখের কথা এই যে, তাদের সামনে দ্বীন ইসলামের মূল দাবী যেমন পেশ করা হয় এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা-সাধনা ও আন্দোলনের দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, তখন তারা এর প্রতি শুধু চরম উপেক্ষাই প্রদর্শন করে না, এটা হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এবং অন্যান্য মুসলিমকেও তা হতে বিরত রাখার জন্যে শত রকমের কৌশলের আশ্রয় নেয়। আর এতসব সত্ত্বেও তাদের ‘তাকওয়া’ ক্ষুণ্ণ হয় না; আর ধর্মীয় মনোবৃত্তি সম্পন্ন লোকদের মনে তাদের ‘তাকওয়ার’ অন্তসারশূন্যতা সম্পর্কে সন্দেহ মাত্র জাগ্রত হয় না। এভাবেই প্রকৃত ও নিষ্ঠাপূর্ণ ‘তাকওয়া’ এবং কৃত্রিম ও অন্ত

সারশূন্য ‘তাকওয়ার’ পারস্পরিক পার্থক্য বিভিন্নরূপে সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। কিন্তু তা অনুভব করার জন্য ‘তাকওয়া’র প্রকৃত ধারণা মনের মধ্যে পূর্বেই বদ্ধমূল হওয়া অপরিহার্য।

কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদ, চলাচল, উঠা-বসা ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের বাহ্যিকরূপ-যা সহীহ হাদীস হতে প্রমাণিত হয়েছে-তাকে হীন ও অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়, পূর্বোক্ত আলোচনা হতে সেরূপ ধারণা করা মারাত্মক ভুল হবে, সন্দেহ নেই। এরূপ কথা কল্পনাও করা যায় না। বস্তুত এখানে শুধু একথাই বুঝানো হয়েছে যে, প্রকৃত তাকওয়াই হচ্ছে আসল গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, এর বাহ্যিক প্রকাশ মুখ্য নয়, গৌণ। আর প্রকৃত ‘তাকওয়ার মহিমা দীপ্তি যার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠবে, তার সমগ্র জীবনই পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের সাথে খাঁটি ‘ইসলামী জীবন’ রূপেই গড়ে উঠবে এবং তার চিন্তাধারায়, মতবাদে, তার হৃদয়াবেগ ও মনের ঝোঁক প্রবণতায়, তার স্বভাবগত রুচি তার সময় বন্টন ও শক্তির ব্যয়-ব্যবহার, তার চেষ্টা-সাধনার পথে পন্থায়, তার জীবনধারায় ও সমাজ পদ্ধতিতে তার আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে, তার সমগ্র পার্থিব ও বৈষয়িক জীবনের প্রত্যেকটি দিকে ও বিভাগে পূর্ণ ব্যাপকতা ও সামগ্রিকতার সাথে ইসলাম রূপায়িত হতে থাকবে।

কিন্তু আসল তাকওয়া অপেক্ষা তার বাহ্যিক বেশ-ভূষাকেই যদি প্রাধান্য দেয়া হয়-তার উপরই যদি অযথা গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং প্রকৃত তাকওয়ার বীজ বপন ও তার পরিবর্ধনের জন্য যত্ন না নিয়ে যদি কৃত্রিম উপায়ে কয়েকটি বাহ্যিক হুকুম-আহকাম পালন করান হয়, তবে বর্ণিত রূপেই যে এর পরিণাম ফল প্রকাশিত হবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। প্রথমোক্ত কাজ অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ, সে জন্য অসীম ধৈর্যের আবশ্যিক; এমন বিকাশের নীতি অনুসারেই তা বিকশিত হয়ে এবং দীর্ঘ সময়ের সাধনার পরই তা সুশোভিত হয়ে থাকে-ঠিক যেমন একটি বীজ হতে বৃক্ষ সৃষ্টি এবং তাতে ফুল এবং ফল ধারণে স্বভাবতই বহু সময়ের আবশ্যিক হয়।

এ কারণেই স্থূল ও অস্থির স্বভাবের লোক ঐরূপ তাকওয়া লাভ করার জন্য চেষ্টা করতে সাধারণত প্রস্তুত হয় না। দ্বিতীয় প্রকার তাকওয়ার বাহ্যিক বেশ-ভূষা, সহজলভ্য, অল্প সময় সাপেক্ষ। যেমন একটি কাষ্ঠখণ্ডের পত্র ও ফুল-ফল বেঁধে “ফল-ফুলে শোভিত একটি বৃক্ষ” দাঁড় করা হয়তোবা সহজ; কিন্তু মূলতঃ তা কৃত্রিম, প্রতারণামূলক এবং ক্ষণস্থায়ী। এজন্যই আজ শেষোক্ত প্রকারের তাকওয়াই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কিন্তু একটি স্বাভাবিক বৃক্ষ হতে যা কিছু

লাভ করার আশা করা যায়; একটি কৃত্রিম বৃক্ষ হতে তা কিছুতেই সম্ভব নয়, এটা সর্বজনবিদিত সত্য ।

## তাকওয়া ও ইহসান

‘ইহসান’ ইসলামী জীবন প্রাসাদের সর্বোচ্চ মঞ্জিল-সর্বোচ্চ পর্যায় । মূলতঃ ‘ইহসান’ বলা হয় ঃ আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং তাঁর ইসলামের সাথে মনের এমন গভীরতম ভালবাসা দুঃশ্চৈদ্যবন্ধন ও আত্মহারা প্রেম পাগল ভাবধারাকে, যা একজন মুসলিমকে ইসলামের জন্য আত্মোৎসর্গীকৃত প্রাণ’ করে দিবে । তাকওয়ার মূল কথা হচ্ছে আল্লাহর ভয়, যা আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ হতে দূরে সরে থাকতে উদ্বুদ্ধ করে । আর ইহসানের মূলকথা হচ্ছে আল্লাহর প্রেম-আল্লাহর ভালোবাসা । এটা মানুষকে আল্লাহর সন্তোষ লাভ করার জন্য সক্রিয় করে তোলে ।

এ দু’টি জিনিসের পারস্পরিক পার্থক্য একটি উদাহরণ হতে বুঝা যায় । সরকারী চাকুরীজীবীদের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যক লোক থাকে, যারা নিজ নিজ নির্দিষ্ট দায়িত্ব, কর্তব্যানুভূতি ও আগ্রহ উৎসাহের সাথে যথাযথভাবে পালন করেন । সমগ্র নিয়ম-কানুন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে তারা চলে এবং সরকারের দৃষ্টিতে আপত্তিকর কোনো কাজই তারা কখনো করেন না ।

এ ছাড়া আর এক ধরনের লোক থাকে, যারা ঐকান্তিক নিষ্ঠা, আন্তরিক ব্যগ্রতা ও তিতিক্ষা এবং আত্মোৎসর্গপূর্ণ ভাবধারার সাথেই সরকারের কল্যাণ কামনা করে । তাদের উপর যেসব কাজ ও দায়িত্ব অর্পিত হয়, তারা কেবল তাই সুসম্পন্ন করে না, যেসব কাজে রাষ্ট্রের কল্যাণ ও উন্নতি হতে পারে আন্তরিকতার সাথে সেসব কাজও তারা করার জন্য যত্নবান হয় এবং এজন্য তারা আসল কর্তব্য ও দায়িত্ব অপেক্ষা অনেক বেশী কাজ করে থাকে । রাষ্ট্রের ক্ষতিকর কোনো ঘটনা ঘটে বসলেই তারা নিজেদের জানমাল ও সন্তান সবকিছুই উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত হয় । কোথাও আইন-শৃঙ্খলা লংঘিত হতে দেখলে তাদের মনে প্রচণ্ড আঘাত লাগে । কোথাও রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও বিদ্রোহ ঘোষণার লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হলে তারা অস্থির হয়ে পড়ে এবং তা দমন করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে । নিজে সচেতনভাবে রাষ্ট্রের ক্ষতি করা তো দূরের কথা তার স্বার্থে সামান্য আঘাত লাগতে দেয়া তাদের পক্ষে সহ্যাতীত হয়ে পড়ে এবং সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি দূর করার ব্যাপারে সাধ্যানুসারে চেষ্টার বিন্দুমাত্র ত্রুটি করে না ।

পৃথিবীর সর্বত্র একমাত্র তাদের রাষ্ট্রের জয়জয়কার হোক এবং সর্বত্রই এরই বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়ে পত পত করতে থাকুক-এটাই হয় এ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের মনের বাসনা ।

এ দুয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত কর্মচারীগণ হয় রাষ্ট্রের ‘মুত্তাকী’ আর শেষোক্ত কর্মচারীগণ হয় ‘মুহসীন’ । উন্নতি এবং উচ্চপদ মুত্তাকীরাও লাভ করে থাকে, বরং যোগ্যতম কর্মচারীদের তালিকায় তাদেরই নাম বিশেষভাবে লিখিত থাকে । কিন্তু তা সত্ত্বেও ‘মুহসিনদের’ জন্য সরকারের নিকট যে সম্মান ও মর্যাদা হয়ে থাকে, তাতে অন্য কারোই অংশ থাকতে পারে না । ইসলামে ‘মুত্তাকী’ ও ‘মুহসীনদের’ পারস্পরিক পার্থক্য উক্ত উদাহরণ হতে সুস্পষ্টরূপে বুঝতে পারা যায় । ইসলামে মুত্তাকীদেরও যথেষ্ট সম্মান রয়েছে । তারাও শ্রদ্ধাভাজন সন্দেহ নেই । কিন্তু ইসলামের আসল শক্তি হচ্ছে মুহসিনরা । আর পৃথিবীতে ইসলামের মূল উদ্দেশ্য একমাত্র ‘মুহসিনদের’ দ্বারাই সুসম্পন্ন হতে পারে ।

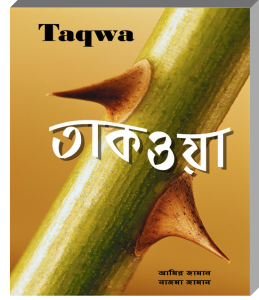
ইহসান এর নিগূঢ় তত্ত্ব জেনে নেয়ার পর প্রত্যেক পাঠকই অনুমান করতে পারেন যে, যারা আল্লাহর দীন ইসলামকে কুফরের অধীন-কুফর কর্তৃক প্রভাবান্বিত দেখতে পায়, যাদের সামনে আল্লাহ নির্ধারিত সীমালংঘিত পর্যুদস্তই শুধু নয়-নিঃশেষে ধ্বংস করার ব্যবস্থা করা হয়, আল্লাহর বিধান কেবল কার্যতই নয়-সর্বতোভাবেই বাতিল করে দেয়া হয়, আল্লাহর পৃথিবীতে আল্লাহর পরিবর্তে আল্লাহদ্রোহীদের ‘রাজত্ব’ ও প্রভাব স্থাপিত হয়, কাফিরী ব্যবস্থার আধিপত্যে কেবল জনসমাজেই নৈতিক ও কালচারাল বিপর্যয় উদ্ভূত হয় না-বরং মুসলিম জাতি অত্যন্ত দ্রুততার সাথে নৈতিক ও বাস্তব (কর্মগত) ভুলভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে-সেখানে এসব প্রত্যক্ষ করার পরও যাদের মনে একটু ব্যথা, দুঃখ বা চিন্তা জেগে ওঠে না, এ অবস্থায় পরিবর্তন সাধনের জন্য উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তাবোধই যাদের মধ্যে জাগ্রত হয় না, বরং যারা নিজেদের মনকে এবং মুসলিম জনসাধারণকে ইসলাম বিরোধী জীবনব্যবস্থার প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠাকে নীতিগত ও কার্যতঃ সহ্য করার জন্য সান্ত্বনা দেয়; এ শ্রেণীর লোকদেরকে ‘মুহসিন’ বলে কিরূপে মনে করা যেতে পারে! আরো আশ্চর্যের বিষয়, এ মারাত্মক অপরাধ ও গুনাহ করা সত্ত্বেও কেবল চাশত, ইশরাক ও তাহাজ্জুদ প্রভৃতি নফল সলাত আদায় করার দরুন, জিকির-আজকার, মোরাকাবা-মুশাহিদা, কুরআন পড়ানো, খুঁটিনাটি সুন্নাত পালনের দ্বারা মানুষ ইহসানের উচ্চতর পর্যায়ে পৌছতে পারে বলে মনে করা হয়!

“মস্তক দিয়েছি, কিন্তু ইয়াজীদের হাতে হাত মিলাতে প্রস্তুত হইনি।” বলে নিজেকে সত্যিকারভাবে একমাত্র আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করতে পারিনি। দুনিয়ার বৈষয়িক রাষ্ট্র এবং জাতিসমূহের মধ্যেও নিষ্ঠাবান, অনুগত এবং অবাধ্য কর্মচারীদের মধ্যে বাস্তবক্ষেত্রে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। দেশে বিদ্রোহ ঘোষিত হলে কিংবা দেশের কোনো অংশের উপর শত্রুপক্ষের আধিপত্য স্থাপিত হলে তখন যারা বিদ্রোহ ও শত্রুদের এ অন্যায় পদক্ষেপকে সংগত বলে মনে করে, অথবা এতে সন্তোষ প্রকাশ করে এবং তাদের সাথে বিজিতের ন্যায় আচরণ করতে শুরু করে, কিংবা তাদের প্রভুত্বাধীন এমন এক সমাজব্যবস্থা গঠন করে যার কর্তৃত্বের সকল চাবিকাঠি শত্রুদের নিকট থাকবে, আর কিছু ছোটখাটো ব্যাপারের আবিষ্কার ও ক্ষমতা তারা নিজেরা লাভ করবে-কোনো রাষ্ট্র কিংবা জাতিই এ শ্রেণীর লোকদেরকে অনুগত, বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য নাগরিকরূপে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয় না। জাতীয় পোশাক ও বাহ্যিক চালচলন কঠোরভাবে অনুসরণ করে চললেও এবং খুঁটিনাটি ব্যাপারে জাতীয় আইন দৃঢ়তার সাথে পালন করে চললেও এর কোনো মূল্যই দেয়া হয় না।

বিগত মহাযুদ্ধের প্রথম অধ্যায়ে জার্মানী বহু দেশ দখল করেছিল এবং সেই বিজিত দেশসমূহের অধিবাসীদের মধ্যে অনেক লোকই তাদের সাথে সহযোগিতা করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এ দেশগুলো যখন জার্মান প্রভুত্ব হতে মুক্তিলাভ করলো তখন জার্মান প্রভুত্বের সাথে সহযোগিতাকারীদের প্রতি নির্মম ব্যবহার করা হয়েছিল। এসব রাষ্ট্র ও জাতির নিকট নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য যাচাই করার একটি মাত্র মাপকাঠি রয়েছে। শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ-শত্রুপক্ষের প্রভুত্ব বিলুপ্তির জন্য কে কতখানি কাজ করেছে এবং যার প্রভুত্ব সে স্বীকার করে বলে দাবী করে, তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কে কতখানি চেষ্টা ও সাধনা করেছে-নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য যাচাই করার এটাই হচ্ছে একমাত্র মানদণ্ড।

দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলোরই যখন এরূপ অবস্থা-সকল প্রকার আনুগত্যকে এ তীব্র শাপিত মানদণ্ডে যাচাই করে নেয়াই যখন এদের রীতি দুনিয়ার কমবুদ্ধির মানুষের ন্যায় নিজের নিষ্ঠাবান আনুগত্য ও অবাধ্যতাকে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহর নিকট কি কোনো মানদণ্ড নেই? আল্লাহ তা’আলা কি শুধু শত্রুর দৈর্ঘ্য, লুঙ্গী-পায়জামার উর্ধ্বস্থতা, তসবীহ পাঠ এবং দরুদ, অজীফা, নফল এবং মোরাকাবা প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজকর্ম দেখে প্রতারিত হবেন, আর নিজেরা খাঁটি ও নিষ্ঠাবান বান্দাহ বলে মনে করবেন? আল্লাহ সম্পর্কে এতো হীন ধারণা করা কি কোনোরূপেই সমীচীন হতে পারে?

## তাকওয়ার উপকারিতা



### তাকওয়ার ইহকালীন উপকারিতা

**উপকারিতা ১ :** তাকওয়ার ফলে পার্থিব জগতে আল্লাহ মানুষের কাজগুলো সহজ করে দেন, তারা তাদের জরুরী প্রয়োজন সহজে সম্পাদন করতে সক্ষম হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

“যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য তার কাজকে সহজ করে দেন।” (সূরা তালাক : ৪) তিনি আরো বলেন: “সুতরাং যে দান করেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে, আর উত্তমকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে, আমি তার জন্য সহজ পথে চলা সুগম করে দেব।” (সূরা লাইল : ৫-৭)

**উপকারিতা ২ :** তাকওয়া পার্থিব জগতে মানুষকে শয়তানের সব অনিষ্ট থেকে সুরক্ষা করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

“নিশ্চয় যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে যখন তাদেরকে শয়তানের পক্ষ থেকে কোন কুমন্ত্রণা স্পর্শ করে তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে। তখনই তাদের দৃষ্টি খুলে যায়।” (সূরা আরাফ : ২০১)

**উপকারিতা ৩ :** তাকওয়ার ফলে আসমান ও যমিনের বরকত দুনিয়াবাসীর জন্য উন্মুক্ত হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

“আর যদি জনপদসমূহের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে আমি অবশ্যই আসমান ও যমিন থেকে বরকতসমূহ তাদের উপর খুলে দিতাম।” (সূরা আরাফ : ৯৬)

**উপকারিতা ৪ :** মানুষ তাকওয়া অর্জনের ফলে হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য করতে সক্ষম হয় ও তা বুঝার তাওফিক লাভ করে। আল্লাহ বলেন :

“হে মু’মিনগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তাহলে তিনি তোমাদের জন্য ফুরকান প্রদান করবেন।” (সূরা ফুরকান : ২৯) ফুরকান অর্থ হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যা পার্থক্য করার জ্ঞান। তিনি আরো বলেন: “হে মু’মিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন, তিনি স্বীয় রহমতে তোমাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন, আর তোমাদেরকে নূর দেবেন যার সাহায্যে তোমরা চলতে পারবে।” (সূরা হাদীদ : ২৮)

**উপকারিতা ৫ :** তাকওয়া অর্জনকারী মুত্তাকী ব্যক্তি তার তাকওয়ার ফলে কষ্টের জীবন থেকে মুক্তি পায় এবং এমন জায়গা থেকে রিয়ক লাভ করে, যা তার কল্পনার উর্ধ্বে। আল্লাহ তা’আলা বলেন :

“যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরি করে দেন। এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিয়ক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না।” (সূরা তালাক : ২-৩)

**উপকারিতা ৬ :** তাকওয়ার দ্বারা পার্থিব জগতে মানুষ আল্লাহর বন্ধুত্ব অর্জন করে। কুরআনে বহু জায়গায় আল্লাহ মুত্তাকীদের বন্ধু ঘোষণা করেছেন।

“তার অভিভাবক (বন্ধু) তো শুধু মুত্তাকীগণ।” (সূরা আনফাল : ৩৪) তিনি আরো বলেন : “আর নিশ্চয় যালিমরা মূলত একে অপরের বন্ধু এবং আল্লাহ মুত্তাকীদের বন্ধু।” (সূরা জাসিয়া : ১৯)

**উপকারিতা ৭ :** পার্থিব জগতে মুত্তাকী তাকওয়ার ফলে কাফিরদের অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা লাভ করে। আল্লাহ তা’আলা বলেন :

“আর যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহলে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোন ক্ষতি করবে না।” (সূরা আলে ইমরান : ১২০)

**উপকারিতা ৮ :** তাকওয়ায় ফলে মুসিবত ও দুশমনের মোকাবিলার মুহূর্তে আসমান থেকে সাহায্য অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

“আর অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে বদর যুদ্ধে সাহায্য করেছেন অথচ তোমরা ছিলে হীনবল। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায়, তোমরা শোকরগুজার হবে। স্মরণ কর, যখন তুমি মু‘মিনদেরকে বলছিলে, ‘তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের রব তোমাদেরকে তিন হাজার নাযিলকৃত ফিরিশতা দ্বারা সাহায্য করবেন’? হ্যাঁ, যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, আর তারা হঠাৎ তোমাদের মুখোমুখি এসে যায়, তবে তোমাদের রব পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফিরিশতা দ্বারা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।” (সূরা আলে ইমরান : ১২৩-১২৫)

সাহায্য ও শক্তিবৃদ্ধির ঘোষণা একটি সুসংবাদ, যার ফলে অন্তর প্রশান্ত হয় এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যের ঘোষণার কারণে নিজেদের মনোবল বাড়ে ও শক্তি সঞ্চয় হয়। এরপর আল্লাহ বলেন :

“আর আল্লাহ তোমাদের জন্য তা কেবল সুসংবাদস্বরূপ নির্ধারণ করেছেন এবং যাতে তোমাদের অন্তরসমূহ এর দ্বারা প্রশান্ত হয়। আর সাহায্য কেবল পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে।” (সূরা আলে ইমরান : ১২৬)

**উপকারিতা ৯ :** তাকওয়ায় ফলে আল্লাহর বান্দাগণ মুসিবত ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিরাপত্তা লাভ করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

“সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর। মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না।” (সূরা মায়দা : ২) মারইয়াম আলাইহিস সালামের ঘটনায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন : “তখন আমি তার নিকট আমার রূহ (জিবরীল)-কে প্রেরণ করলাম। অতঃপর সে তার সামনে পূর্ণ মানবের রূপ ধারণ করল। মারইয়াম বলল, ‘আমি তোমার থেকে পরম করুণাময়ের আশ্রয় চাচ্ছি, যদি তুমি মুত্তাকী হও।’” (সূরা মারইয়াম : ১৭-১৮)

**উপকারিতা ১০ :** তাকওয়া অর্জনকারী প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :



“এটাই হল আল্লাহর বিধান; যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান করে, নিঃসন্দেহে তা অন্তরের তাকওয়া থেকেই।” (সূরা হাজ্জ : ৩২)

**উপকারিতা ১১ :** তাকওয়ার ফলে আমল বিশুদ্ধ হয় ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে এবং পাপ মোচন হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজগুলোকে শুদ্ধ করে দেবেন এবং তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই এক মহা সাফল্য অর্জন করল।” (সূরা আহযাব : ৭০-৭১)

**উপকারিতা ১২ :** মুভাক্কী তাকওয়ার কারণে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে আদব প্রদর্শন করে, অর্থাৎ তার সামনে তার আওয়াজ অনুচ্চ থাকে। জীবিত অবস্থায় তো বটেই, মৃত্যুর পরও তার নির্দেশ অতিক্রম করে না। আল্লাহ বলেন,

“নিশ্চয় যারা আল্লাহর রসুলের নিকট নিজদের আওয়াজ অবনমিত করে, আল্লাহ তাদেরই অন্তরগুলোকে তাকওয়ার জন্য বাছাই করেছেন।” (সূরা হুজুরাত : ৩)

**উপকারিতা ১৩ :** তাকওয়ার দ্বারা আল্লাহর মহব্বত লাভ হয়। এ মহব্বত যেমন দুনিয়াতে লাভ হয়, অনুরূপ আখিরাতেও লাভ হবে। আল্লাহ বলেন :

“আমি বান্দার উপর যা ফরয করেছি, তার চেয়ে উত্তম জিনিসের মাধ্যমে কোন বান্দা আমার নৈকট্য অর্জন করতে পারেনি। বান্দা নফলের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে, এক সময় আমি তাকে মহব্বত করি। আমি যখন তাকে মহব্বত করি, তখন আমি তার কর্ণে পরিণত হই, যে কর্ণ দিয়ে সে শ্রবণ করে, তার দৃষ্ট শক্তিতে পরিণত হই, যা দিয়ে সে দেখে, তার হাতে পরিণত হই যা দিয়ে সে ধরে এবং তার পায়ে পরিণত হই যা দিয়ে সে চলে। সে যদি আমার কাছে প্রার্থনা করে আমি তাকে অবশ্যই দেব এবং সে যদি আমার ওসিলায় আশ্রয় প্রার্থনা করে আমি তাকে অবশ্যই আশ্রয় প্রদান করব।” (সহীহ বুখারী)

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন : ‘হ্যাঁ, অবশ্যই যে নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ মুভাক্কীদেরকে ভালবাসেন।’ (সূরা আলে ইমরান : ৭৬)

**উপকারিতা ১৪ :** তাকওয়ার ফলে ইলম ও জ্ঞান অর্জন হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

“আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আল্লাহ তোমাদেরকে শিক্ষা দেবেন।” (সূরা বাকারা : ২৮২)

**উপকারিতা ১৫ :** আল্লাহর অনুগ্রহে ইসলামের হিদায়াত লাভ করার পর কেউ যদি পূর্ণ তাকওয়া অবলম্বন করে, তাহলে তার দ্বীনের সঠিক বুঝ অর্জন হয় ও সে পথভ্রষ্টতা থেকে সুরক্ষা পায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

“আর এটি তো আমার সোজা পথ। সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ কর এবং অন্যান্য পথ অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। এগুলো তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর।” (সূরা আনআম : ১৫৩)

**উপকারিতা ১৬ :** তাকওয়া দ্বারা আল্লাহর রহমত লাভ হয়। এ রহমত যেকোনো দুনিয়াতে লাভ হবে, অনুরূপ আখিরাতেও লাভ হবে। আল্লাহ বলেন :

“আর আমার রহমত সব বস্তুকে পরিব্যাপ্ত করেছে। সুতরাং আমি তা লিখে দেব তাদের জন্য যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যাকাত প্রদান করে। আর যারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে।” (সূরা আরাফ : ১৫৬)

**উপকারিতা ১৭ :** তাকওয়ার ফলে পার্থিব জগতে আল্লাহর সংঘ ও সাথীত্ব অর্জন হয়। বান্দার সাথে আল্লাহর সাথীত্ব দু'প্রকার। সাধারণ সাথীত্ব : এটা আল্লাহর সব বান্দার জন্য ব্যাপক, যেমন তার শূনা, দেখা ও জানা সবার জন্য সমান। তিনি সবার কাজকর্ম সমানভাবে প্রত্যক্ষ করেন, সব কিছু শুনে ও সবার অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত রয়েছেন। তিনি বলেন :

“আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন।” (সূরা হাদীদ : ৪) তিনি আরো বলেন :

“তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে নিশ্চয় আল্লাহ তা জানেন? তিন জনের কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসেবে আল্লাহ থাকেন না, আর পাঁচ জনেরও হয় না, যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি

থাকেন না। এর চেয়ে কম হোক কিংবা বেশি হোক, তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন, তারা যেখানেই থাকুক না কেন।” (সূরা মুজাদিলা : ৭)

এসব আয়াতে আল্লাহর সাথীত্ব বা সাথে থাকার অর্থ তিনি বান্দার অবস্থা জানেন, তাদের কথা শ্রবণ করেন, তাদের সবকিছু তার নিকট স্পষ্ট।

দ্বিতীয় সাথীত্ব: এটা হচ্ছে আল্লাহর বিশেষ সংঘ বা সাথীত্ব: এ সাথীত্ব আল্লাহর সাহায্য, সমর্থন ও সহায়তার অর্থ প্রদান করে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

“তুমি পেরেশান হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।” (সূরা তওবা : ৪০) অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে : “তিনি বললেন, ‘তোমরা ভয় করো না। আমি তো তোমাদের সাথেই আছি। আমি সবকিছু শুনি ও দেখি।’” (সূরা ত্ব-হা : ৪৬)

এসব আয়াতে আল্লাহ সাথে আছেন বা তার সাথীত্ব অর্থ হচ্ছে সাহায্য ও সমর্থন। আল্লাহর এ জাতীয় সাথীত্ব একমাত্র তাকওয়াবানদের সাথে। যেমন তিনি বলেন :

“নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাথে, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মশীল।” (সূরা নাহল : ১২৮) তিনি আরো বলেন : “এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন।” (সূরা বাকারা : ১৯৪)

**উপকারিতা ১৮ :** শুভ পরিণতি বা শেষ ফল তাকওয়ার অধিকারী আল্লাহর মুত্তাকী বান্দাগণ লাভ করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

“আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।” (সূরা ত্ব-হা : ১৩২) তিনি অন্যত্র বলেন : “আর মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই রয়েছে উত্তম নিবাস।” (সূরা সাদ : ৪৯) তিনি আরো বলেন : “নিশ্চয় শুভ পরিণাম কেবল মুত্তাকীদের জন্য।” (সূরা হুদ : ৪৯)

**উপকারিতা ১৯ :** তাকওয়ার অধিকারী মুত্তাকীগণ পার্থিব জগতে সুসংবাদ লাভ করেন। যেমন সে ভাল স্বপ্ন দেখল অথবা মানুষের ব্যাপক মহব্বত, প্রশংসা ও সম্মান লাভ করল ইত্যাদি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

“যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করত। তাদের জন্যই সুসংবাদ দুনিয়াবি জীবনে এবং আখিরাতে।” (সূরা ইউনুস : ৬৩-৬৪)

**উপকারিতা ২০ :** নারীরা যদি তাকওয়া অবলম্বন করে এবং কথা ও কাজে তার বাস্তবায়ন ঘটায়, তাহলে যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা তাদের ওপর লোভ করার সুযোগ ও সাহস পায় না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

“হে নাবী পত্নীগণ, তোমরা অন্য কোন নারীর মত নও। যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে (পরপুরুষের সাথে) কোমল কণ্ঠে কথা বলো না, তাহলে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে সে প্রলুদ্ধ হয়। আর তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে।” (সূরা আহযাব : ৩২)

**উপকারিতা ২১ :** যাদের অন্তরে তাকওয়া রয়েছে, তারা অসিয়ত ও ভাগ-বন্টনে কারো ওপর যুলুম করে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

“তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে যে, যখন তোমাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হবে, যদি সে কোন সম্পদ রেখে যায়, তবে পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ন্যায়ভিত্তিক অসিয়ত করবে। এটি মুত্তাকীদের দায়িত্ব।” (সূরা বাকারা : ১৮০)

**উপকারিতা ২২ :** পুরুষের মধ্যে তাকওয়া থাকলে তালাক প্রাপ্ত নারী তার জরুরী ভরণ-পোষণ লাভ করে। অর্থাৎ মুত্তাকী পুরুষেরা তাদের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীদের ওপর শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী খরচ করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

“আর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের জন্য থাকবে বিধি অনুযায়ী ভরণ-পোষণ। (এটি) মুত্তাকীদের উপর আবশ্যিক।” (সূরা বাকারা : ২৪১)

**উপকারিতা ২৩ :** তাকওয়ার ফলে দুনিয়া ও আখিরাতের কোন প্রতিদান নষ্ট হয় না। ইউসুফ (আ.) তার ভাই ও পরিবারের সাথে একত্র হয়ে বলেন :

“নিশ্চয় যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সবর করে, তবে অবশ্যই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।” (সূরা ইউসুফ : ৯০)

**উপকারিতা ২৪ :** তাকওয়ার ফলে হিদায়াত লাভ হয়। আল্লাহ বলেন :

“আলিফ-লাম-মীম। এই সেই কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত।” (সূরা বাকারা : ১-২)

## তাকওয়ার পরকালীন উপকারিতা

**উপকারিতা ১ :** তাকওয়ার ফলে আখিরাতে আল্লাহর নিকট সম্মান লাভ হবে। তিনি বলেন :

“তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন।” (সূরা হুজুরাত : ১৩)

**উপকারিতা ২ :** তাকওয়া পরকালীন সফলতা ও সাফল্যের চাবিকাঠি। আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ

“আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করে, তারাই কৃতকার্য।” (সূরা হুজুরাত : ৫২)

**উপকারিতা ৩ :** কিয়ামতের দিন তাকওয়ার ফলে আল্লাহর শাস্তি থেকে নাজাত মিলবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

“আর তোমাদের প্রত্যেককেই তা অতিক্রম করতে হবে, এটি তোমার রবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। তারপর আমি এদেরকে মুক্তি দেব যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে। আর যালিমদেরকে আমি সেখানে রেখে দেব নতজানু অবস্থায়।” (সূরা মারইয়াম : ৭১-৭২) অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেন : “আর তা থেকে দূরে রাখা হবে পরম মুত্তাকীকে।” (সূরা লাইল : ১৭)

**উপকারিতা ৪ :** তাকওয়ার ফলে আমল কবুল হয়। আল্লাহ বলেন :

“অন্যজন (হাবিল) বলল, ‘আল্লাহ কেবল মুত্তাকীদের থেকে গ্রহণ করেন।’” (সূরা মায়িদা : ২৭)

**উপকারিতা ৫ :** তাকওয়ার ফলে আখিরাতে জান্নাতের মিরাস ও উত্তরাধিকার লাভ হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

“সেই জান্নাত, আমি যার উত্তরাধিকারী বানাব আমার বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে যারা মুত্তাকী।” (সূরা মারইয়াম : ৬৩)

**উপকারিতা ৬ :** তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য আখিরাতে জান্নাতে সুদৃঢ় প্রাসাদ থাকবে, যার উপরেও থাকবে প্রাসাদ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

“কিন্তু যারা নিজদের রবকে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে কক্ষসমূহ যার উপর নির্মিত আছে আরো কক্ষ। তার নিচ দিয়ে নদী প্রবাহিত। এটি আল্লাহর ওয়াদা; আল্লাহ ওয়াদা খেলাফ করেন না।” (সূরা যুমার : ২০)

**উপকারিতা ৭ :** মুত্তাকীগণ তাকওয়ার ফলে কিয়ামতের দিন পুনরুত্থানের মুহূর্তে, হাশরের ময়দানে, চলার পথে ও বসার স্থানে কাকিরদের উপরে অবস্থান করবে। তারা জান্নাতের সুউচ্চ স্থানে সমাসীন হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

“যারা কুফরী করেছে, দুনিয়ার জীবনকে তাদের জন্য সুশোভিত করা হয়েছে। আর তারা মু‘মিনদের নিয়ে উপহাস করে। আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তারা কিয়ামত দিবসে তাদের উপরে থাকবে। আর আল্লাহ যাকে চান, বেহিসাব রিয়ক দান করেন।” (সূরা বাকারা : ২১২)

**উপকারিতা ৮ :** তাকওয়ার ফলে আখিরাতে জান্নাত লাভ হবে, কারণ জান্নাত মুত্তাকীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

“আর তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে, যার পরিধি আসমানসমূহ ও জমিনের সমান, যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।” (সূরা আলে ইমরান : ১৩৩) তিনি আরো বলেন : “আর যদি আহলে কিতাবগণ ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তবে অবশ্যই আমি তাদের থেকে পাপগুলো দূর করে দিতাম এবং অবশ্যই তাদেরকে আরামদায়ক জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাতাম।” (সূরা মায়িদা : ৬৫)

**উপকারিতা ৯ :** আখিরাতে তাকওয়া গুনাহের কাফফারা হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

“আর যে আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার গুনাহসমূহ মোচন করে দেন এবং তার প্রতিদানকে মহান করে দেন।” (সূরা তালাক : ৫) তিনি আরো বলেন : “আর যদি আহলে কিতাবগণ ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তবে অবশ্যই আমি তাদের থেকে পাপগুলো দূর করে দিতাম।” (সূরা মায়িদা : ৬৫)

**উপকারিতা ১০ :** তাকওয়ার ফলে আখিরাতে মনের চাহিদা পূরণ হবে ও চোখের শীতলতা লাভ হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

“স্থায়ী জান্নাতসমূহ যাতে তারা প্রবেশ করবে, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে নহরসমূহ। তারা যা পেতে চাবে, তাদের জন্য তার মধ্যে তাই থাকবে। এভাবেই আল্লাহ মুত্তাকীদের প্রতিদান দেন।” (সূরা নাহাল : ৩১)

**উপকারিতা ১১ :** তাকওয়ার ফলে আখিরাতে ভয় ও বিষন্নতা দূর হবে এবং কিয়ামতের দিন মুত্তাকীরা অনিশ্চিত মুক্ত থাকবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

“আর আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে তাদের সাফল্যসহ নাজাত দেবেন। কোন অমঙ্গল তাদেরকে স্পর্শ করবে না। আর তারা চিন্তিতও হবে না।” তিনি আরো বলেন : “শুনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই, আর তারা বিষন্নও হবে না। যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করত।” (সূরা ইউনুস : ৬২-৬৩)

**উপকারিতা ১২ :** তাকওয়ার ফলে কিয়ামতের দিন মুত্তাকীদের অভিযাত্রী দল হিসেবে (বর যাত্রীর ন্যায়) উপস্থিত করা হবে। তারা বাহনে চড়ে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে, এরাই সর্বোত্তম অভিযাত্রী। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

“যেদিন পরম করুণাময়ের নিকট মুত্তাকীদেরকে সম্মানিত মেহমানরূপে সমবেত করব।” (সূরা মারইয়াম : ৮৫)

**উপকারিতা ১৩ :** আখিরাতে মুত্তাকীদের কাছে নিয়ে আসা হবে জান্নাত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

“আর মুত্তাকীদের জন্য জান্নাত নিকটবর্তী করা হবে।” (সূরা শুআরা : ৯০) তিনি আরো বলেন : “আর জান্নাতকে মুত্তাকীদের অদূরে, কাছেই আনা হবে।” (সূরা ক্বাফ : ৩১)

**উপকারিতা ১৪ :** সকল বন্ধুত্ব কিয়ামতের দিন শত্রুতায় পরিণত হবে, শুধু মুত্তাকীদের বন্ধুত্ব ব্যতীত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

“সেদিন বন্ধুরা একে অন্যের শত্রু হবে, মুত্তাকীরা ছাড়া।” (সূরা যুখরুফ : ৬৭)

**উপকারিতা ১৫ :** আখিরাতে মুত্তাকীরা তাকওয়ার কারণে পাপী ও কাফিরদের সাথে তুল্য হবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

“যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে আমি কি তাদেরকে জমিনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের সমতুল্য গণ্য করব? নাকি আমি মুত্তাকীদেরকে পাপাচারীদের সমতুল্য গণ্য করব?” (সূরা সাদ : ২৮)

**উপকারিতা ১৬ :** আখিরাতে মুত্তাকীদের জন্য নিরাপদ স্থান, জান্নাত ও ঋণাধারা থাকবে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

“নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে, বাগ-বাগিচা ও ঋণাধারার মধ্যে, তারা পরিধান করবে পাতলা ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং বসবে মুখোমুখী হয়ে। একরূপই ঘটবে, আর আমি তাদেরকে বিয়ে দেব ডাগর নয়না হ্রদের সাথে। সেখানে তারা প্রশান্তচিত্তে সকল প্রকারের ফলমূল আনতে বলবে। প্রথম মৃত্যুর পর সেখানে তারা আর মৃত্যু আশ্বাদন করবে না। আর তিনি তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করবেন।” (সূরা দুখান : ৫১-৫৬)

**উপকারিতা ১৭ :** আখিরাতে মুত্তাকীদের জন্য আল্লাহর নিকট তাদের তাকওয়া অনুপাতে বিভিন্ন আসন থাকবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

“নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে বাগ-বাগিচা ও ঋণাধারার মধ্যে। যথাযোগ্য আসনে, সর্বশক্তিমান মহাঅধিপতির নিকটে।” (সূরা কামার : ৫৪-৫৫)

**উপকারিতা ১৮ :** মুত্তাকীরা তাকওয়ার ফলে আখিরাতে বিভিন্ন নহরে গমন করতে পারবে। যেমন পরিচ্ছন্ন পানির নহর, সুস্বাদু দুধের নহর যার স্বাদ কখনো নষ্ট হবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

“মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত হল, তাতে রয়েছে নির্মল পানির নহরসমূহ, দুধের ঝরনাধারা, যার স্বাদ পরিবর্তিত হয়নি, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহরসমূহ এবং আছে পরিশোধিত মধুর ঝরনাধারা। তথায় তাদের জন্য থাকবে সব ধরনের ফলমূল আর তাদের রবের পক্ষ থেকে ক্ষমা।” (সূরা মুহাম্মাদ : ১৫)



**উপকারিতা ১৯ :** আখিরাতে তাকওয়ার ফলে মুত্তাকীরা জান্নাতের বৃক্ষসমূহের তলদেশ দিয়ে বিচরণ করবে ও তার ছায়া উপভোগ করবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

“নিশ্চয় মুত্তাকীরা থাকবে ছায়া ও বর্ণাবহুল স্থানে, আর নিজদের বাসনানুযায়ী ফলমূল-এর মধ্যে। (তাদেরকে বলা হবে) ‘তোমরা যে আমল করতে তার প্রতিদানস্বরূপ তৃপ্তির সাথে পানাহার কর।’” (সূরা মুরসালাত : ৪১-৪৩)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : নিশ্চয় জান্নাতে একটি বৃক্ষ রয়েছে, আরোহী যার ছায়া তলে একশত বছর ভ্রমণ করেও শেষ করতে পারবে না। (সহীহ বুখারী)

**উপকারিতা ২০ :** তাকওয়ার ফলে মুত্তাকীরা আখিরাতের মহাভীতির কারণে পেরেশান হবে না। তাদের সাথে ফিরিশতারা সাক্ষাত করবে। আল্লাহ বলেন :

“গুনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই, আর তারা পেরেশানও হবে না। যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করত। তাদের জন্যই সুসংবাদ দুনিয়াবি জীবনে এবং আখিরাতে।” সূরা ইউনুস : ৬২-৬৪)

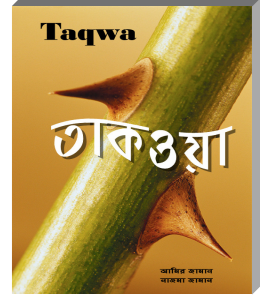
“মহাভীতি তাদেরকে পেরেশান করবে না। আর ফিরিশতারা তাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলবে, ‘এটাই তোমাদের সেই দিন, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল।’” (সূরা আশ্বিয়া : ১০৩)

**উপকারিতা ২১ :** আখিরাতে মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে চমৎকার ঘর। আল্লাহ তা‘আলা বলেন : “আর নিশ্চয় আখিরাতের আবাস উত্তম এবং মুত্তাকীদের আবাস কতই না উত্তম!” (সূরা নাহাল : ৩০)

**উপকারিতা ২২ :** আখিরাতে মুত্তাকীদের তাকওয়ার কারণে তাদের নেকি ও প্রতিদান বহুগুণ বর্ধিত করা হবে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন :

“হে মু‘মিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন, তিনি স্বীয় রহমতে তোমাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন, আর তোমাদেরকে নূর দেবেন যার সাহায্যে তোমরা চলতে পারবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন।” (সূরা হাদীদ : ২৮)

## আদর্শ প্রতিষ্ঠায় তাকওয়া



### তাকওয়া এক কঠিন পথ

أَحْسِبِ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

লোকেরা ভেবেছে নাকি যে, ঈমান এনেছি একথা বললেই তাদেরকে বিনা পরীক্ষায় ছেড়ে দেয়া হবে। (সূরা আনকাবুত : ২)

দুনিয়ার সুদীর্ঘ ইতিহাসে মানুষ যেসব মতবাদ-মতাদর্শ ও জীবন দর্শন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছে অথবা যেসব আদর্শ সম্পর্কে ধারণা অর্জন করেছে এর মধ্যে কোনো একটি মতবাদ-মতাদর্শ ও জীবন দর্শন সর্বপ্রকার যুলুম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে ইসলামী জীবন দর্শনের মতো আপোষহীন যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, এমন ধারণা যারা করে অথবা এসব জীবন দর্শনের কোনো একটিও ইসলামের ন্যায় মানবতার সাহায্য-সহযোগিতা করেছে কিংবা দুনিয়ার স্বৈরাচারী একনায়কদের বিরুদ্ধে অপর কোন জীবন বিধান চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছে - এমন ধারণা যারা করে তারা নিশ্চিতভাবে মারাত্মক ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত।

সুতরাং যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবি করে, কিন্তু সর্বপ্রকারের যুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ সৃষ্টি করে না, ময়লুমের সাহায্য সহযোগিতায় এগিয়ে আসে না, স্বৈরাচারী শক্তির বিরুদ্ধে সত্যের আওয়াজ তুলে না- তারা নিজেদেরকে ঈমানদার ও তাকওয়াবান বলে যতোই মনে করুক না কেনো, তা প্রকৃত ঈমানদার ও তাকওয়াবানের পরিচয় না।

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্মের নাম নয়- এটি একটি বিশাল মতাদর্শ, একটি স্বাধীনতা আন্দোলন, একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, একটি বিপ্লবী মতবাদ-

এক কথায় মানব রচিত মতবাদ-মতাদর্শের বিরুদ্ধে একটি আপোষহীন সংগ্রাম। ইসলাম মানুষের ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সমাজ জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন তথা আন্তর্জাতিক জীবনের প্রত্যেক দিক ও বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই পৃথিবীতে আগমন করেছে।

একজন মানুষ ইসলাম কবুল করবে অথচ পরম পরাক্রমশালী আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো শক্তির সম্মুখে সে মাথা নত করবে, নিজেকে করবে পদদলিত, অবনমিত; আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বাধ্যনুগত হবে, এটা কিছুতেই সম্ভব নয়। ঠিক একইভাবে যার মন-মানসিকতায় ইসলামের আলো জ্বলবে কিন্তু সে যুলুম-অত্যাচার দেখে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবে, সে যুলুম-নির্যাতন দ্বারা নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হোক বা সমগ্র বিশ্ব মানবতা, সে অন্যায় অত্যাচার তার দেশে চলুক বা দুনিয়ার অন্য কোন প্রান্তে চলুক, তা কোন প্রকৃত মুসলিম ব্যক্তির পক্ষে সহ্য করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

সুতরাং দুনিয়ায় হয় ইসলাম চলবে না হয় ইসলামের বিপরীত আদর্শ চলবে। ইসলাম চললে সেখানে থাকবে নিরবচ্ছিন্ন সাধনা, অবিরাম প্রচেষ্টা, সত্য-ন্যায়, স্বাধীনতা ও সাম্যের পথে শাহাদাত লাভের জন্য অদম্য আগ্রহ। আর যদি ইসলামের খোলস পরিয়ে মানুষের বানানো আদর্শ চলতে থাকে তাহলে সেখানে দেখা যাবে ফযীলতের ছড়াছড়ি, অজীফা, দু'আ-তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁকের ব্যাপক ছড়াছড়ি। সাধারণ মানুষ তখন এক ভ্রান্ত ধারণায় নিমজ্জিত হবে যে, একদিক হঠাৎ আকাশ থেকে ন্যায় ও কল্যাণের বৃষ্টি বর্ষিত হবে; স্বাধীনতা ও ন্যায়-নীতির মৃত আত্মা আপনা আপনি জেগে উঠবে।

অথচ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আকাশ থেকে এমন ধরনের বর্ষণ আজ পর্যন্ত হয়নি কখনো, আল্লাহর নীতি অনুযায়ী ভবিষ্যতেও তা কখনো হতে পারে না, কারণ যারা নিজেরা নিজেদের সাহায্য করে না, আল্লাহর উপর আস্থা রাখে না এবং আল্লাহ তা'য়ালার আদেশ অনুযায়ী কাজ করতে প্রস্তুত হয় না, আল্লাহ কখনো তাদের সাহায্য করেন না। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'য়ালার বলেন-

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

আল্লাহ কখনো সে জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে জাতি নিজেই নিজের অবস্থা পরিবর্তনে স্বেচ্ছা না হয়। (সূরা রাদ্ : ১১)

পূর্বেই বলা হয়েছে ইসলাম একটি বিপ্লবী মতবাদ। এ মতবাদ প্রকৃত অর্থেই যদি কারো হৃদয়-মন স্পর্শ করে, তাহলে তার মন-মস্তিষ্কে বা অন্তর্জগতে সার্বিক বিপ্লবের সূচনা হয়। চিন্তাধারা, ধ্যান-ধারণায়, জীবনযাত্রায় ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে, পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তথা জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধিত হয়। এমন এক বিপ্লব সাধিত হয় যে, গতকাল যে মানুষটি ছিলো অন্যের সম্পদ আত্মসাৎকারী, এই বিপ্লব সাধিত হবার পরে সে বর্তমানে অন্যের সম্পদের পাহারাদার হিসেবে ভূমিকা পালন করে। মানুষের কোন পার্থক্য সে করে না, যদি পার্থক্য করেও তাহলে পার্থক্য করবে শুধুমাত্র আল্লাহতীতির ভিত্তিতে। কারণ যে ইসলামী আদর্শ সে গ্রহণ করেছে, সেই আদর্শই তাকে শিখিয়েছে, ঐ ব্যক্তিই সব থেকে বেশী সম্মান-মর্যাদার অধিকারী, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালাকে সর্বাধিক ভয় করে।

ইসলামী বিপ্লব এমনই এক বিপ্লব যে- যার ভিত্তি রচিত হয়েছে মানুষের মর্যাদার উপর আর তা এমন মর্যাদা তাকে দুনিয়ার সব কিছুই বিনিময়েও বিসর্জন দেয়া যায় না। এই বিপ্লবের ভিত্তি ন্যায়-নীতির উপর স্থাপিত, আর তা এমন ন্যায়-নীতি যা কারো স্বৈরাচারী নীতিকে সহ্য করতে পারে না- পারে না কারো উপর কোনো নির্যাতন সহ্য করতে। এ বিপ্লবী সিস্টেম মানুষের মন-মানসিকতায় ও চিন্তার জগতে প্রবেশ করার সাথে সাথেই তাকে কার্যত প্রয়োগ করার জন্য সে কর্মচঞ্চল হয়ে উঠে। মহান আল্লাহর অবতীর্ণ করা এ মতবাদ অনুযায়ী একটি নতুন বিশ্ব প্রতিষ্ঠার আগে সে কিছুতেই শান্ত হতে পারে না এবং নিজের তৎপরতা থেকে নীরব-নিস্তব্ধ ও বিরত হবে না। ইসলাম একটা বিপ্লবী মতবাদ একথার তাৎপর্য এখানেই। অতএব যারা প্রকৃত অর্থে আল্লাহর উপর সত্যিকারের ঈমান রাখে একমাত্র তারাই আল্লাহর পথে প্রচেষ্টার হক আদায় করতে পারে। তারাই আল্লাহর কালিমাকে প্রতিষ্ঠার করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করতে পারে।

চারদিকে যুলুম-নির্যাতনের জয়-জয়কার দেখেও হাত-পা সঞ্চালনের শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী হয়েও যারা হাত-পা গুটিয়ে রেখেছে- যুলুমের বিরুদ্ধে 'টু' শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করে না, প্রকৃতপক্ষে তাদের মুখে দাড়ি, গায়ে লম্বা জামা আর মাথায় পাগড়ী দেখা গেলেও এদের মন-মানসিকতা ইসলামের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে। এদের অন্তরে ইসলামের মূল ভিত্তিসহ প্রবেশ করতে পারেনি। কারণ এদের অন্তরে যদি ইসলাম প্রবেশ করতো তাহলে

ইসলামের বিদ্যুৎ স্পর্শে এরা এক একজন বিপ্লবী মুজাহিদে পরিণত হত। হক ও বাতিলের সংগ্রামে শাহাদাতের অদম্য আগ্রহে ঝাঁপিয়ে পড়তো।

সন্ধীর্ণ জাতীয়তাবাদ তথা জাতি পূজার মোহ যদি আমাদেরকে যালিম এবং সাম্রাজ্যবাদের সাথে লড়তে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, সমাজতন্ত্রের ফানুস যদি আমাদের জায়গীরদারী এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির সাথে লড়তে বাধ্য করতে পারে, ব্যক্তি স্বাধীনতার চেতনা যদি আমাদেরকে যালিম-নিষ্ঠুর শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করতে পারে, তাহলে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কুরআনের বাস্তবায়নের জন্য কেনো আমরা আন্দোলন-সংগ্রাম করবো না!

এ কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ, একনায়কত্ব ও সন্ধীর্ণ জাতীয়তাবাদ এ সবকিছুই ইসলামের দৃষ্টিতে বিষ ফোড়ার মতো। এসব বিষ ফোড়া সমাজ, দেশ ও জাতির দেহ থেকে উৎখাত করার আপোষহীন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ইসলাম আমাদের প্রতি জানিয়েছে উদাত্ত আহ্বান। ‘শুধু মুসলিম হলাম; এ শক্তিই আমাকে সমাজের সকল প্রকার যুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর করে তুলবে। কিন্তু যদি আমি এসবের বিরুদ্ধে লড়াই না করি, তবে আমার অন্তরকে যাচাই করে দেখা উচিত যে - ঈমান সম্পর্কে কোন প্রতারণায় পড়িনি তো! তা না হলে সামাজিক যুলুমের বিরুদ্ধে লড়তে ভয় কিসের?’

মানবরচিত জীবন ব্যবস্থার অনুসারীরা অগ্রসর হয় আপন শক্তির উপর নির্ভর করে; কিন্তু ইসলাম প্রতিষ্ঠার মু’মিনগণ অগ্রসর হয় মহাশক্তিধর আল্লাহ তা’য়ালার উপর ভরসা করে। তাই আল্লাহ্‌পাক কুরআনুল কারীমে বলেছেন :

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তা’য়ালার মু’মিনের কাছ থেকে তাদের হৃদয়-মন এবং তাদের ধন-সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে মারে এবং মরে। তাদের প্রতি জান্নাত দানের যথার্থ ওয়াদা করা হয়েছে।”

(সূরা তওবা : ১১১)

## আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা

তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকতেই হবে যারা কল্যাণের দিকে ডাকবে; ভাল ও সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং পাপ ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে। যারা এ কাজ করবে তারাই সার্থকতা লাভ করবে। তোমরা যেন সেসব লোকদের মত না হও যারা বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং স্পষ্ট ও প্রকাশ্য নির্দেশ পাওয়ার পরও মতবিরোধে লিপ্ত রয়েছে। যারা এরূপ আচরণ অবলম্বন করেছে তারা সেদিন কঠোর শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য হবে। যেদিন কিছু লোকের চেহারা উজ্জ্বল হবে এবং কিছু লোকের চেহারা কালো হয়ে যাবে। যাদের মুখ কালো হবে তাদেরকে বলা হবে যে, ঈমানের নিয়ামত পাওয়ার পরও কি কুফরীর পথ অবলম্বন করেছিলে? (সূরা আলে-ইমরান : ১০৪-১০৯)

এই পৃথিবীতে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত করতে হলে দু'টো উপায় অবলম্বন করা একান্তই জরুরী। প্রথমতঃ যা কল্যাণকর এবং সত্য তা প্রচার করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ যা অকল্যাণকর এবং পাপ তা নির্মূল করতে হবে। এ দু'টো কাজের জন্যেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন 'উম্মতে মুসলিমা'কে শ্রেষ্ঠ উম্মত হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালার বলেন :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأنتُمْ مُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

“তোমরা দুনিয়ার সর্বোত্তম দল, যাদেরকে মানুষের হিদায়াত ও সংস্কার বিধানের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে, তোমরা সৎকাজের আদেশ কর, অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোকদের বিরত রাখ।” (সূরা আলে-ইমরান : ১১০)

সুতরাং আল্লাহর যমীনে সে ধরনের একটি দল অবশ্যই থাকতে হবে, এবং সে দলের কাছে অবশ্যই নির্ভরযোগ্য জ্ঞান ও কৌশলাদি জানা থাকতে হবে। এ ধরনের দলের বর্তমান থাকার একান্ত আবশ্যিকতা সম্পর্কে কুরআনের আয়াতের মধ্যেই তাগাদা রয়েছে। এদের একমাত্র উদ্দেশ্য ও কর্তব্য হবে পৃথিবীতে মানুষের জীবনের উপর আল্লাহর শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত করা। এটা নিঃসন্দেহে সত্য যে, আল্লাহর শরীয়তের বশ্যতা স্বীকার করার পরে মানুষের অবধারিত কর্তব্য হয়ে পড়ে যে, হকের প্রতি আহবানকারী দল অন্যান্য মানুষকে হকের প্রতি দাওয়াত দেবে, যেনো দুনিয়ার মানুষ হকের মূল সত্যকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত সত্য

হিসেবে দেখতে পায়। সাথে সাথে এটাও যেন মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে, আল্লাহর আনুগত্য স্বীকারের মধ্যেই কঠোর সত্যকে নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার কঠিনতম সংগ্রামী শক্তি নিহিত রয়েছে।

সুতরাং আল্লাহর দেয়া এ জীবনাদর্শ দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করার উপায় হিসেবে ইসলামের প্রচার, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও উপদেশ প্রদানের চেয়েও বাস্তব প্রয়োগ ভিত্তিক দৃষ্টান্ত পেশের চেষ্টা-সাধনার প্রয়োজন অনেক বেশী। অতএব একথা সহজবোধ্য যে, আল্লাহর বাণী সরল হলেও তা প্রয়োগ মোটেই সহজ নয়। এ সত্যটা তখনই বুঝতে পারা যায় যখন আল্লাহর বাণীকে আমরা বাস্তব জীবনে পরীক্ষা করি এবং মানুষের ইচ্ছা, বাসনা, কামনা, রুচি, লোভ, জিদ ও সংস্কার ইত্যাদির সাথে যখনই আল্লাহর বাণীর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। তাই উম্মতে মুহাম্মাদী কখনো সফলতা অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী আদর্শ বাস্তবভাবে যমীনে প্রতিষ্ঠিত না হবে।

সত্যকে- সত্য হিসেবে এবং বাতিলকে- বাতিল হিসেবে যদি সঠিক স্বীকৃতি না পায় তাহলে শুধু উম্মতে মুহাম্মাদীই নয় বরং সমগ্র মানবতা বিপর্যস্ত হবে। সুতরাং সমাজ জীবনে সত্যকে- সত্য বলে এবং বাতিলকে- বাতিল বলে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য একটি সংঘবদ্ধ দলকে বন্ধুর, কন্টকাকীর্ণ, দুর্গম পথ পরিক্রমার দৃঢ় শপথ গ্রহণ করে এগিয়ে আসতে হবে।

## আদর্শ প্রতিষ্ঠায় ঈমানের পরীক্ষা

যে আত্মা খিলাফতে ইলাহীর আমানত বহন এবং এর ভারোত্তলন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়, ইসলাম মানুষের মধ্যে এমন আত্মাই সৃষ্টি করে থাকে। অপরিহার্য রূপে এ আত্মা এত কঠোর ও লৌহ কঠিন দৃঢ় মজবুত ও নিরঙ্কুশ এবং দৃঢ়ভাবে হবে যেন এপথে নিজের সমুদয় বস্তু জলাঞ্জলি দিতে পারে, প্রত্যেকটি পরীক্ষাকে স্বাগত জানাতে সক্ষম হয় এবং পার্থিব ধন-সম্পদের মধ্যে কোন বস্তুর দিকে দৃষ্টি না রাখার পরিবর্তে শুধু আখিরাতকেই লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করে নেয় ও আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রার্থী থাকে। এ আত্মা এমন নজীরবিহীন আত্মা হবে যেন এ পার্থিব জগতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা অবধি দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ, লাঞ্ছনা, ভাগ্য বিড়ম্বনা মন-প্রাণ উজাড় করে দেয়া এমনকি প্রাণ বিসর্জন দেয়ার ন্যায় ত্যাগ তিতিক্ষার মধ্যে অতিবাহিত করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

এসব প্রতিকূলতা ও জটিলতার মোকাবিলার জন্য যে শক্তি ও সামর্থ্যের প্রয়োজন তা অর্জনের উপায় হচ্ছে ‘সবর’ বা অসীম ধৈর্য অবলম্বন। এ ‘সবর’ বা ধৈর্য মু’মিনকে প্রচুর শক্তি দান করে। এর মধ্যে সেই পরিচয় পাওয়া যায় ঈমানের দাবীতে কে কতটা সত্যবাদী। ধৈর্য এমন একটি কষ্টি পাথর যার মাধ্যমে মু’মিনের সঠিক পরীক্ষা হয়ে যায় এবং প্রমাণ হয়ে যায় সত্য ও মিথ্যার, দুর্বল ঈমানদার ও কপট ব্যক্তিরও এভাবে ছাঁটাই হয়ে যায়, এরপর ময়দানে যারা টিকে থাকে তারা সেসব তাকওয়াবান মুজাহিদ, প্রকৃতপক্ষে যারা দশগুণ শক্তিশ্রম শত্রুর মোকাবিলায় বিজয় লাভে সক্ষম। দেশে দেশে, যুগে যুগে শির উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন যেসব তাকওয়াবান মুজাহিদরা। সহ্য করেছেন যালিম শক্তির অত্যাচার ও লাঞ্ছনা-নিগ্রহ। তাঁদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে জেলখানার অমানুষিক জীবন। ফাঁসীর মঞ্চ স্থাপন করা হয়েছে তাঁদের চোখের সামনে, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে ইসলামী আদর্শের সেসব বীর সৈনিককে ‘সুখে-শান্তিতে আবার জীবনে বেঁচে থাকতে পার, যদি ত্যাগ কর আদর্শের এসব পাগলামীকে। প্রতি ক্ষেত্রে প্রতি কঠ থেকে নির্ভীক উত্তর এসেছে ‘ইসলামের জন্য জীবন, ইসলামের জন্য মরণ, ইসলামের জন্য আমাদের বন্দুর পথ পরিক্রমা, ইসলামী আদর্শ পরিত্যাগ করে জীবনধারণ! এতো অলীক কল্পনা! আমরা চাই মানুষকে ফিরিয়ে দাও সেই ইসলামী রাষ্ট্র, ফিরিয়ে দাও মদীনার সেই ইসলামকে।’ জীবন তাঁরা বিলিয়ে দিয়েছেন। সমুন্নত রেখেছেন ইসলাম আদর্শের পতাকা।

## অগ্নি পরীক্ষায় নির্ভেজাল প্রমাণিত হওয়া

মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ ﷺ যখন এই আওয়ায উচ্চারণ করেছিলেন, তখনো ঠিক এই একই অবস্থা ও পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। ঘোষক জেনে বুঝেই ঘোষণা দিচ্ছিলেন। শ্রোতারও বুঝতে পারছিল কি কথার ঘোষণা দেয়া হচ্ছে? তাই এ ঘোষণার যে দিকটি যাকে আঘাত করেছে, সেই উদ্যত হয়ে উঠছে একে নিভিয়ে দেবার জন্যে। পোপ ও ঠাকুররা দেখলো এ আওয়ায তাদের পৌরহিত্যের জন্য বিপজ্জনক। জমিদার মহাজনরা তাদের অর্থ সম্পদের, অবৈধ উপার্জনকারীরা অবৈধ উপার্জনের, গোষ্ঠী পূজারীরা গোষ্ঠীগত শ্রেষ্ঠত্বের, জাতি পূজারীরা পূর্বপুরুষদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পথ ও মতের। মোটকথা এ আওয়ায শুনে সব ধরনের মূর্তি পূজারীরা নিজ নিজ মূর্তি বিচূর্ণ হবার ভয়ে আতংকিত হয়ে উঠল। তাই এতোদিন পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধোন্মত্ত থাকা



সত্ত্বেও, এখন সকল কুফরী শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেলো। ‘আল কুফর মিল্লাতুন ওয়াহিদা’ এই নীতি কথাটি তারা বাস্তবে রূপ দিলো। এক নতুন আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে তারা সমবেত হয়ে গেলো এক প্লাটফর্মের। গঠন করলো ঐক্যজোট।

এই কঠিন অবস্থাতে মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাথী কেবল তারাই হলো, যাদের ধ্যান ধারণা ও মনমগজ ছিলো পরিক্ষার পরিশুদ্ধ। যাদের মধ্যে যোগ্যতা ছিলো সত্যকে বুঝার এবং গ্রহণ করার। যাদের মধ্যে সত্যপ্রিয়তা ছিলো এতোটা প্রবল যে, সত্য উপলব্ধির পর সে জন্যে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেবার এবং মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্যে ছিলো তারা সদা প্রস্তুত। এই মহান আন্দোলনের জন্যে এই ধরনের লোকদেরই ছিলো প্রয়োজন। এ ধরনের লোকেরা দু’একজন করে আন্দোলনে আসতে থাকে। সাথে সাথে বৃদ্ধি পেতে থাকে সংঘাত।

অতঃপর কারো রজি রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যায়। কাউকে ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়। কেউ আপনজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কারো ছুটে যায় বন্ধু, কারো হিতাকাংখী। কারো উপরে আসে মারধর। কাউকেও করা হয় জিজ্ঞাসাবাদ। কাউকে পাথর চাপা দিয়ে শুইয়ে রাখা হয় তপ্ত বালুকার উপর। কাউকেও জর্জরিত করা হয় গালি দিয়ে, কাউকেও বা পাথর দিয়ে। উৎপাটিত করা হয় কারো চোখ। বিচূর্ণ করা হয় কারো শির। নারী, সম্পদ, ক্ষমতা, নেতৃত্ব এবং সকল প্রকার লোভনীয় জিনিস দিয়ে খরিদ করার চেষ্টাও করা হয় কাউকে। এই সকল অগ্নিপরীক্ষা ইসলাম প্রতিষ্ঠার সময় এসেছিল। আসা জরুরী ছিলো। এগুলো ছাড়া ইসলামিক মুভমেন্ট না মজবুত হতে পারতো, আর না পারতো ক্রমবিকাশ ও প্রসার লাভ করতে।

এসব অগ্নিপরীক্ষা ইসলামিক মুভমেন্টের জন্যে ছিলো খুবই সহায়ক। এসব অগ্নিপরীক্ষার প্রথম সুবিধা এই ছিলো যে, এর ফলে ভীরা কাপুরুষ, হীন চরিত্র ও দুর্বল সংকল্পের লোকেরা এ মুভমেন্টের কাছেই ঘেঁষতে পারেনি। তাই সমাজের মণিমুক্তগুলোই কেবল এসে শরীক হলো মুভমেন্টে। আর এ মহান মুভমেন্টের জন্যে প্রয়োজন ছিলো এদেরই। তাই যিনিই এ মুভমেন্টে শরীক হলেন, কঠিন অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়েই তাকে শরীক হতে হয়েছে। বস্তুত এক মহান বিপ্লবী মুভমেন্টের উপযোগী শ্রেষ্ঠ লোকদের বাছাইর জন্যে এর চাইতে উত্তম আর কোনো পন্থা হতে পারে না।

এই অগ্নি পরীক্ষার দ্বিতীয় সুবিধা হলো, এরকম কঠিন অবস্থার মধ্যে যারা মুভমেন্টে শরীক হয়েছে, তাঁরা কোনো প্রকার ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতীয় স্বার্থে হয়, বরঞ্চ কেবলমাত্র সত্যপ্রিয়তা এবং আল্লাহ ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্যেই এই ভয়াবহ বিপদ মুসীবত ও দুঃখ লাঞ্ছনার মোকাবেলা করেছেন। এরই জন্যে তাঁদের সহিতে হয়েছে শত অত্যাচার নির্যাতন। এরই জন্যে হতে হয়েছে আহত-প্রহত। এরই জন্যে তাদের পড়তে হয়েছে কায়েমী স্বার্থবাদীদের হিংস্র কোপানলে। কিন্তু এর ফল হয়েছে শুভ। এর ফলে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকে ইসলামিক মুভমেন্টের উপযোগী মন মানসিকতা। সৃষ্টি হতে থাকে খাঁটি ইসলামী চরিত্র। আল্লাহর ইবাদতে সৃষ্টি ও বৃদ্ধি হতে থাকে পরম আন্তরিকতা আর নিষ্ঠা।

আসলে বিপদে মুসীবতের এই মহা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ইসলামী চরিত্র ও ভাবধারা সৃষ্টি হওয়া ছিলো এক স্বাভাবিক ব্যাপার। কোনো ব্যক্তি যখন একটি লক্ষ্য অর্জনের জন্যে প্রবল উদ্যমে যাত্রা শুরু করে, আর তার সেই লক্ষ্য পথে যদি তাকে সম্মুখীন হতে হয় প্রাণান্তকর সংগ্রাম, চরম দ্বন্দ্ব সংঘাত, অবর্ণনীয় বিপদ মুসীবত, দুঃখ কষ্ট, সীমাহীন হয়রানী, যাতনাকর আঘাত, অমানবিক কারা নির্যাতন, বিরামহীন ক্ষুধা আর দুঃসহনীয় নির্বাসনের, তবে এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে তার সেই মহান লক্ষ্য ও আদর্শের সমস্ত বৈশিষ্ট্য প্রবলভাবে রেখাপাত করে তার হৃদয়-মনে। তার মন মগজ, শিরা উপশিরায় প্রবাহিত হতে থাকে তার সেই মহান লক্ষ্যেরই ফল্লুধারা। তার গোটা ব্যক্তি সত্তাই তখন তার জীবনোদ্দেশ্যের রূপ পরিগ্রহ করে।

লক্ষ্য অর্জনের পরিপূর্ণতা সাধনের এ সময়টিতে তাদের উপর ফরয করা হয় সলাত। এর ফলে, দূর হয়ে যায় তাদের দৃষ্টির সকল সংকীর্ণতা। গোটা দৃষ্টি ও চিন্তাশক্তি এসে নিবদ্ধ হয় আপন লক্ষ্যের উপর। যাকে তারা একচ্ছত্র সার্বভৌম শাসক বলে স্বীকার করে নিয়েছে, বার বার স্বীকৃতির মাধ্যমে তাদের ধ্যান ধারণা ও মন-মস্তিষ্কে বদ্ধমূল হয়ে যায় তাঁর প্রভুত্ব আর সার্বভৌমত্ব। যাঁর হুকুম ও নির্দেশনার ভিত্তিতে এগিয়ে দিতে হবে জীবন ও জগতের সকল কাজ, তিনি যে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সবকিছুই অবহিত। তিনি যে বিচার দিনের সম্রাট। তিনি যে সকল বান্দাহর উপর দুর্দণ্ড প্রতাপশালী-এই কথাগুলো বদ্ধমূল হয়ে যায় তাদের মন ও মস্তিষ্কে। কোনো অবস্থাতেই তাঁর আনুগত্য ছাড়া অপর কারো আনুগত্যের বিন্দুমাত্র চিন্তাও তাদের অন্তরে প্রবেশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায় সম্পূর্ণরূপে।

এই অগ্নি পরীক্ষা ও চরম সংঘাতের তৃতীয় সুফল এই ছিলো যে, এর ফলে একদিকে এই বিপুবী কাফেলায় যারা শরীক হচ্ছিল, বাস্তব ময়দানে তাদের হতে থাকে যথার্থ প্রশিক্ষণ। অপরদিকে দিনের পর দিন প্রসারিত সম্প্রসারিত হতে থাকে ইসলামিক মুভমেন্ট। মানুষ যখন দেখতে থাকলো, কিছু লোক দিনের পর দিন মার খাচ্ছে। নির্যাতিত হচ্ছে। তখন স্বাভাবিকভাবেই এর আসল কারণ জানার প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হতে থাকে তাদের মনে। এই লোকগুলোকে নিয়ে কেন এতো হৈ হউগোল?—এই প্রশ্নের জবাব পেতে উৎসুক হয়ে উঠে তাদের মন। অতঃপর তাদের অনুসন্ধানী দৃষ্টি যখন জানতে পারতো, আল্লাহর এই বান্দাগুলো কোনো নারী, সম্পদ, প্রতিপত্তি বা কোনো প্রকার ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়, বরং এক মহাসত্য তাদের কাছে উন্মুক্ত হয়েছে এবং তারা তা একনিষ্ঠভাবে আঁকড়ে ধরে আছে বিধায় এভাবে তাদের অত্যাচার করা হচ্ছে, তখন স্বঃতই সেই মহাসত্যকে জানার জন্যে তাদের মন হয়ে উঠতো ব্যাকুল।

অতঃপর যখন লোকেরা জানতে পারতো, সেই মহাসত্য হচ্ছে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’, আর এ জিনিসই মানব জীবনে এমন ধরনের বিপুব সৃষ্টি করে, এরই দাওয়াত নিয়ে এমনসব লোকেরা উদ্ভিত হয়েছে, যারা কেবল এই সত্যেরই জন্যে দুনিয়ার সমস্ত স্বার্থকে ভুলুণ্ঠিত করেছে। নিজেদের ধন-সম্পদ, সন্তান, সম্ভ্রতিসহ প্রতিটি জিনিস অকাতরে কুরবানী করেছে, তখন তারা বিস্ময়ে অবিভূত হয়ে যেতো। খুলে যেতো তাদের চোখ। ফেটে যেতো তাদের মন মগজকে আচ্ছন্ন করে রাখা পর্দা। আর এই মহাসত্য তাদের হৃদয়ের মধ্যে বিদ্ধ হতো তীরের তীব্র ফলকের মতো। এর ফলে সব মানুষ এসে शामिल হয়েছে এই মুভমেন্টে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত কেবল সেই গুটি কয়েক লোকই এ মুভমেন্টে শরীক হতে পারেনি, যাদেরকে অভিজাত্যের অহংকার, পূর্ব পুরুষদের অন্ধ অনুকরণ আর পার্থিব স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এছাড়া সে সমাজের প্রতিটি নিঃস্বার্থ ও সত্যপ্রিয় লোককেই, কেউ আগে কেউ পরে, শেষ পর্যন্ত এ মুভমেন্টে এসে শরীক হতে হয়েছে।

## দ্বীন প্রতিষ্ঠার মুভমেন্টে শরীক না হবার পরিণাম

সাধারণত এ দেশের দ্বীনদার ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ দ্বীন প্রতিষ্ঠার কার্যক্রমকে তাকওয়া-পরহেজগারীর বা দ্বীনদারীর বহির্ভূত কাজ মনে করে থাকেন। অথচ যেখানে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা নেই, যেখানে আল্লাহর আইনের ভিত্তিতে শাসন চলে না, সমাজের কাজকর্ম চলে না, বিচার ফয়সালা

হয় না সেখানে তাকওয়ার ন্যূনতম দাবিও পূরণ করা সম্ভব হয় না। শত চেষ্টা করেও, মনের ষোলআনা আন্তরিকতা সত্ত্বেও দ্বীনদারী রক্ষা করা যায় না এবং তাকওয়ার দাবি পূরণ করা সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় কোনো এক পর্যায়ে দ্বীন বিরোধী পরিবেশের সাথে এ দ্বীনদার লোকেরা মনের অজান্তেই পুরোপুরি আপোষ করে ফেলতে বাধ্য হন। যার ফলশ্রুতিতে ঈমান শূন্যের কোঠায় পৌঁছে যাবার উপক্রম হয়।

আল্লাহর রসূলের ঘোষণার আলোকে এ প্রতিকূল ও দ্বীন বিরোধী পরিবেশের মোকাবেলায় যারা ক্ষমতা প্রয়োগের যোগ্যতার অধিকারী তারা প্রথম সারির ঈমানদার। আর যারা মৌখিক প্রতিবাদে সক্ষম তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর ঈমানদার। আর যারা মনে মনে ঘৃণা করে তারা হলো দুর্বলতম ঈমানদার।

রসূল ﷺ -এর উল্লেখিত ঘোষণায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে আল্লাহর নাফরমানীর পর্যায়ে পড়ে এমন কাজের প্রতি যার মনে ঘৃণাটুকুও নেই তার মধ্যে ঈমান আছে এটা বিশ্বাস করার কোনো কারণই থাকতে পারে না। আরো বাস্তব কথা হলো প্রতিষ্ঠিত অনৈইসলামী সমাজ পরিবর্তনের চিন্তা-চেতনা যাদের মনে নেই, এ কাজে বাস্তব পদক্ষেপ নিতে যারা অপারগ তাদের মনের ঘৃণাটুকুও কোনো এক পর্যায়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। অতএব দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক না হওয়ার ব্যক্তিগত পরিণাম ঈমানের দাবি পূরণে ব্যর্থতা। আর এ অবস্থায় এক পর্যায়ে ঈমানের ন্যূনতম পুঁজিটুকুও হারাবার আশঙ্কা রয়েছে।

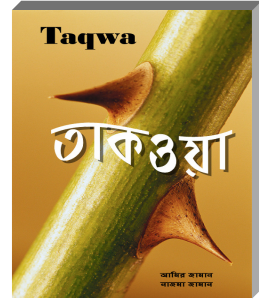
এছাড়া প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক না হবার আরো একটি ভয়াবহ পরিণাম রয়েছে। তাহলো দুনিয়াতেই আল্লাহর গযবের আশঙ্কা। কোনো সমাজে আল্লাহর নাফরমানী যদি ব্যাপকতা লাভ করে আর সেখানে সংস্কার, সংশোধন ও পরিবর্তনের কোনো প্রচেষ্টা না থাকে, তাহলে আল্লাহর চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী আল্লাহর গজব আসে। অতীতের নাবী-রসূলগণের দাওয়াত অস্বীকারকারী অনেক জাতিকেই তো আল্লাহ তা'আলা সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাই অবাধে আল্লাহর নাফরমানীর সয়লাব বয়ে যাবে এটাও আল্লাহ সহ্য করবেন না। এ নাফরমানী ব্যাপক হলে মহামারী, দুর্ভিক্ষ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পারস্পরিক মারামারি, খুন-খারাবি তথা গৃহযুদ্ধের আকারে আল্লাহর সেই গজব উম্মাতের উপরে আসবে। এমন সমাজে ব্যক্তিগতভাবে ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল লোক থাকলেও সে গজব থেকে রেহাই নেই।

এ পর্যায়ে আল্লাহর শেষ নাবী অতীত যুগের ইতিহাস থেকে একটি ঘটনা বলে তার উম্মাতকে সতর্ক করেছেন। সেই ঘটনা হলো- কোনো একটি জনপদের লোকদের নাফরমানীমূলক আচরণের কারণে আল্লাহ তা'আলা উক্ত জনপদ ধ্বংস করার জন্য নির্দিষ্ট ফিরিশতাকে নির্দেশ দিলেন। ফিরিশতাদের পক্ষ থেকে বলা হলো, হে আল্লাহ! উক্ত জনপদে তো একজন বুজুর্গ লোক আছে। তবুও কি ঐ এলাকা ধ্বংস করতে হবে? আল্লাহ তা'আলা বললেন, একথা জেনেই তো আমি নির্দেশ দিয়েছি। ঐ বুজুর্গ লোকটি থাকা সত্ত্বেও ঐ জনপদকে ধ্বংস করতে হবে এবং ঐ লোকটি সহই ধ্বংস করতে হবে। যার ব্যক্তিগত ইবাদত-বন্দেগী জনপদের লোকদের নাফরমানীমূলক কাজের ব্যাপারে তার মনে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। ব্যক্তিগতভাবে বন্দেগীতে মশগুল থাকা সত্ত্বেও নাফরমানীতে ভরপুর ঐ সমাজ পরিবর্তনের কোনো চিন্তা-ভাবনাই সে করেনি।

### সত্য প্রতিষ্ঠায় ডা. জাকির নায়েক ও নওমুসলিমগণ

এখন সারা পৃথিবী-ই ডা. জাকির নায়েককে চেনে। তিনি এই যুগের একজন মুজাহিদ। তিনি একা নন তার সাথে রয়েছেন আরো একদল মুজাহিদ যারা নওমুসলিম (Converted)। তার পিস টিভি সারা পৃথিবীর ঘরে ঘরে সঠিক ইসলামের ম্যাসেজ পৌঁছে দিচ্ছে। আল্লাহ এই আধুনিক টেকনোলজির যুগে ১২০ কোটি হিন্দুর মাঝে পাঠিয়েছেন একজন দা-ঈকে যিনি নির্দিধায় দ্বীনের দাওয়াতী কাজ করে যাচ্ছেন এবং তার প্রচারে প্রতিদিন হাজার হাজার অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করছেন। যারা ইসলাম গ্রহণ করছেন তাদের মধ্যে বেশীরভাগই বুঝে ইসলাম গ্রহণ করছেন। তারা আল-কুরআন পড়েছেন এবং বুঝেছেন, তারা রসূল ﷺ-এর জীবনী ও সাহাবাদের জীবনী পড়েছেন এবং সেই অনুযায়ী নিজেদের জীবনকে সাজিয়েছেন। তারা সরাসরি আল-কুরআনে যা বলা হয়েছে এবং নাবী মুহাম্মাদ ﷺ ও সাহাবাদের মতো করে নিজেদের জীবনকে পরিচালনা করছেন। তাদের কাছে ইসলামের প্রকৃত বুঝ হচ্ছে আল-কুরআন ও সুন্নাহ। নাবী ﷺ এবং সাহাবা (রা.)-গণ জীবনে যা করেছেন তাই তারা তাদের জীবনে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন। বর্তমানে যারা ওয়েস্টে দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ করে যাচ্ছেন তাদের প্রথম সারিতে রয়েছেন এই নওমুসলিমগণ। আর এই দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ করতে গিয়ে তারা পদে পদে নানারকম বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছেন। কেউ কেউ নিজ দেশ থেকেও বিতারিত হচ্ছেন।

## প্রকৃত সুন্নাহর অনুসরণ বনাম তাকওয়ার পরীক্ষা



আমরা অনেকেই রসূল ﷺ -এর সুন্নাহর অনুসারী হিসেবে নিজেকে দাবী করি। অনেকেই নিজেকে সালাফী বলে দাবী করি, নিজেকে আহলে হাদীস বলে দাবী করি, আশেকে রসূল বলে দাবী করি বা প্রকৃত সুন্নাহর অনুসারী বলে দাবী করি। এখন আমাদের রসূল ﷺ -এর সুন্নাহর বিষয়টি তাকওয়ার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করে দেখা প্রয়োজন। আমি যে সুন্নাহর অনুসারী তা কষ্ট পাথরে যাচাই করে দেখা উচিত যে সেটা কতটা খাঁটি।

### সুন্নাহ কী?

সুন্নাহ হলো সেই মূল আদর্শ যা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে রসূলে কারীম ﷺ নিজে তাঁর বাস্তব জীবনে দ্বীনি দায়িত্ব পালনের বিশাল ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছেন; অনুসরণ করার জন্যে দৃষ্টান্ত (গাইডলাইন) হিসেবে রেখে গেছেন দুনিয়ার মানুষের সামনে। কেননা নাবী কারীম ﷺ যা বাস্তব জীবনে অনুসরণ করেছেন, তার উৎস হলো ওহী- যা আল্লাহর নিকট থেকে তিনি লাভ করেছেন।

আল্লাহর জানিয়ে দেয়া বিধান ও নির্দেশ রসূলে কারীম ﷺ -এর বাস্তব কর্মজীবন। সেখানে আল্লাহর সকল আদেশ নিষেধেরই প্রতিফলন ঘটেছে পুরোপুরিভাবে। আল্লাহ তাঁর রসূলের মাধ্যমে ঈমানদারদের এই ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদানের জন্য জোর দিয়ে বলেছেন :

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“হে নাবী! মানুষকে বলুন, যদি সত্যি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর; তবেই আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।”

(সূরা আলে ইমরান : ৩১)

সুতরাং একমাত্র আল্লাহর রসূল ﷺ -এর নির্দেশাবলীর সঠিক অনুসরণই হচ্ছে মূল তাকওয়া। এই অনুমোদিত বিধি প্রসঙ্গে রসূল ﷺ বলেছেন :

“আমার সুন্নাহ এবং সঠিকভাবে পথ নির্দেশকারী খলিফাদের অনুসরণ কর। এটা মাড়ির দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধর। এবং নতুন প্রবর্তন সম্মুখে সাবধান হও কারণ সেগুলি সব প্রচলিত ধর্মমত-বিরুদ্ধ বিশ্বাস এবং বিরুদ্ধ বিশ্বাস হল ভুল পথ যা জাহান্নামের আগুনের দিকে চালিত করে”। (আবু দাউদ, আত-তিরমিযী)

তাহলে সুন্নাহ কী? এক কথায় রসূল ﷺ -এর কাজ এবং কথাই হচ্ছে সুন্নাহ। আমরা অনেকেই নিজেকে রসূল ﷺ -এর খাঁটি অনুসারী বলে দাবী করি এবং নিজেকে তাঁর সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালনা করছি বলে মনে করি। আমরা রসূল ﷺ -এর ভালোবাসায় এতোই পাগল যে নিজদেরকে কেউ কেউ ‘আশেকের রসূল’ বলে দাবী করি। কিন্তু আমরা বাস্তবে ভুলে যাই যে রসূল ﷺ -এর কাজের আংশিক অনুসরণ প্রকৃত সুন্নাহ নয়। নিম্নে রসূল ﷺ -এর সুন্নাহর কিছু বর্ণনা দেয়া হলো :

## সহজ সুন্নাহ

আমরা অনেকে রসূল ﷺ -এর কাজকর্মের মধ্যে যে কাজগুলো ‘সহজ’ (easy) শুধু সেগুলিকেই বেছে নিয়েছি নিজের জীবনে সুন্নাহ হিসেবে, যেমন : আতর লাগানো, সুরমা লাগানো, পাগড়ী পড়া, লম্বা জুব্বা পড়া, টাখনুর উপর পায়জামা পড়া, টুপি পড়া, দাড়িতে মেহেদি লাগানো, মিষ্টি খাওয়া, মাটিতে বসে আহার করা, মিসওয়াক করা, ঢিলা-কুলুব ব্যবহার করা, সলাতে রফেইয়াদাঈন করা, জোরে আমীন বলা, বুকো হাত বাঁধা ইত্যাদি ইত্যাদি।

## কঠিন সুন্নাহ

আমরা রসূল ﷺ -কে এতো ভালোবাসি যে, যে সুন্নাহগুলো কঠিন সেগুলোর থেকে দূরে থাকি। যেমন : রসূল ﷺ দীর্ঘ ২৩ বছর দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন, তায়েফের রাস্তায় কাফিরদের পাথরের আঘাতে রক্ত ঝরিয়েছেন, ওহ্দের ময়দানে দাঁত হারিয়েছেন, খন্দকের যুদ্ধে এক নাগাড়ে না খেয়ে মদীনার তিন দিকে পরিখা খনন করেছেন। নবুয়াত প্রাপ্তির পর মক্কার প্রথম ১৩ বছর কাফিরদের অমানবিক নির্যাতন সহ্য করেছেন, কাফিরদের বয়কট অবস্থায় পাহাড়ের ঢালে নতুন মুসলিমদের নিয়ে ৩ বছর কাটিয়েছেন এবং জীবন বাঁচানোর জন্য গাছের পাতা এবং ছাল খেয়েছেন। একসময় কাফিররা রসূল ﷺ -কে হত্যার সিদ্ধান্ত নিলে আল্লাহর নির্দেশে তিনি জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় হিবরত করেছেন। রসূল ﷺ সাহাবাসহ নবুয়তের ২৩ বছরে ৮-৬টি যুদ্ধ করেছেন। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। সমাজ থেকে যতো রকম অন্যায় কাজ যেমন : সুদ, ঘুষ, যিনা, মদ, জুয়া, দুর্নীতি, চুরি-ডাকাতি, জুলুম, মিথ্যাচার, অবিচার, রাহাজানী, হত্যা, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা ইত্যাদি দূর করেছেন। রাষ্ট্রীয় সংসদ পরিচালনার জন্য constitution তৈরী করেছেন। ইসলামিক ইকোনমিক্স, ফাইন্যান্স ও ইসলামিক 'ল বাস্তবায়ন করেছেন। Human rights, women rights, religious rights, non-muslims rights ইত্যাদি আইন প্রণয়ন করে তা রাষ্ট্রে বাস্তবায়ন করেছেন। যেখানে অন্যায় দেখেছেন সেখানেই বাধা দিয়েছেন। অন্যায়ের সাথে কখনো আপোস করেননি। এছাড়া সমাজে পাঁচ ওয়াক্ত জামাতে সলাত, যাকাত, সিয়াম, মহিলাদের পর্দা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে হিংসা, বিদ্বেষ, গীবত, চোগলখুরী, রিয়া, লোভ-লালসা ইত্যাদি দূর করেছিলেন। বাবা-মার হক, সন্তানের হক, স্বামী-স্ত্রীর হক, আত্মীয়ের হক, প্রতিবেশীর হক, এতিমের হক, যুদ্ধ বন্দীদের হক, সরকারের হক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যদি রসূল ﷺ -এর বিস্তারিত জীবনী পড়ি তাহলে দেখতে পাই যে সারাটা জীবন তিনি কত কষ্টে কাটিয়েছেন, কত ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এরকম অনেক কাজই তিনি করেছেন যার বর্ণনা কুরআন ও সহীহ হাদীস গ্রন্থগুলোতে পাওয়া যায়। তিনি এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার সময় কোন ব্যক্তিগত সম্পদ রেখে যাননি। সারা জীবন সম্পদ অর্জনের জন্য ব্যাকুল হননি। রসূল ﷺ নবুয়াত জীবনে কোন দিন তিন বেলা পেট ভরে খাননি। এসকলই রসূল ﷺ -এর



সুন্নাহ। তিনি দরিদ্র ছিলেন তাই দরিদ্র থাকাও সুন্নাহ আবার অনাহারে থাকাও সুন্নাহ। এগুলোকে অবশ্যই কোনভাবেই এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।

আল কুরআন হচ্ছে Complete code of life অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এই যে উপরের সুন্নাহগুলো রসূল ﷺ-এর জীবনে দেখা যায় আসলে এগুলো সবই কুরআনের কথা, কুরআনের নির্দেশগুলোই অক্ষরে অক্ষরে পালন করার জন্য তিনি সারা জীবন এই কঠিন কাজগুলো করেছেন। আমরা যেন মনে না করি যে এগুলো শুধু রসূল ﷺ-এর কাজ বা রসূল ﷺ-এর মিশন। তিনি ছিলেন গোটা মানবজাতির জন্য Role Model. তাঁর দেখিয়ে যাওয়া সমস্ত কাজগুলো প্রতিটি মু'মিনের দায়িত্ব এবং সেটাই তাঁর প্রকৃত সুন্নাহ। আসুন এবার নিজেকে নিজে প্রশ্ন করি 'আশেকে রসূল' বা 'সালাফী' বলে নিজেকে নিজে যে দাবী করছি তা কতটুকু যুক্তি সংগত? একটা উদাহরণ দেয়া যাক। ধরুন, আমি একটা কোম্পানীতে চাকুরী নিয়েছি, আমার ম্যানেজার আমাকে আমার job descriptions বুঝিয়ে দিয়েছেন। এবার আমি প্রতিদিন বেছে বেছে অতি সহজ কাজগুলো পালন করি আর কঠিন কাজগুলো না করে এড়িয়ে যাই। এবার বাস্তব আমায় চাকুরী কতদিন টিকবে? যদিও চাকুরী টিকে থাকে তাহলে আমিই বলি আমার ম্যানেজার এবং কোম্পানীর মালিকের কাছে আমি কত দিন প্রিয়পাত্র হিসেবে পরিগণিত হবো বা তারা আমাকে কী চোখে দেখবেন?

**বিশেষ অনুরোধ :** উপরে সহজ এবং কঠিন সুন্নাহর যে উদাহরণগুলো দেয়া হয়েছে তা বুঝানোর সুবিধার্থে আলাদা করে দেখানো হয়েছে। এখানে ভুল বুঝার কোন অবকাশ নেই। কোন অবস্থাতেই রসূল ﷺ-এর কোন সুন্নাহকে হেয় বা ছোট করা হয়নি এবং তা কখনো করাও যাবে না। আমরা যারা শুধু সহজ সুন্নাহগুলো পালন করি তাদেরকেও কোনভাবেই ছোট করা হয়নি। কোন সুন্নাহকে ছোট করে দেখা তো দূরের কথা একজন মু'মিন হিসেবে আমাদের সকলকে অবশ্যই রসূল ﷺ-এর সকল প্রকার সুন্নাহর প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং তা মানতে হবে। কোন সুন্নাহকে ছোট করে দেখার কোন প্রশ্নই উঠে না।

তাহলে বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে রসূল ﷺ-এর সুন্নাহ অনুসরণের মধ্যে দিয়েও রয়েছে তাকওয়ার এক কঠিন পরীক্ষা। শুধু বেছে বেছে মুসলিমদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত দেয়া নয় অমুসলিমদের নিকটও দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে যাওয়াও সুন্নাহ। আমাদের দেশে একদল লোক শুধু মুসলিমদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত

নিয়ে যান তারা কোন অমুসলিমের নিকট যাননা। রসূল ﷺ এবং তার সাহাবা (রা.)-গণ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানসহ গোটা দেশের অমুসলিমদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন।

## বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের প্রতি বিশ্বনাबी ﷺ -এর আহবান

হৃদয়বিয়ার সন্ধির ফলে মুসলিমদের জন্য শান্তি এবং স্বস্তির একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। মুহাম্মাদ ﷺ -কে মহান আল্লাহ শুধুমাত্র আরব ভূ-খন্ডের জন্য প্রেরণ করেননি। তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছিল সারা বিশ্বের জন্য। তাঁর দায়িত্ব ছিল সমস্ত মানুষের কাছে মহাসত্যের আহবান পৌঁছে দেয়া। সন্ধির বদলে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, তা নাবী কারীম ﷺ কাজে লাগালেন। তিনি সাহাবায়ে কেরামের একটি সমাবেশ আহবান করে বললেন, ‘মহান আল্লাহ আমাকে সারা জগতের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং তোমরা আমার পক্ষ থেকে মানুষের কাছে সত্যের আহবান পৌঁছে দাও। এরপর নাবী কারীম ﷺ বিভিন্ন দেশের শাসকদের কাছে ইসলাম গ্রহণের জন্য দূত মারফত বার্তা প্রেরণ করলেন।

## আবিসিনিয়া (ইথিওপিয়া)-র বাদশাহ নাজ্জাশীর নামে

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

‘আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর প্রতি। সালাম সেই ব্যক্তির উপর যিনি হিদায়াতের অনুসরণ করেন। আমি আপনার কাছে মহান আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি ব্যতীত কোন মা’বুদ নেই। যিনি কুদ্দুস, যিনি সালাম, যিনি নিরাপত্তা ও শান্তি দেন, যিনি হিফাযতকারী ও তত্ত্বাবধানকারী। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, ঈসা ইবনে মারইয়াম আল্লাহর রুহ এবং তাঁর কালিমা। আল্লাহ তা’আলা তা পূত-পবিত্র সতী মারইয়ামের উপর স্থাপন করেছেন। আল্লাহর রুহ এবং ফুঁ এর কারণে মারইয়াম (আ.) গর্ভবতী হয়েছেন, যেমন আল্লাহ তা’আলা আদম আলাইহিস সালামকে নিজের হাতে তৈরী করেছিলেন। আমি এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ এবং তাঁর আনুগত্যের প্রতি পরস্পরকে সাহায্যের দাওয়াত দিচ্ছি। এছাড়া একথার প্রতিও দাওয়াত দিচ্ছি, আপনি আমার আনুগত্য করুন এবং আমি যা কিছু নিয়ে এসেছি তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করুন। কেননা আমি আল্লাহর রসূল, আমি আপনাকে এবং

আপনার সেনাদলকে সর্বক্ষণ আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। আমি দাওয়াত ও নসীহত করছি। কাজেই আমার দাওয়াত ও নসীহত কবুল করুন। (পরিশেষে) সালাম সে ব্যক্তির উপর, যিনি হিদায়তের আনুগত্য করেন।

**চিঠির উত্তর :** পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদের নামে, নাজ্জাশী আসহামার পক্ষ থেকে।

হে আল্লাহর নাবী, আপনার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম, তাঁর রহমত ও বরকত নাযিল হোক। সেই আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি ব্যতীত ইবাদাতের উপযুক্ত আর কেউ নেই। অতঃপর, হে আল্লাহর রসূল, আপনার চিঠি আমার হাতে পৌঁছেছে। এ চিঠিতে আপনি ঈসা (আ.) সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, আসমান ও যমীনের মালিক আল্লাহর শপথ, আপনি যা কিছু উল্লেখ করেছেন ঈসা (আ.)-এর চেয়ে বেশী কিছু ছিলেন না। তিনি সেরূপই ছিলেন আপনি যেরূপ উল্লেখ করেছেন। আপনি আমার কাছে যা কিছু লিখে পাঠিয়েছেন, আমি তা জেনেছি এবং আপনার চাচাতো ভাইয়ের হাতে বায়াত করেছি এবং তার হাতে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্যে ইসলাম কবুল করেছি।

রসূল ﷺ নাজ্জাশীর কাছে একথা দাবী করেছেন, তিনি যেন জাফর এবং আবিসিনিয়ায় অবস্থানরত অন্যান্য মুহাজিরদের পাঠিয়ে দেন। সে অনুযায়ী নাজ্জাশী আমার ইবনে উমাইয়া যামরীর সাথে দুইটি দলে সাহাবীদের পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। এক দলে জাফর, আবু মূসা আশযারী এবং অন্য কয়েকজন সাহাবা ছিলেন। তাঁরা প্রথমে খায়বরে পৌঁছে সেখান থেকে মদীনায হাযির হন। অন্য এক দলে অধিকাংশ ছিলো শিশু-কিশোর, তারা আবিসিনিয়া থেকে সরাসরি মদীনায পৌঁছে। আলোচ্য নাজ্জাশী তাবুক যুদ্ধের পর নবম হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহর রসূল তার মৃত্যুর দিনেই এ সংবাদ সাহাবীদের জানান এবং গায়েবানা জানাযার ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীতে নাজ্জাশীর স্থলাভিষিক্ত বাদশাহর কাছেও রসূল ﷺ একখানি চিঠি পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কিনা জানা যায়নি।

## মিসরের বাদশাহ মোকাউকিসের নামে

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে মোকাওকিস আযম কিবতের নামে। তার প্রতি সালাম যিনি হিদায়াতের আনুগত্য করেন।

[নোট : কিবতিরা হলো খৃষ্টানদের একটা অংশ এবং ওরা আজো ইজিপ্টে বাস করে।] আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। ইসলাম গ্রহণ করলে আল্লাহ আপনাকে দু'টি পুরস্কার দেবেন। আর যদি ইসলাম গ্রহণ না করেন, তবে কিবতের অধিবাসীদের পাপও আপনার উপর বর্তাবে। হে কিবতিরা, 'এমন একটি বিষয়ের প্রতি এসো যা আমাদের এবং তোমাদের জন্যে সমান। আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবো না এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবো না। আমাদের মধ্যে কেউ যেন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে প্রভু হিসেবে না মানে। যদি কেউ এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দাও, সাক্ষী থাকো, আমরা মুসলিম।

এ চিঠি পৌছানোর জন্যে হাতিব ইবনে আবী বালতায়্যা (রা.)-কে মনোনীত করা হয়। তিনি মোকাওকিসের দরবারে পৌছার পর বলেছিলেন, এ দেশে আপনার আগেও একজন শাসনকর্তা ছিলেন, যে নিজেকে রবেব আলা [মহান রব] মনে করতো। আল্লাহ তা'আলা তাকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোকদের জন্যে দৃষ্টান্ত করেছেন। প্রথমে তার দ্বারা অন্য লোকদের উপর প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে, এরপর তাকে প্রতিশোধের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। কাজেই অন্যের ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। এমন যেন না হয়, অন্যরা আপনার ঘটনা থেকে শিক্ষা লাভ করবে। মোকাওকিস জবাবে বললেন, আমাদের একটা দ্বীন রয়েছে, যা আমরা পরিত্যাগ করতে পারি না, যতোক্ষণ পর্যন্ত তার চেয়ে উত্তম কোনো দ্বীন পাওয়া না যায়।

হাতিব (রা.) বললেন, আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। এ দ্বীনকে আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী সকল দ্বীনের পরিবর্তে যথেষ্ট মনে করেছেন। এ চিঠি প্রেরক নাবী মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার পর কুরায়শরা তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে কঠোর প্রমাণিত হয়। ইহুদীরা সবচেয়ে বেশী শত্রুতা করে। আর খৃষ্টানরা ছিলো অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহর শপথ, মূসা (আ.) যেমন ঈসা (আ.) সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছিলেন, তেমনি ঈসা (আ.)ও মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছেন। আমরা আপনাকে কুরআনের দাওয়াত দিচ্ছি, যেমন আপনারা তাওরাতের অনুসারীদের ইঞ্জিলের দাওয়াত দিয়ে থাকেন। যে নাবী যে জাতিকে পেয়ে যান, সে জাতি সে নাবীর উম্মত হয়ে যায়। এরপর সে নাবীর আনুগত্য করা উক্ত জাতির জন্যে অত্যাবশ্যক। আপনারা নবাগত নাবীর যমানা

পেয়েছেন, কাজেই তাঁর আনুগত্য করুন। আপনাকে আমরা ঈসা মসীহের দ্বীন থেকে ফিরে আসতে বলছি না; বরং আমরা মূলত সে দ্বীনের দাওয়াতই দিচ্ছি।

মোকাওকিস বললেন, সে নাবী সম্পর্কে আমি খোঁজ-খবর নিয়ে জেনেছি, তিনি কোনো অপছন্দীয় কাজের আদেশ দেন না এবং পছন্দনীয় কোনো কাজ করতে নিষেধ করেন না। তিনি পথভ্রষ্ট যাদুকার নন, মিথ্যাবাদী জ্যোতিষীও নন; বরং আমি দেখেছি, তাঁর সাথে নবুয়তের এ নিশানা রয়েছে, তিনি গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করেন এবং অপ্রকাশ্য বিষয় সম্পর্কে খবর দেন। আমি তাঁর দাওয়াত সম্পর্কে আরো চিন্তা-ভাবনা করবো। মোকাওকিস আল্লাহর রসূল (রা.)-এর চিঠি নিয়ে হাতীর দাঁতের একটি কোঁটায় রাখেন, এরপর মুখ বন্ধ করে সীল লাগিয়ে তার এক দাসীর হাতে দেন। এরপর আরবী ভাষার এক লিপিকারকে ডেকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিম্নোক্ত চিঠি লেখান-

**চিঠির উত্তর :** পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহর নামে মোকাওকিস আযিম কিবত-এর পক্ষ থেকে।

আপনার প্রতি সালাম। আমি আপনার চিঠি পাঠ করেছি এবং চিঠির বক্তব্য ও দাওয়াত আমি বুঝেছি। জানি, এখনো একজন নাবী আসার বাকি রয়েছেন। আমি ধারণা করেছিলাম, তিনি সিরিয়া থেকে আবির্ভূত হবেন। আমি আপনার দূতের সম্মান করেছি। আপনার খিদমতে দুই জন দাসী পাঠাচ্ছি। কিবতীদের মধ্যে তাদের যথেষ্ট মর্যাদা রয়েছে। আপনার জন্যে কিছু পোশাক এবং বাহন হিসাবে একটি খচ্চরও হাদিয়া (উপহার) পাঠাচ্ছি। আপনার প্রতি সালাম। মোকাওকিস আর কোন কথা লেখেননি। তিনি ইসলামও গ্রহণ করেননি। তার প্রেরিত দাসীদের নাম ছিলো মারিয়া কিবতিয়া এবং সিরীন। রসূল ﷺ মারিয়াকে নিজের কাছে রেখেছিলেন। মারিয়ার গর্ভ থেকেই রসূল ﷺ-এর পুত্র ইবরাহীম জন্মগ্রহণ করেন [যিনি শিশু অবস্থাতেই মারা যান।]। সিরীনকে কবি হাসসান ইবনে সাবেত আনসারীর কাছে সমর্পণ করা হয়।

## **পারস্য (ইরানের) সম্রাট খসরু পারভেয়ের নামে**

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে পারস্য সম্রাট কিসরার নামে।

সালাম সে ব্যক্তির প্রতি, যিনি হিদায়াতের আনুগত্য করেন এবং আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করেন এবং সাক্ষ্য দেন, আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেউ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রসূল। আমি আপনাকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। কারণ আমি সকল মানুষের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত। যারা বেঁচে আছে তাদের পরিণাম সম্পর্কে ভয় দেখানো এবং কাফিরদের উপর সত্য কথা প্রমাণিত করাই আমার কাজ। কাজেই আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন; যদি এতে অস্বীকৃতি জানান, তবে সকল অগ্নি উপাসকের পাপও আপনার উপর বর্তাবে।

এ চিঠি নিয়ে যাওয়ার জন্যে আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা সাহমী (রা.)-কে মনোনীত করা হয়। তিনি চিঠিখানি বাহরাইনের শাসনকর্তার হাতে দেন। বাহরাইনের শাসনকর্তা দূতের মাধ্যমে নাকি আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফার মাধ্যমেই এ চিঠি পাঠিয়েছিলেন, তা জানা যায়নি। মোট কথা চিঠিখানি কিসরা পারভেয়কে পড়ে শোনানোর পর সে তা ছিড়ে ফেলে অংহকারের সাথে বলে, আমার প্রজাদের মধ্যে একজন সাধারণ প্রজা নিজের নাম আমার নামের আগে লিখেছে! রসূলুল্লাহ صلی اللہ علیہ وسلم এ খবর পাওয়ার পর বলেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তার বাদশাহী ছিন্নভিন্ন করে দিন। এরপর তাই ঘটেছিলো, যা রসূল صلی اللہ علیہ وسلم বলেছিলেন।

পারস্য সম্রাট ইয়ামিনের গভর্নর বাযানকে লিখে পাঠায়, তোমার ওখান থেকে তগড়া দু'জন লোককে পাঠাও, তারা যেন হিজাযে গিয়ে সে লোককে আমার কাছে ধরে নিয়ে আসে। বাযান সম্রাটের নির্দেশ পালনের জন্যে দু'জন লোককে তার চিঠিসহ আল্লাহর রসূলের কাছে পাঠায়। সে চিঠিতে প্রেরিত লোকদ্বয়ের সাথে কিসরার কাছে হাযির হওয়ার জন্যে রসূল صلی اللہ علیہ وسلم -কে নির্দেশ দেয়া হয়। তাদের একজন বললো, শাহানশাহ এক চিঠিতে বাযানকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আপনাকে তাঁর দরবারে হাযির করা হয়। বাযান আমাদের আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। কাজেই আপনি আমাদের সঙ্গে পারস্যে চলুন। সাথে সাথে উভয় আগন্তুক হুমকিপূর্ণ কিছু কথাও বলে। রসূল صلی اللہ علیہ وسلم শান্তভাবে তাদের বললেন, তোমরা আগামীকাল দেখা করো।

এদিকে মদীনায যখন এক মনোজ্ঞ ঘটনা চলছে, ঠিক তখন পারস্যে খসরু পারভেয়ের পারিবারিক বিদ্রোহ কলহ তীব্র রূপ ধারণ করে। কায়সারের [Caesar] সৈন্যদের হাতে পারস্যের সৈন্যরা একের পর এক পরাজয় স্বীকার করে যাচ্ছিলো। এমতাবস্থায় পারস্য সম্রাট কিসরার পুত্র শেরওয়ায়হ পিতাকে

হত্যা করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে। সময় ছিলো মঙ্গলবার রাত, সপ্তম হিজরীর ১০ই জমাদিউল আউয়াল। রসূলুল্লাহ ﷺ ওহীর মাধ্যমে এ খবর পেয়ে যান। পরদিন সকালে পারস্য সম্রাটের প্রতিনিধিদ্বয় আল্লাহর রসূলের দরবারে এলে তিনি তাদের এ খবর জানান। তারা বললো, আপনি এসব আবোলতাবোল কী বলছেন? এর চেয়ে মামুলী কথাও আমরা আপনার অপরাধ হিসেবে গণ্য করছি। আমরা কি আপনার এ কথা বাদশাহর কাছে লিখে পাঠাবো? রসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ, লিখে দাও। সাথে সাথে একথাও লিখে দাও, আমার দীন এবং আমার হুকুমত সেখানেও পৌঁছবে, যেখানে তোমাদের বাদশাহ পৌঁছেছে। শুধু তাই নয়; বরং এমন জায়গায় গিয়ে থামবে, যার আগে উট বা ঘোড়া যেতে পারে না। তোমরা তাকে একথাও জানিয়ে দিয়ো, যদি তোমরা মুসলিম হয়ে যাও, তবে যা কিছু তোমাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে সেসব আমি তোমাদের দিয়ে দেবো এবং তোমাদেরই জাতির বাদশাহ করে দেবো।

উভয় দূত এরপর মদীনা থেকে ইয়ামিনের বাযানের কাছে গিয়ে তাকে সব কথা জানায়। কিছুক্ষণ পরই ইয়ামিনে এক চিঠি এসে পৌঁছায়, শেরওয়ানহ তা পিতাকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহন করেছেন। নতুন সম্রাট তার চিঠিতে ইয়ামিনের গভর্নর বাযানকে এ নির্দেশও দিয়েছেন, আমার পিতা যার সম্পর্কে লিখেছেন, পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তাকে বিরক্ত করবে না। এ ঘটনায় বাযান এবং তার পারস্যের বন্ধু-বান্ধব, যারা সে সময় ইয়ামিনে উপস্থিত ছিলো, সকলেই মুসলিম হয়ে যান।

## রোম সম্রাট কায়সার (হিরাক্লিয়াসের) নামে

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি। সালাম সে ব্যক্তির প্রতি, যিনি হিদায়াতের আনুগত্য করেন। আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে শান্তিতে থাকবেন এবং দ্বিগুণ পুরস্কার পাবেন। যদি অস্বীকৃতি জানান, তবে আপনার প্রজাদের পাপও আপনার উপর বর্তাবে। হে আহলে কিতাব, এমন একটি বিষয়ের প্রতি আসো, যা আমাদের ও তোমাদের জন্যে একই সমান। সেটি হচ্ছে, আমরা আল্লাহর ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করবো না, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবো না। আল্লাহ ব্যতীত আমাদের

কেউ পরস্পরকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করবো না, যদি লোকেরা অমান্য করে তবে তাদের বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থাকো, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি।

সেই সময় মক্কার একটি বাণিজ্য কাফেলা দল সেখানে ছিল। সম্রাট হিরাক্লিয়াস মক্কার বাণিজ্য প্রতিনিধি দলকে সামনে রেখে তার দোভাষীকে তলব করেন। এরপর দোভাষীর মাধ্যমে জিজ্ঞেস করেন, যিনি নিজেকে নাবী বলে দাবী করেন তার সাথে বংশগত সম্পর্কের দিক থেকে তোমাদের মধ্যে কে অধিক নিকটবর্তী? আবু সুফিয়ান বলেন, আমি তখন বাদশাহকে জানালাম, আমিই বংশগত দিক থেকে তার অধিক নিকটবর্তী। এরপর হিরাক্লিয়াস তার দোভাষীকে বললেন, এ লোকটিকে আমি সে নাবীর দাবীদার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবো। যদি সে কোন কথার জবাবে মিথ্যা বলে, তবে তার সঙ্গীদের বলে দাও, তারা যেন সাথে সাথে প্রতিবাদ করে। আবু সুফিয়ান বলেন, আল্লাহর শপথ, যদি মিথ্যা বলার দুর্নাম হওয়ার ভয় না থাকতো, তবে আমি তাঁর সম্পর্কে অবশ্যই মিথ্যা বলতাম। আবু সুফিয়ানকে সামনে এনে বসানোর পর হিরাক্লিয়াস তাকে অনেকগুলো প্রশ্ন করেন এবং তিনি তার ঠিক ঠিক উত্তর দেন।

তাদের দুজনের মধ্যে সকল প্রশ্ন-উত্তর পর্ব শেষ হওয়ার পর সম্রাট হিরাক্লিয়াস বলেন : তুমি যা কিছু বলেছো, যদি এসব সত্য হয়ে থাকে, তবে তিনি খুব শীঘ্রই আমার দুই পায়ে নীচের জায়গারও মালিক হয়ে যাবেন। আমি জানতাম, এ নাবী আসবেন, কিন্তু আমার ধারণা ছিলো না, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই আসবেন। আমি যদি নিশ্চিত জানতাম তাঁর কাছে পৌঁছতে পারবো, তবে তাঁর সাথে সাক্ষাতে কষ্ট স্বীকার করতাম এবং কাছে থাকলে তাঁর দুই চরণ ধুয়ে দিতাম।

## বাহরাইনের শাসনকর্তা মোনযের ইবনে সাওয়ার নামে

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে মোনযের ইবনে সাওয়ার নামে। আপনার প্রতি সালাম। আমি আপনার কাছে আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি ব্যতীত ইবাদত পাওয়ার উপযুক্ত কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল।

অতঃপর আমি আপনাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। মনে রাখবেন, যে ব্যক্তি ভালো কাজ করবে সে তা নিজের জন্যেই করবে। যে ব্যক্তি আমার



দূতদের আনুগত্য করবে এবং তাদের আদেশ মান্য করবে, সে ব্যক্তি আমারই আনুগত্য করবে। যারা আমার দূতদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে, তারা আমার সাথেই ভালো ব্যবহার করেছে বলে মনে করা হবে। আমার দূতরা আপনার প্রশংসা করেছেন। আপনার জাতি সম্পর্কে আপনার সুপারিশ আমি গ্রহণ করেছি। কাজেই মুসলিমরা যে অবস্থায় ঈমান এনেছে তাদের সে অবস্থায় ছেড়ে দিন। আমি দোষীদের ক্ষমা করে দিয়েছি, আপনিও তাদের ক্ষমা করুন। আপনি যতোদিন সঠিক পথ অনুসরণ করবেন, ততোদিন আমি আপনাকে পদ থেকে বরখাস্ত করবো না। যারা ইহুদী দ্বীন অথবা অগ্নি উপাসনার উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তাদের জিজিয়া (ট্যাক্স) দিতে হবে।

## ইয়ামামার শাসনকর্তা হাওয়া বিন আলীর নামে

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে হাওয়া ইবনে আলীর প্রতি। সে ব্যক্তির উপর সালাম, যিনি হিদায়াতের অনুসরণ করেন। আপনার জানা থাকা উচিত, আমার দ্বীন উট ও ঘোড়ার শেষ গন্তব্যস্থল পর্যন্ত প্রসার লাভ করবে। কাজেই ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন এবং আপনার অধীনে যা কিছু রয়েছে সে সব আপনার জন্যে অক্ষুণ্ণ রাখা হবে।

এ চিঠি পৌঁছানোর জন্যে সালীত ইবনে আমার আমেরীকে দূত মনোনীত করা হয়। সালীত সীলমোহর লাগানো এ চিঠি নিয়ে ইয়ামামার শাসনকর্তা হাওয়া বিন আলীর দরবারে পৌঁছেন। হাওয়া তাকে নিজের মেহমান হিসেবে গ্রহণ করে মুবারকবাদ জানান। সালীত চিঠিখানি শাসনকর্তাকে পড়ে শোনান। তিনি মাঝামাঝি ধরনের জবাব দেন। এরপর আল্লাহর রসূলের কাছে নিম্নরূপ লিখিত জবাব দেন।

**চিঠির উত্তর :** ‘আপনি যে বিষয়ের দাওয়াত দিচ্ছেন, তার কল্যাণ ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রশ্নাতীত। আরবদের উপর আমার প্রভাব রয়েছে। কাজেই আপনি আমাকে কিছু কাজের দায়িত্ব দিন, আমি আপনার আনুগত্য করবো। শাসনকর্তা হাওয়া আল্লাহর রসূলের দূতকে কিছু গিফট প্রদান করেন। সে গিফটের মাঝে মূল্যবান পোশাকও ছিলো। সালীত সেসব নিয়ে আল্লাহর রসূলের দরবারে আসেন এবং তাঁকে সব কিছু অবহিত করেন। রসূলুল্লাহ ﷺ এ চিঠি পাঠ শেষে মন্তব্য করেন, সে যদি এক টুকরো জমিও আমার কাছে চায়, তবু আমি তাকে দেবো

না। সে নিজেও ধ্বংস হবে এবং যা কিছু তার হাতে রয়েছে, সেসবও ধ্বংস হবে।

রসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয় থেকে ফিরে আসার পর জিবরাঈল (আ.) তাঁকে খবর দেন, হাওয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। রসূল ﷺ অতঃপর সাহাবীদের বললেন, শোনো, ইয়ামামায় একজন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব ঘটবে এবং আমার পরে সে নিহত হবে। একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল, তাকে কে হত্যা করবে? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি এবং তোমার সাথীরা। পরবর্তীকালে আল্লাহর রসূলের কথাই সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

## দাম্বেশকের শাসনকর্তার হারিসের নামে

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে হারিস ইবনে আবু শিমারের নামে। সে ব্যক্তির প্রতি সালাম যিনি হিদায়াতের অনুসরণ করেন, ঈমান আনেন এবং সত্যতা স্বীকার করেন। আপনাকে আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনার দাওয়াত দিচ্ছি, যিনি এক ও অদ্বিতীয় এবং যাঁর কোনো শরীক নেই। আপনাদের জন্যে আপনাদের রাজত্ব স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এই চিঠি আসাদ ইবনে খোয়ায়মা গোত্রের সাথে সম্পর্কিত সাহাবী শুজা ইবনে ওয়াহাবের হাতে প্রেরণ করা হয়। হারিসের হাতে এ চিঠি দেয়ার পর তিনি বলেন, আমার বাদশাহী আমার কাছ থেকে কে ছিনিয়ে নিতে পারে? শীঘ্রই আমি তার বিরুদ্ধে হামলা করতে যাচ্ছি। এ হতভাগ্য ইসলাম গ্রহণ করেনি।

## আম্মানের বাদশাহ জীফার নামে

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে জুলানদির দুই পুত্র জীফা ও আবদের নামে। সালাম সে ব্যক্তির উপর, যিনি হিদায়াতের অনুসরণ করেন। অতঃপর আমি আপনাদের উভয়কে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। কেননা আমি সকল মানুষের প্রতি আল্লাহর রসূল। যারা জীবিত আছে তাদের পরিণামের ভয় দেখানো এবং কাফিরদের জন্যে আল্লাহর কথার সত্যতা প্রমাণের জন্যেই আমি কাজ করছি। ইসলাম গ্রহণ করলে

আপনাদেরকেই শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখা হবে। যদি অস্বীকৃতি জানান তবে আপনাদের বাদশাহী শেষ হয়ে যাবে। আপনাদের ভূখণ্ড ঘোড়ার হামলার শিকার হবে, আপনাদের বাদশাহীর উপর আমার নবুয়ত বিজয়ী হবে।’

এ চিঠি পৌছানোর জন্যে আমার ইবনুল আস (রা.)-কে মনোনীত করা হয়। তিনি বলেন, আমি রওয়ানা হয়ে আন্মানে পৌঁছে জীফা এবং আবদের সাথে সাক্ষাৎ করি। দুই ভাইয়ের মধ্যে আবদ ছিলেন নরম মেয়াজের। তাকে বললাম, আমি আপনার এবং আপনার ভাইয়ের কাছে রসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছ থেকে দূত হিসেবে এসেছি। তিনি বললেন, আমার ভাই বয়স এবং বাদশাহী উভয় দিক থেকেই আমার চেয়ে বড়ো এবং অগ্রগণ্য। কাজেই আমি আপনাকে তার কাছে পৌঁছে দিচ্ছি, তিনি নিজেই আপনার আনীত চিঠি পড়বেন।

বাদশার সাথে বেশ কিছুক্ষন কথা-বার্তা হয় এবং অতপর বাদশাহ বললেন, আপনি, আগামীকাল আমার সাথে দেখা করুন। এরপর আমি বাদশাহর ভাইয়ের কাছে ফিরে এলাম। আবদ বললেন, আমার, আমার ধারণা, বাদশাহীর লোভ প্রবল না হলে আমার ভাই ইসলাম গ্রহণ করবেন।

পরদিন পুনরায় বাদশাহর কাছে যেতে চাইলাম, কিন্তু তিনি ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দেননি। আমি ফিরে এসে তার ভাইকে বললাম, আমি বাদশাহর কাছ পর্যন্ত পৌঁছতে পারিনি। সে আমাকে বাদশাহর কাছে পৌঁছে দেয়। বাদশাহ বললেন, আপনার উপস্থাপিত দাওয়াত সম্পর্কে আমি ভেবে দেখেছি। আমি যদি বাদশাহী এমন একজনের কাছে ন্যস্ত করি, যার সেনাদল এখনো পৌঁছেইনি, তবে আমি আরবে সবচেয়ে দুর্বল এবং ভীর্ণ বলে পরিচিত হবো। যদি তার সৈন্যরা এখানে এসেই পড়ে, তবে আমরা তাদের যুদ্ধের সাধ মিটিয়ে দেবো। আমি বললাম, ঠিক আছে, আমি আগামীকাল ফিরে যাচ্ছি।

আমার যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর বাদশাহ তার ভাইয়ের সাথে নির্জনে মতবিনিময় করেন। বাদশাহ তার ভাইকে বললেন, এ রসূল যাদের উপর বিজয়ী হয়েছে, তাদের তুলনায় আমরা কিছুই না। তিনি যার কাছেই খবর পাঠিয়েছেন তিনিই দাওয়াত কবুল করেছেন। পরদিন সকালে পুনরায় আমাকে বাদশাহর দরবারে ডাকা হয়। বাদশাহ এবং তার ভাই উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপর ঈমান আনেন। সদাকা আদায় এবং বাদী ও বিবাদীর মধ্যে ফয়সালা (মীমাংসা) করতে আমাকে স্বাধীনতা দেয়া হয়।

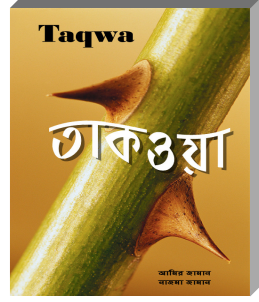
কেউ আমার বিরোধিতা করলে তারা আমাকে যথেষ্ট সাহায্য- সহযোগিতা করেন।

এ ঘটনার বিবরণ ও প্রকৃতি দেখে মনে হয়, অন্যান্য বাদশাহকে চিঠি লেখার পর আল্লাহর রসূল ﷺ এ চিঠি প্রেরণ করেছিলেন। সম্ভবত মক্কা বিজয়ের পর এ চিঠি প্রেরণ করা হয়। এ সকল চিঠির মাধ্যমে রসূলুল্লাহ ﷺ বিশ্বের অধিকাংশ এলাকায় তাঁর দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছিলেন। জবাবে কেউ ঈমান এনেছে, কেউ কুফরীর উপরই অটল থেকেছে। তবে এ সকল চিঠির প্রভাব এটুকু হয়েছে, যারা কুফরী করেছে তাদের মনোযোগও এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে এবং তাদের কাছে আল্লাহর রসূলের নাম এবং তাঁর প্রচারিত দ্বীন একটি পরিচিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

## চীনে তাওহীদের ধ্বনি

আবিসিনিয়ার বাদশাহ নিজের উদ্যোগেই চীনে ইসলাম প্রচারক দল প্রেরণ করেছিলেন, এ কারণেই বোধহয় আল্লাহর নাবী পৃথকভাবে চীনে কোন দল প্রেরণ করেননি। চীনে সাহাবায়ে কেরাম এসে ইসলামের আলো প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন, চীনের কোয়াটাং মসজিদ সেদিনের সাক্ষী হয়ে আজও নিজের গৌরব ঘোষণা করছে। সাহাবায়ে কেরামই সে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। ইসলামের নাম শুনলে যারা সাম্প্রদায়িকতা আর সন্ত্রাসের গন্ধ পায়, তাদের জেনে রাখা উচিত- ইসলাম তরবারী বা শক্তি প্রয়োগ করে অথবা ষড়যন্ত্রের পথ ধরেও আসেনি। কোন জাতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইসলাম তাদের ঘাড়ের ওপরে পুঁজিবাদ আর সমাজবাদের মত চেপে বসেনি। ইতিহাস সাক্ষী, ইসলাম আপন মহিমার গুণেই সর্বস্তরের মানুষের অন্তর জয় করেছিল।

## তাকওয়ার পরীক্ষা



### ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর তাকওয়ার পরীক্ষা

#### তাকওয়ার প্রথম পরীক্ষা

আমরা সকলেই ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর ঘটনা জানি। তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান নমরুদ ও তার সরকার তৌহিদের দাওয়াত দেয়ার কারণে ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে আগুনে নিক্ষেপ করেছিলেন। এখানে লক্ষ্যণীয়,

- ১) ইবরাহীম আলাইহিস সালাম জানতেন যে নমরুদের কাছে আত্মসমর্পণ করলে তাকে আগুনে ফেলা হবে না, কিন্তু তিনি তা করলেন না। তিনি আগুনে পুড়তে প্রস্তুত হলেন, কিন্তু কেন?
- ২) যখন ফিরিশতাগণ সাহায্য করতে চাইলেন তখনও তিনি তাদের সাহায্য চাননি! কিন্তু কেন সাহায্য চাইলেন না? এবং
- ৩) যখন তাকে আগুনে ফেলার সিদ্ধান্ত হলো তখন পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন ঘটনা ঘটেনি যে, কাউকে আগুনে ফেলার পর সে আগুন থেকে বেঁচে এসেছিল। ফলে আগুনে ফেলার সময় তার মনের প্রস্তুতি কিরূপ ছিল?

#### উত্তর :

- ১) তিনি তৌহিদের দাওয়াত দিয়েই দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। তিনি অন্য কোন অপরাধ করে আসামী হননি।

২) ফিরিশতাদের নিকট সাহায্য চাইলেও তার অর্থ হতো আল্লাহর উপর আস্থা না থাকা।

৩) তিনি জানতেন যে, আঙুনে ফেললে কেউ কোন দিনেই তার থেকে রেহাই পায় না এবং এটাও বুঝেছিলেন যে সত্যের প্রচারক হয়ে বাতিলের হাত থেকে রেহাই পাওয়ারও কোন পথ ছিল না। কাজেই যেকোন মূল্যে আল্লাহতে আত্মসমর্পণ করার প্রবল আবেগ তার অবিচল মনে নির্ভর ও আঙুনে পুড়ে যাওয়ার দৃঃসাহস সঞ্চারিত করেছিল।

সত্যের দাবীদার হলে মিথ্যার সঙ্গে টক্কর লাগবেই। মিথ্যার সঙ্গে আপোস না করলে মিথ্যা তার সর্বশক্তি নিয়োগ করবে সত্যকে উৎখাত করতে। আর সত্য যদি সত্য হিসেবে টিকতে চায় তবে মিথ্যা তাকে কিছুতেই সহ্য করবে না। এতে যদি জীবন যায় তবুও মিথ্যার সঙ্গে আপোস করা যাবে না, এমনকি আঙুনে পোড়ালেও নয়। এরই নাম হচ্ছে ইসলামের উপর টিকে থাকা। হ্যাঁ, যদি সত্যের অনুসারীদের সংখ্যা বেশী হয় তবে সংগ্রাম করেও টিকে থাকা যায়। এই সংগ্রামই হলো ইসলামের জিহাদ। এই জন্যেই বলা হয় জিহাদ ছাড়া ইসলাম নেই। তাই অন্যত্র বলা হয়েছে, (ওয়াজাহেদু হাক্বা জিহাদিহি) অর্থাৎ জিহাদের হক আদায় করে জিহাদ কর।

### তাকওয়ার দ্বিতীয় পরীক্ষা

অতঃপর ঐ জনপদ ছেড়ে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বেরিয়ে পড়লেন তাঁর স্ত্রী ও ভাইয়ের ছেলে নাবী লূত আলাইহিস সালাম-কে সঙ্গে নিয়ে। পরে তিনি আল্লাহর নিকট সন্তান চেয়েছেন। আল্লাহ তাকে সন্তান দিয়েছেন। তাঁর প্রথম ছেলে ইসমাইলের যখন জন্ম হয় তখন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর বয়স ছিল ৮৬ বছর, পরে দ্বিতীয় ছেলে ইসহাক আলাইহিস সালাম এর যখন জন্ম হয় তখন তাঁর বয়স ছিল ১০০ বছর। প্রথম সন্তান জন্মের পর সন্তানকে তার মাসহ মরুভূমির মধ্যে রেখে আসতে নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাকে আবার দ্বিতীয় পরীক্ষায় ফেললেন। এবারও তিনি মহান আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালন করে কৃতিত্বের সাথে পাশ করলেন।

### তাকওয়ার তৃতীয় পরীক্ষা

অতঃপর ঐ সন্তান যখন তাঁর সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করে বেড়ানোর বয়সে উপনীত তখন একদিন তিনি বললেন, হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যেন আমি তোমাকে

জবেহ করছি। এখন তুমি চিন্তা-ভাবনা করে দেখো কী করা যায়। তিনি বললেন, হে পিতা, আল্লাহ আপনাকে যা করতে হুকুম করেছেন আপনি তাই করুন। তাহলে আল্লাহ চায়তো আপনি আমাকে অবশ্যই ধৈর্যশীল হিসেবে দেখতে পাবেন। এখানে প্রশ্ন, আল্লাহ যখন ছেলেকে জবেহ করার হুকুম দিলেন তখন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এই হুকুমকে পরিবর্তন করার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলে করতে পারতেন। তিনি বলতে পারতেন—

- ১) হে আল্লাহ! তোমার জন্য আগুনে গিয়েছি, দেশ ছেড়েছি, ঘরবাড়ি ধনসম্পদ আত্মীয়-স্বজন সব ছেড়েছি, শিশু সন্তানকে মরুভূমিতে ফেলে এসেছি। এসব কিছুর বিনিময়ে আমার ছেলেটাকে কুরবানী করা থেকে রেহাই দাও, আল্লাহ এই হুকুমটাকে তুমি ফেরত নাও, কিন্তু তা তিনি বলেননি।
- ২) তিনি একথাও বলতে পারতেন যে আল্লাহ তোমার দ্বীন প্রচারের জন্যই ছেলে চেয়েছিলেন, একে দ্বীনের কাজের জন্যেই বেঁচে থাকতে দাও।
- ৩) অথবা তিনি বলতে পারতেন, আল্লাহ তুমি এ কেমন নিষ্ঠুর হুকুম দিলে? এমনকি মনে মনেও চিন্তা করতে পারতেন যে, আল্লাহর এ হুকুমটা কেমন কড়া হুকুম হয়ে গেল। তাও তিনি মনে করেননি।

এধরনের কিছুই তিনি বলেননি এবং মনে মনেও এধরনের কোন চিন্তা তিনি করেননি। কারণ তিনি জানতেন যে,

- ১) আল্লাহ যা করেন তা ভালোর জন্যেই করেন, প্রকাশ্যে তার অন্য কোন রূপ দেখা গেলেও।
- ২) আল্লাহর ইচ্ছার বিপরীত কোন ইচ্ছা করা বা কিছু বলার কোন অধিকার নেই, কারণ তিনি আল্লাহর অনুগত দাস।
- ৩) আল্লাহর ইচ্ছা ‘ভাল না মন্দ’ এ ধরনের চিন্তা করাও কুফরী। কাজেই তিনি কুফরী চিন্তা করবেন কেন?
- ৪) আল্লাহর চেয়ে বেশী অথবা সমান বুঝার চিন্তা করা বা দাবি করাও কুফরী। এ সবই তিনি বুঝতেন এবং এ কথাও বুঝতেন যে আল্লাহর হুকুম পালনের মধ্যেই রয়েছে মানব জীবনের সার্বিক সফলতা। কাজেই তিনি আল্লাহর হুকুমই পালন করতে উদ্যত হলেন। তিনি কি পূর্বে জানতেন যে, ছেলে এভাবে বেঁচে যাবে? না তা জানতেন না, যেমন জানতেন না আগুনে

যাওয়ার পূর্বে যে সেখান থেকে না পুড়ে জীবিত অবস্থায় ফিরে আসা যাবে ।  
তিনি তো ছেলেকে তাঁর নিয়ত মুতাবিক কুরবানী করেই দিয়েছিলেন ।

## ঘটনা থেকে শিক্ষা

- ১) মুসলিম হতে হলে আল্লাহর হুকুম যেমনই হোক না কেন তা মানতে হবে  
বিনা বাক্য ব্যয়ে এবং কোন প্রশ্ন ছাড়াই । হুকুম মানার পর তার ফলাফল  
ভালো হবে কী মন্দ হবে সে চিন্তাও করা যাবে না । অবশ্য আল্লাহর হুকুম  
মানলে তার ফলাফল কোনদিনও খারাপ হয় না ।
- ২) আল্লাহর হুকুম কোনটা সহজ ও কোনটা কঠিন তা দেখা চলবে না । হুকুম  
সহজই হোক আর কঠিনই হোক তা মেনে চলার ব্যাপারে মনে একই রকম  
ইচ্ছা থাকতে হবে । কারণ মানব জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্যই হচ্ছে  
আল্লাহর যাবতীয় হুকুম- আহকাম মেনে চলে সর্বদাই আল্লাহকে খুশী করার  
চেষ্টা অব্যাহত রাখা । কাজেই মুসলিমদের মনের অবস্থা সর্বদাই এমন  
থাকতে হবে যে, আল্লাহর হুকুম মানতে গিয়ে বাঁচলে জীবন সার্থক, মরলেও  
জীবন সার্থক ।
- ৩) আল্লাহর হুকুম মানার ব্যাপারে দুনিয়ার কোন লাভ-লোকসান, কোন মায়ামত,  
কামনা-বাসনা ইত্যাদি কোন বাঁধা হতে পারবে না ।

মুসলিম হওয়ার অর্থই হলো আল্লাহর হুকুম বিনা প্রতিবাদে মানতে সর্বদাই  
প্রস্তুত থাকা, তা জীবন দিয়ে হলেও । এবার আমরা চিন্তা করে দেখি যে, আমরা  
কোন পর্যায়ে মুসলিম? আমরা তো পোশাক-পরিচ্ছদে অনেকেই পাক্কা  
মুসলিম, কিন্তু তাকওয়ার কষ্টিপাথরে যাচাই করলে আমরা টিকবো কি পাক্কা  
মুসলিম হিসেবে? আমরা তো দেখি যেখানেই আল্লাহর হুকুম কঠিন বা পার্থিব  
কোন লোকসানের অথবা যেকোন দিক থেকে স্বার্থহানির ভয় আছে সেখানেই  
আমরা নেই । আমরা কি সব ব্যাপারেই আল্লাহর আনুগত্য করি? যদি উত্তর হয়  
'না', তবে প্রশ্ন, কেন তা করি না? এর একটাই মাত্র কারণ আর তা হচ্ছে এই  
যে পার্থিব কোন স্বার্থের ব্যাপারে কিছু না কিছু ঘাটতি বুঝলেই আমরা সেখানে  
নেই ।

এর মধ্যে একটা উজ্জ্বল শিক্ষা রয়েছে আমাদের জন্যে । তা হচ্ছে এই যে,  
আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি পাওয়ার হকদার আমরা তখনই হতে পারব যখন  
প্রমাণ করতে পারব যে আল্লাহর হুকুমের চাইতে আমরা জানমাল সন্তান-সন্ততি



এর কোনটারই মূল্য বেশী মনে করি না এবং প্রমাণ করতে পারব যে, আল্লাহ যে কাজে ব্যবহার করতে চান আমার জীবনকে আমি সেই কাজেই ব্যবহার করতে সদাই প্রস্তুত আছি। তা আঙুনে পুড়েই হোক বা ঘর বাড়ী ধন-সম্পদ ত্যাগ করেই হোক কিংবা সন্তান কুরবানী করেই হোক বা অন্য কিছু করেই হোক না কেন। যেমনটি ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ইসলামের উপর টিকে থাকার বিনিময়ে কঠিন বিপদকে বরণ করে নিয়েছিলেন। তিনি রাজী হয়েছিলেন—

১) আঙুনের কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হতে;

২) নবজাতক শিশু সন্তানকে তার মাসহ মরুভূমির মধ্যে রেখে আসতে; এবং

৩) নিজ হাতে নিজের সন্তানকে কুরবানী করতে।

এর কোনটাতেই তার কোন দ্বিধা ছিল না এবং ছিল না কোন আপত্তি। আর আমরা যদি সত্যই চাই যে এসব নাবীগণ যে জান্নাতে যাবেন আমরাও সেই জান্নাতে যাব, তাহলে আমাদেরকেও আমাদের যাবতীয় কাজকর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে যে আমরাও তাঁদের মতো ইসলামের জন্য জানমাল কুরবানী করতে প্রস্তুত আছি।

## রসূলুল্লাহ ﷺ -এর বন্দী জীবন

মক্কার ইসলাম বিরোধী নেতৃবৃন্দের আপন ঘরেই ইসলামের রক্ষক প্রস্তুত হলো। বড়বড় নেতাদের আপন সন্তান, আত্মীয়-স্বজন ইসলাম গ্রহণ করেছিল। শুরু থেকে এত বাধা এত প্রতিরোধ, লোমহর্ষক নির্যাতনের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে প্রবল গতিতে ইসলাম তার আপন লক্ষ্য পানে দুর্বীর বেগে অগ্রসর হচ্ছিল। মক্কার দুই প্রধান বীর হামজা (রা.) ও উমর (রা.) ইসলাম কবুল করে ইসলামী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ইসলাম তখন যেনো মক্কার ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছে। এ অবস্থায় কাফিররা ইসলাম ও মুসলিম এবং তাদের প্রতি যারা সহানুভূতিশীল তাদের বিরুদ্ধে চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। বনী হাশিম এবং বনী আবদিল মুত্তালিব বংশ ছিল বিশ্বনাবীর প্রতি সহানুভূতিশীল। সুতরাং এই দুই গোত্রের মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সবাই অন্যান্য গোত্রের শত্রুতে পরিণত হয়েছিল। কারণ অন্যান্য গোত্র এই দুই গোত্রের কাছে দাবী করেছিল, মুহাম্মাদ ﷺ -কে আমাদের হাতে উঠিয়ে দেয়া হোক, তাকে আমরা হত্যা করি। তাহলে তাঁর ইসলামের বিপ্লবী কার্যক্রম এমনিতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সে দাবী ঐ দুই গোত্র গ্রহণ করেন নি।

তঁারা নাবী কারীম عليه السلام এবং ঐ দুটি গোত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এক ঘৃণ্য চুক্তিনামা প্রস্তুত করলো। সে চুক্তিতে লিখিত ছিল, ‘মুহাম্মাদ عليه السلام বনী হাশিম এবং বনী আবদিল মুত্তালিবের সাহায্য সহযোগিতায় কুরাশদেরই শুধু নয়-গোটা মক্কার জাতিকে দ্বিধা বিভক্ত করেছে। পক্ষান্তরে তাকে হত্যাও করা যায়নি। তাঁর আদর্শ বিজয়ী হলে মক্কার সমস্ত গোত্রের সম্মান-মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বিনষ্ট হবে। এই ধরনের অনাকাঙ্খিত অবস্থায় তঁারা এই সিদ্ধান্তে উপনিত হলো যে, বনী হাশিম এবং বনী আবদিল মুত্তালিবের মুসলিম এবং অমুসলিম কারো সাথেই কোনরূপ সম্পর্ক রক্ষা করা যাবে না। তাদের সাথে বিয়ে, ব্যবসা, ধার দেনা, কথা-বার্তা তথা কোন ধরনের সম্পর্ক রক্ষা করা যাবে না। কেউ তাদেরকে কোন খাদ্য বা পানীয় দিয়ে সাহায্য করতে পারবে না। কেউ যদি তা করে, গোপনেও কেউ যদি তাদেরকে কোন ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করে তাহলে তাকে অবশ্যই কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।’

সমস্ত গোত্রের পক্ষ থেকে এই চুক্তিপত্র লিখে তা কা’বার দেয়ালে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছিল। চুক্তিপত্র লিখেছিল মনসুর ইবনে আকরামা। যে হাত দিয়ে সে বিশ্বনাবী عليه السلام-এর বিরুদ্ধে চুক্তিপত্র লিখেছিল, মহান আল্লাহ সে হাতের শাস্তিও তাকে দিয়েছিলেন। তাঁর হাতের আঙ্গুলে পক্ষাঘাত হয়েছিল। বিশ্বনাবী عليه السلام -এর বংশের আবু লাহাব ও তাঁর পরিবার ছিল এই চুক্তির আওতার বাইরে। কারণ সে স্বয়ং ঐ ঘৃণ্য চুক্তি সম্পাদনকারীদের পক্ষে ছিল। যাদের বিরুদ্ধে চুক্তি করা হয়েছিল এই চুক্তির ফলে তঁারা কি যেন অবর্ণনীয় অবস্থার মধ্যে নিপতিত হয়েছিল ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তা লিপিবদ্ধ রয়েছে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই চুক্তির কারণে শুধু বিশ্বনাবী عليه السلام এবং মুসলিমরাই দুঃসহ অবস্থার ভেতরে নিপতিত হয়নি। তখন পর্যন্ত ঐ দুই গোত্রের একটি বিরাট জনগোষ্ঠী ইসলাম কবুল করেনি, তঁারাও বর্ণনাতীত দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে নিপতিত হয়েছিল। মুসলিমদের সাথে সাথে তঁারাও দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অনাহারে থেকেছে, গাছের পাতা ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়েছে। তাদের শিশুগণও মুসলিম শিশুদের সাথে ক্ষুধার যন্ত্রণায় আকাশ-বাতাস দীর্ঘ-বিদীর্ণ করে আত্ননাদ করেছে।

বিশ্বনাবী عليه السلام-এর পক্ষের দুই গোত্র অবরোধের কবলে পতিত হবার পরে তঁারা দ্রুত একটি বৈঠক করলো। সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে তঁারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, শহরে এই অবস্থায় তঁারা বাস করতে থাকলে কোনক্রমেই পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে পারবে না। সুতরাং অন্য কোথাও যেয়ে অবস্থান করতে

হবে। বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থা করা যাবে না, এতে কষ্ট বৃদ্ধি পাবে। ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাস করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাঁরা শিয়াবে আবি তালিবে গিয়ে অবস্থান করাই যুক্তিযুক্ত মনে করলো। শিয়াবে আবি তালিব নামক জায়গাটা ছিল মক্কার একটি পাহাড়ের এলাকা। সেখানে বনী হাশিমের লোকজন বসবাস করতো। এলাকাটি ছিল সমস্ত দিক থেকে সুরক্ষিত পাহাড়ি দুর্গের মত। তাদের ধারণা ছিল, এখানে থাকলে তাঁরা বিভিন্ন স্থান থেকে তাদের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করতে পারবে। এ ঘটনা ছিল নবুওয়াত লাভের সাত বছরের সময় মহরম মাসে। ঐ দুই গোত্রের মুসলিম অমুসলিম সবাই বিশ্বনাবীর সাথে এই দুঃসহ অবস্থা হাসি মুখে বরণ করে নিল।

এই ধরণের বিপদ যে আসবে তা ঐ দুই গোত্র উপলব্ধি করতে পারেনি। বিপদ ছিল আকস্মিক। এ কারণে তাঁরা প্রস্তুতি গ্রহণের কোন সুযোগ পায়নি। তাদের কাছে খাদ্যদ্রব্য যা ছিল তাই নিয়ে তাঁরা পাহাড়ের ঐ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। সামান্য কয়েক দিনের ভেতরেই তাদের সমস্ত খাদ্য শেষ হয়ে গিয়েছিল। একটি দুটো দিন নয়-দীর্ঘ তিনটি বছর অনাহারে চরম কষ্টের ভেতরে তাদেরকে ঐ শিয়াবে আবি তালিবে বন্দী জীবনযাপন করতে হয়েছিল।

ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে, সে সময়ে তাঁরা নিম্ন গাছের পাতা খেয়ে পেটের ক্ষুধা নিবারণ করেছেন। পশুর শুকনো চামড়া তাঁরা আগুনে সিদ্ধ করে খেয়েছেন। মা খেতে পারেননি, ফলে তাদের বুকের দুধ শুকিয়ে গিয়েছে, সন্তান দুধ না পেয়ে করুন কণ্ঠে আর্তনাদ করেছে। গিরি দুর্গে শিশু-কিশোরগণ প্রচণ্ড ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আর্ত চিৎকার করেছে আর তাদের চিৎকার শুনে ইসলাম বিরোধিরা উল্লাস করেছে। সাহাবায়ে কেরাম বলেন, গাছের পাতা তাঁরা খেয়েছেন। ফলে তাদের মল পশুর মলের মত হয়ে গিয়েছিল। সাযাদ বলেন, ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে একদিন খাদ্যের সন্ধানে বের হলাম। কোথাও কিছুই যোগাড় করতে পারলাম না। পশুর এক টুকরা চামড়া কুড়িয়ে পেলাম। তাই এনে আগুনে সিদ্ধ করে আমরা আহার করলাম।

কোন দিক থেকে কেউ যেন গিরিদুর্গে সাহায্য প্রেরণ করতে না পারে এ জন্য ইসলাম বিরোধী শক্তি যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছিল। তাঁরা পালা করে গিরিদুর্গের প্রবেশ পথসমূহে প্রহার ব্যবস্থা করেছিল। কোন লোক যদি গিরিদুর্গ থেকে বাইরে এসে কোন জিনিস ক্রয় করার জন্য মূল্য নির্ধারণ করতো তাহলে ঠিক তখনই ইসলাম বিরোধিরা অধিক মূল্য প্রদান করে সে দ্রব্য ক্রয় করে নিত। কোন সময় দুর্গের ভেতর থেকে কোন ব্যক্তি বাইরে এলে তাকে প্রহার করে

রক্তাক্ত করে দেয়া হত। খাদিজা (রা.) যিনি মায়ের গর্ভ হতে এই পৃথিবীতে এসে কোন দিন অভাব শব্দের সাথে পরিচিত হননি। দিনের পর দিন তাঁকে অনাহারে থাকতে হয়েছে। ক্ষুধার যন্ত্রণা তিনি হাসি মুখে সহ্য করলেও তাঁর ভেতরটা নিঃশেষে ক্ষয় হয়ে গিয়েছিল। অবরোধ জীবনের অবসানের পরেই এর ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। বিশ্বনাথীর চাচা আবু তালিবের ভেতরেও কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। ক্ষুধার দানব বিশ্বনাথীর এই দুই পরম প্রিয়জন চাচা আবু তালিব আর জীবন সাথি খাদিজা (রা.)কে নিঃশেষ করে দিয়েছিল।

হিশাম একদিন যুহাইর এর কাছে যেয়ে বললেন, ‘তুমি নিজে সমস্ত দিক দিয়ে সুখে আছো। পেটভরে আহার করছো আরামে ঘুমাচ্ছে। তুমি কি জানো তোমার আত্মীয়-স্বজনগণ বন্দী অবস্থায় গিরিদূর্গে কিভাবে মানবেতর জীবনযাপন করছে? যারা তাদেরকে এভাবে কষ্ট দিচ্ছে, তাদের কোন আত্মীয়কে এভাবে যদি তুমি কষ্ট দিতে তাহলে তাঁরা কি তা মেনে নিত-না তোমার সাথে ঐকমত্য পোষণ করতো?’ যুহাইর ইবনে উমাইয়ার যেন বিবেক জাগ্রত হলো। সে জবাব দিল, ‘একা তো আমার কোন ক্ষমতা নেই। কিছু লোকজন আমি সাথে পেলে ঐ চুক্তি বাতিল করে দিতাম?’

হিশাম বললো, ‘আমি তোমার সাথে আছি, তুমিও জনসমর্থন যোগাড় করো আমিও করি।’ হিশাম মুতয়িম ইবনে আদির কাছে যেয়ে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করে আসল কথা উত্থাপন করলো। বললো, ‘হে মুতয়িম! বনী আবদে মানাফের লোকজন অনাহারে নির্যাতন ভোগ করে মৃত্যুবরণ করবে আর তুমি কি সে দৃশ্য দেখে নীরবে দর্শকের ভূমিকা পালন করবে? যারা আজ তাদেরকে বন্দী করে চরম নির্যাতন চালাচ্ছে, তাঁরা কাল যে তোমার উপরে সেই ধরনের নির্যাতন চালাবে না, এর তো কোন নিশ্চয়তা নেই।’

এভাবে হিশাম বিভিন্ন ব্যক্তিদের সাথে আলাপ আলোচনা করে জনমত গঠন করলেন। তারপর ঐ চুক্তির বিরুদ্ধে তিনি মক্কার হাজুন নামক এক পাহাড়ের পাদদেশে একটা সমাবেশের আয়োজন করলেন। যথা সময়ে সেখানে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হলো এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো আগামী কাল সকালে তাঁরা সবাই তাদের কাছে যেয়ে প্রকাশ্যে চুক্তির প্রতি বিদ্রোহ করবে, যারা বনী হাশিম এবং বনী আবদিল মুত্তালিব গোত্রকে বন্দী রাখার পক্ষে। এ সংবাদ গিরিদূর্গেও পৌঁছেছিল। গোটা মক্কায় ব্যাপারটা প্রচণ্ড আলোড়ন জাগালো। চুক্তির প্রতি বিদ্রোহকারী দল পরের দিন মূল্যবান পোষাকে সজ্জিত হয়ে কা’বাঘরে গেল।

কা'বা ঘর তাঁরা সাত বার তাওয়াফ করে উপস্থিত জনতার সামনে ভাষণ পেশ করলো ।

ভাষণে তাঁরা বললো, 'মক্কার অধিবাসীগণ! আমরা পেটভরে আহার করছি, তৃষ্ণায় আকর্ষ পানি পান করছি । আমাদের সন্তান সন্ততিগণ ফুটিতে আছে । ওদিকে বনী হাশিম এবং বনী আবদিল মুত্তালিবগণ কি অবস্থায় তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করছে তা কি আমরা অনুভব করেছি? তাদের সাথে কেউ কোন সম্পর্ক রাখতে পারবে না এটা চলতে দেয়া হবে না । মহান আল্লাহর শপথ! আমরা এমন চুক্তি মানিনা, যে চুক্তির বলে মানুষ অত্যাচারিত হয় । এই চুক্তি আমরা অবশ্যই ছিড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলবো ।'

আবু জাহিল প্রতিবাদ করে বললো, 'তোমরা মিথ্যা কথা বলছো, ঐ চুক্তি বাতিল করা হবে না ।' চুক্তির প্রতি বিদ্রোহী দল সমন্বরে তীব্র প্রতিবাদ করে বললো, 'মিথ্যাবাদী তুমি । এই চুক্তি আমরা মানিনা । আমরা আল্লাহর কাছে এই চুক্তির সাথে সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করছি এবং আমাদের পক্ষ এই চুক্তি বাতিল বলে ঘোষণা করছি ।'

দুই পক্ষে চুক্তি বাতিল বা বহাল রাখা নিয়ে ভীষণ ঝগড়ার সৃষ্টি হলো । ওদিকে বিশ্বনাথী عليه السلام তাঁর চাচা আবু তালিবকে প্রেরণ করেছিলেন গোপন একটা কথা বলে । উভয় দলে যখন মারামারি হবার উপক্রম হলো তখন আবু তালিব এসে বললেন, 'তোমরা যে চুক্তি করেছো তা আল্লাহর পছন্দ নয় । আমার কথা সত্য না মিথ্যা তা তোমরা প্রমাণ করে দেখতে পারো । তোমরা ঐ চুক্তি পত্র দেখতে পারো । দেখো তা পোকায় খেয়ে শেষ করে দিয়েছে । আমার কথা যদি মিথ্যা হয় তাহলে আমরা মুহাম্মাদ صلی اللہ علیہ وسلم -কে কোন রূপ সহযোগিতা করবো না । আর আমার কথা যদি সত্য হয় তাহলে সমস্ত অবরোধের অবসান এখানেই ঘটবে ।'

এ সময়ে মুতয়িম নামক চুক্তি বিরোধী একজন দ্রুত এগিয়ে গিয়ে চুক্তি পত্রটা কা'বার দেয়াল থেকে নিয়ে এলো । দেখা গেল আল্লাহর নাম লিখা অংশটুকু ব্যতীত আর সমস্ত অংশ পোকায় খেয়ে শেষ করে দিয়েছে । ইসলাম বিরোধিরা তখন বাধ্য হয়েছিল লজ্জায় মুখ ঢাকতে কিন্তু এত বড় নিদর্শন দেখেও মহাসত্য গ্রহণ তাদের ভাগ্যে হলো না । চুক্তির বিরোধিরা বিজয়ী হলো, তাঁরা নিজেরা অগ্রসর হয়ে গিরিদুর্গ থেকে সবাইকে মুক্ত করে আনলেন । মক্কার কয়েকজন যুবক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বিশ্বনাথী عليه السلام -কে প্রহরা দিয়ে কা'বায় এনেছিল । তিনি সেখানে সলাত আদায় করেছিলেন । এই বন্দী দশায় থাকতেই বিশ্বনাথীর

চাচা আব্বাসের এক স্ত্রীর গর্ভে আব্দুল্লাহ (রা.) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নাবী কারীম صلی اللہ علیہ وسلم -এর চাচা তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ না করলেও চাচী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

সন্তান প্রসব করার পরে তিনি সে সন্তান এনে রসূল صلی اللہ علیہ وسلم -এর কাছে দিলেন। বিশ্বনাবী صلی اللہ علیہ وسلم সে সন্তান অর্থাৎ তাঁর চাচাত ভাইয়ের মুখে নিজের মুখের লাল দিয়েছিলেন। এমনই এক মহাভাগ্যবান শিশু ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) যে পৃথিবীতে এসে মায়ের স্তন পান করার আগে আল্লাহর নাবী صلی اللہ علیہ وسلم -এর মুখের লাল পান করেছিলেন। আল্লাহর নাবী صلی اللہ علیہ وسلم তাঁর জন্য প্রাণভরে দু'আ করতেন। শিশু আব্দুল্লাহকে তিনি খুবই আদর করতেন। সবসময় নিজের কাছেই রাখতেন। কিন্তু হিয়রতের সময় বছর কয়েকের জন্য এই শিশুর সাথে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটলেও আল্লাহর কুদরত তাদেরকে আবার এক করে দিয়েছিল। সাহাবায়ে কেরামদের ভেতরে তাঁর মত স্মৃতি শক্তি এবং গভীর জ্ঞানের অধিকারী, পবিত্র কুরআনের সুস্মাতিসুস্ম বিষয় উদঘাটনকারী আর একজনও ছিল না।

## রসূলুল্লাহ صلی اللہ علیہ وسلم -এর প্রতি তায়েফবাসীদের অত্যাচার

নাবী কারীম صلی اللہ علیہ وسلم যে বাড়িতে থাকতেন সে বাড়ির চারদিকে যারা বসবাস করতো, অর্থাৎ আল্লাহর রসূল صلی اللہ علیہ وسلم -এর প্রতিবেশী যারা ছিল তাদের ভেতরে একমাত্র হাকাম ইবনে আ'স ব্যতীত আর কেউ ইসলাম কবুল করেনি। বিশ্বনাবী صلی اللہ علیہ وسلم যখন নিজের বাড়িতেই সলাতে দাঁড়াতে তখন প্রতিবেশী উকবা, আদী এ ধরনের অনেকেই তাঁর উপরে পশুর নাড়ি ভুড়ি ছুড়ে দিত। আল্লাহর নাবী صلی اللہ علیہ وسلم বাধ্য হয়ে একটা দেয়ালের আড়ালে সলাত আদায় করতেন। তিনি রান্নার জন্য চুলায় হাড়ি উঠাতেন আর তাঁরা সেই হাড়ির ভেতরেও আবর্জনা ছুড়ে দিত। বিশ্বনাবী صلی اللہ علیہ وسلم নিজ হাতে সেসব আবর্জনা পরিষ্কার করতেন। এভাবে খাদিজা (রা.) ও আবু তালিবের অভাবে বিশ্বনাবী صلی اللہ علیہ وسلم -কে কাফিরের দল তাঁর নিজ বাড়ির ভেতরেও নির্যাতন করেছে। সে সমস্ত ঘটনা ইতিহাসের কালো অধ্যায় হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে আছে। আল্লাহর নাবী صلی اللہ علیہ وسلم মক্কায যেন আর টিকতে পারেন না। মক্কায ইসলাম বিরোধীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়লেন। তাদের এই অত্যাচার থেকে কিভাবে মুক্ত থাকা যায় তিনি সে সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকলেন। অবশেষে তিনি চিন্তা করলেন, তায়েফের আবদে ইয়ালিল, মাসউদ ও হাবিব এই তিনজন যদি ইসলাম কবুল করে তাহলে ইসলামী

কাফেলার উপর মক্কার কাফিররা অত্যাচার করতে সাহস পাবে না। উল্লেখিত তিন ব্যক্তি ছিল তায়েফের সবচেয়ে প্রভাবশালী গোত্র সাকিফ গোত্রের তিন ভাই। তাঁরাই ছিল গোত্র প্রধান। এই তিনজন লোক যদি ইসলামের পক্ষে আসে তাহলে ইসলামী আন্দোলন আহবান পৌঁছে দেয়া যাবে। এ সবদিক চিন্তা করে আল্লাহর নাবী ﷺ যায়েদকে সাথে নিয়ে পায়ে হেঁটে তায়েফ রওয়ানা দিলেন।

তায়েফের ঐ নেতা তিন ভাইয়ের একজন মক্কার কুরাইশ বংশের মেয়ে বিয়ে করেছিলেন। নাবী কারীম ﷺ ও ছিলেন কুরাইশ বংশের, সুতরাং তাঁরা ছিল কুরাইশদের আত্মীয়। তাঁরা ইচ্ছা করলে নাবীকে সাহায্য সহযোগিতা করতে পারে। এই আশায় তিনি তায়েফ গমন করলেন। কিন্তু তাকদির ছিল ভিন্ন ধরণের। তিনি তাদের কাছে গেলেন। তাদের তিন ভাইকে ইসলাম সম্পর্কে বুঝালেন।

তিনি তাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে বুঝিয়ে অনুরোধ করলেন ইসলাম গ্রহণ করার জন্য। তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করা দূরে থাক, বিশ্বনাবীকে অপমান করলো। একজন বললো, ‘তোমাকেই আল্লাহ যদি রসূল করে প্রেরণ করে থাকে তাহলে আল্লাহ কা’বা শরীফের গিলাফ খুলে ফেলুক।’ এই হতভাগার কথার তাৎপর্য ছিল, আল্লাহ তাকে নাবী বানিয়ে কা’বার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছেন।

দ্বিতীয়জন বললো, ‘তোমাকে ব্যতীত আর কাউকে কি আল্লাহ রসূল বানানোর লোক খুঁজে পেলেন না?’

তৃতীয়জন বললো, ‘তুমি যদি তোমার দাবী অনুযায়ী সত্যি রসূল হয়ে থাকো তাহলে তোমার সাথে কথা বলা বিপদজনক। আর যদি তোমার দাবীতে তুমি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকো তাহলে আমি কোন মিথ্যাবাদীর সাথে কথা বলতে ইচ্ছুক নই, এ কারণে তোমার সাথে আমি কোন কথা বলতে চাইনা।’

এসব কথা বলে তারা নাবী কারীম ﷺ কে অপমান করে তাড়িয়ে দিল। তাঁরা নাবীর কথা সমস্ত লোকজনের ভেতরে বিদ্রূপের ভাষায় প্রকাশ করে দিল এবং এলাকার মূর্থ ও দুষ্ট লোকদেরকে নাবীর পেছনে লেলিয়ে দিল। এসব লোক নাবীর পেছন পেছন যেতে লাগলো আর তাকে বিদ্রূপ করতে লাগলো। তিনি যদিকেই যান সেদিকেই তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে উৎপাত করতে থাকলো।

আল্লাহর নাবী দীর্ঘ দশ দিন যাবৎ তায়েফে অবস্থান করে মানুষকে ইসলামের দিকে আহবান জানিয়েছিলেন। ইসলাম বিরোধিরা অবশেষে নাবী কারীম ﷺ

যে রাস্তা দিয়ে যাবেন সে রাস্তার দু'দিকে পাথর হাতে দাঁড়িয়ে গেল। ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে, পাষন্ডের দল বৃষ্টির আকারে তাঁর উপরে পাথর বর্ষণ করতে থাকলো। আল্লাহর নাবী রক্তাক্ত ক্ষত বিক্ষত হয়ে পড়লেন। তায়েফের জালিমরা নাবীর পা দুটো লক্ষ্য করেই আঘাত করেছিল বেশী। আল্লাহর নাবী যখন হাঁটার ক্ষমতা হারিয়ে ফেললেন তখন তিনি জ্ঞানহারা হয়ে রাস্তায় পড়ে গেলেন। এ অবস্থাতেও নিষ্ঠুর তায়েফবাসী পাথর বর্ষণ অব্যাহত রাখলো। আল্লাহর নাবীর এই অবস্থা দেখে যায়েদ তাঁর উপর থেকে পাথর সরিয়ে তাঁকে উঠালেন।

নাবীকে সাহায্য করতে গিয়ে যায়েদও মারাত্মকভাবে আহত হলেন। আল্লাহর নাবী হাঁটতে পারছেন না। কোন মতে অবশ্য পায়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছলো যে, নাবীর জীবন নাশের আশংকা দেখা দিল। যায়েদ নাবীকে নিয়ে দেয়াল ঘেরা একটি বাগানে প্রবেশ করলেন। নাবী কারীম صلی اللہ علیہ وسلم -এর তখন জ্ঞানহীনের মত অবস্থা। যায়েদের সেবা-যত্নে তিনি একটু সুস্থ হয়েই তাঁকে বললেন সলাতের কথা। সলাতের প্রস্তুতির জন্য তিনি পায়ের জুতা খুলতে গেলেন। পারলেন না। রক্ত জুতায় প্রবেশ করে পায়ের সাথে জুতা এমনভাবে বসে গেছে যে জুতা খুলতে কষ্ট করতে হলো।

এরপর নাবী কারীম صلی اللہ علیہ وسلم আল্লাহর দরবারে হাত উঠিয়ে দু'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! আমি দুর্বল, আমি অক্ষম, আমি সহায় সম্বলহীন, আমার বিচক্ষণতার অভাব। মানুষ আমাকে অবজ্ঞা করে, আমাকে নগণ্যভাবে, আমাকে উপেক্ষা করে এ জন্য আমি আপনার কাছে আবেদন করছি। যারা দুর্বল এবং সহায় সম্বলহীন আপনিই তাদের আশ্রয়দাতা প্রতিপালক। হে আল্লাহ! আপনি আমার প্রতিপালক। আপনি মানুষের নিষ্ঠুরতা আর করুণাহীনতার উপরে আমাকে ছেড়ে দিচ্ছেন? যে আমাকে শত্রু জ্ঞান করে আমার উপর অত্যাচার করে আপনি তাঁর উপর আমাকে ছেড়ে দিচ্ছেন? আপনি যদি আমার উপর রহম করেন আমাকে নিরাপত্তা দান করেন তাহলে এটাই হবে আমার জন্য শান্তির কারণ। আমি আপনার সেই রহমতের আশ্রয় কামনা করি, যে রহমতের কারণে সমস্ত পৃথিবী উৎসব মুখর হয় এবং পৃথিবী ও আখিরাতের সমস্ত সমস্যা সমাধান হয়। আমার অক্ষমতার জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার সাহায্য ব্যতীত আমি কোন কাজ সমাধা করতে পারবো না।'

এভাবেই আল্লাহর নাবীকে তায়েফ থেকে হতাশ আর অত্যাচারিত হতে হয়েছিল। আয়িশা (রা.) বিশ্বনাবীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কোথায় আপনার উপরে সবচেয়ে বেশী নির্যাতন করা হয়েছে?' আল্লাহর নাবী তাকে



জানিয়েছিলেন তায়েফের কথা। এ ধরণের নির্মম নির্যাতন নাবী কারীম ﷺ - এর জীবনে আর কোথাও ঘটেনি। তিনি তায়েফ থেকে ফিরে মক্কার দিকে যাত্রা করলেন।

## ওহদের যুদ্ধে রসূলুল্লাহ ﷺ -এর দাঁত ক্লতিগ্রস্ত

নাবী কারীম ﷺ তাঁর অনুগত বাহিনীকে ওহূদ পাহাড়ের সামনের অঙ্গনে একত্রিত করে বুহ্য রচনা করলেন। আনসারদের মধ্য থেকে পরামর্শ দেয়া হলো, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মিত্র ইয়াহূদীদেরকে আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে বললে হয় না?’

আনসারদের এই পরামর্শ দেয়ার কারণ হলো, নাবী কারীম ﷺ মদীনায় এসে যে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন, তার মধ্যে একটি ধারা ছিল, কোন বাইরের শক্তি দ্বারা যদি মদীনা আক্রান্ত হয়, তাহলে সবাই সম্মিলিতভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে। চুক্তির এই ধারার কথা স্মরণ করেই আনসারদের পক্ষ থেকে ঐ পরামর্শ দেয়া হয়েছিল। আল্লাহর নাবী ﷺ তাঁদের পরামর্শের উত্তরে বলেছিলেন, ‘ইয়াহূদীদের দিয়ে আমাদের কোন কাজ নেই।’

‘আল কুরআনের আইন প্রতিষ্ঠিত হবে ইয়াহূদীদের সহযোগিতায় এ অভিপ্রায় নাবী কারীম ﷺ -এর কখনো ছিল না।’ চুক্তি অনুযায়ী ইয়াহূদীরা সাহায্য করতে বাধ্য ছিল। কিন্তু তিনি তাদের সাহায্য গ্রহণ করেননি। কারণ তিনি জানতেন, তিনি যদি আজ ইয়াহূদীদের সাহায্য গ্রহণ করেন, তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত এটা একটি কালো দলিল হয়ে থাকবে মুসলিমদের জন্য।

মুসলিম সৈন্যদেরকে তিনি আদেশ দিলেন, ‘আমি নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত যুদ্ধ শুরু করবে না।’ মদীনার আনসাররা নিজের চোখে দেখছিল, তাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আবাদ করা ক্ষেতগুলো মক্কার কুরাইশরা পশুপাল দিয়ে খাওয়াচ্ছে। এই দৃশ্য তাদের কাছে ছিল অসহনীয়। কিন্তু সিপাহসালারের অনুমতি না থাকার কারণে তাঁরা কিছুই বলতে পারছিল না। নাবী কারীম ﷺ তাঁর বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.)-কে ৫০ জনের তীরন্দাজ বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করলেন। তাঁকে চিহ্নিত করার জন্য তাঁর মাথায় সাদা কাপড় দেয়া হয়েছিল।

তাঁকে নির্দেশ দিলেন, ‘শত্রু পক্ষের অশ্বারোহী বাহিনীকে তুমি তীর দিয়ে প্রতিরোধ করবে। যুদ্ধে আমরা জয়ী হই বা পরাজিত হই, কোন অবস্থাতেই

তোমার পেছন থেকে কেউ যেন আক্রমণ করতে না পারে, সেদিকে দৃষ্টি রাখবে। তুমি তোমার নিজের স্থানে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করবে, কোনক্রমেই তোমাদের পেছন থেকে কেউ যেন আক্রমণ করতে না পারে।’

যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.)-কে অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়া হলো। যাদের দেহে বর্ম ছিল না, এদের নেতৃত্ব দেয়া হলো হামজা (রা.)-র উপর। এরপর আল্লাহর নাবী ﷺ স্বয়ং দুটো বর্ম পরিধান করলেন। যুদ্ধের পতাকা উঠিয়ে দিলেন তরুণ সাহাবী মুসআব (রা.)-র হাতে। এই সাহাবীর গর্ভধারিণী মাতা তখন কুরাইশদের সাথে ওহূদের ময়দানেই মুসলিমদেরকে চিহ্নিত করার জন্য এসেছে।

বদর যুদ্ধে কুরাইশদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, এই ওহূদের প্রান্তরে তারা সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগালো। তারাও মুসলিম বাহিনীর মতই সৈন্যদের বৃহৎ রচনা করেছিল। বদরের তুলনায় এবার তাদের প্রস্তুতি ছিল কয়েকগুণ বেশী। তাদের সৈন্যদের মধ্যে এবার শৃংখলাও ছিল লক্ষণীয়। বাহিনীর কিছু অংশের নেতৃত্ব দেয়া হয়েছিল খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে, আর কিছু অংশের নেতৃত্ব দেয়া হয়েছিল আবু জাহিলের সন্তান ইকরামাকে। তীরন্দাজ বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়া হয়েছিল আব্দুল্লাহ ইবনে রাবিয়াকে। অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্ব ছিল স্বয়ং আবু সুফিয়ানের হাতে। পতাকা দেয়া হয়েছিল তালহার হাতে।

দুইশত ঘোড়া প্রস্তুত রাখা হয়েছিল, যেন জরুরী প্রয়োজন দেখা দিলে কাজে লাগানো যেতে পারে। প্রথমে তারা যুদ্ধের কোন বাজনা না বাজিয়ে তাদের নারীর দলকে সামনের দিকে এগিয়ে দিলো। কুরাইশদের এই হিংস্র নারীরা নানা ধরনের উস্কানীমূলক কবিতা আবৃত্তি করতে করতে দফ্ বাজিয়ে কুরাইশ বাহিনীর সামনে দিয়ে ঘুরে গেল।

### **কে এই তরবারীর হক আদায় করবে?**

নাবী কারীম ﷺ তাঁর নিজের তরবারী হাতে নিয়ে ঘোষণা করলেন, ‘আমার এই তরবারীর হক আদায় করার জন্য কে প্রস্তুত আছে?’

মুসলিম বাহিনীর প্রত্যেক সদস্যই রসূল ﷺ-এর তরবারী গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তরবারীর দিকে অসংখ্য হাত এগিয়ে এলো। আল্লাহর নাবী সে তরবারী কাউকে দিলেন না। আবু দুজানা (রা.) জানতে চাইলেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! তরবারীর হক আদায় করা বলতে কি বুঝায়?’ তিনি বললেন, ‘তরবারীর

হক আদায় বলতে এই তরবারী দিয়ে শত্রুকে এত বেশী আঘাত করতে হবে, যেন এই তরবারীই বাঁকা হয়ে যায় ।’

আবু দুজানা বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমি ঐ তরবারী গ্রহণ করবো এবং তরবারীর হক আদায় করবো ।’

নাবী কারীম ﷺ তাঁর তরবারী আবু দুজানার হাতে দিলেন । তিনি তরবারী গ্রহণ করে গর্বিত ভঙ্গিতে হেঁটে সৈন্যদের বুহ্যে চলে গেলেন । আল্লাহর নাবী তাঁর সাহাবীর হাঁটার ভঙ্গী দেখে মন্তব্য করলেন, ‘যুদ্ধের ময়দান ব্যতীত হাঁটার এই ভঙ্গী আল্লাহর কাছে চরম অপছন্দনীয় ।’

নাবী কারীম ﷺ মুসলিম বাহিনীকে পরস্পরের পরিচিতির জন্য একটি সংকেত শিখিয়ে দিয়েছিলেন । বাহিনীর কোন সদস্য যদি ‘আমিত’ শব্দ বলে তাহলে বুঝতে হবে সে নিজেদের লোক । ‘আমিত’ শব্দের অর্থ হলো, মরণ আঘাত হানো ।

যুদ্ধের প্রথমেই কুরাইশদের পক্ষ থেকে এমন একজন লোক ময়দানে এলো, যে লোকটি ছিল এক সময় মদীনার অধিবাসী । মদীনার আনসারদেরকে লোকটি প্রচুর দান করতো । লোকটির নাম ছিল আবু আমের । সে ধারণা করেছিল, কুরাইশদের সাথে তাকে দেখলেই মদীনার আনসাররা আল্লাহর নাবীকে ত্যাগ করে তার সম্মানে ও তার অতীত দানশীলতার কথা স্মরণ করে কুরাইশদের সাথে যোগ দেবে ।

মুখ্ এই লোকটি ময়দানে এসেই হুংকার ছাড়লো, ‘আমাকে তোমরা চিনতে পারছো? আমি আবু আমের ।’

আনসাররা জবাব দিল, ‘আমরা তোমাকে চিনি । তুমি যা আশা করছো তা আল্লাহ পূর্ণ করবেন না ।’

কুরাইশদের পতাকাধারী দল থেকে তালহা বের হয়ে এসে চিৎকার করে বললো, ‘ওহে মুসলিমের দল! তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে আমাকে জাহান্নামে প্রেরণ করতে চায় অথবা নিজেই সে জান্নাতে যেতে চায়?’

লোকটির বিদ্ৰোপাত্মক কথা আলী (রা.) সহ্য করতে পারলেন না । তিনি এগিয়ে গিয়ে বললেন, ‘তোকে জাহান্নামে প্রেরণের জন্য আমি আছি ।’

এ কথা বলে তিনি এমন শক্তিতে তালহাকে (মুসলিম বাহিনীর তালহা ভিন্ন ব্যক্তি) আঘাত করলেন, এক আঘাতেই সে কাফির ধূলি শয্যা গ্রহণ করলো এবং হাতের পতাকা লুটিয়ে পড়লো। তালহার ভাই ওসমান ময়দানে আপন ভাইয়ের শোচনীয় অবস্থা দেখে প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে এলো।

হামজা (রা.) এমনভাবে তার কাঁধে আঘাত করলেন যে, ওসমানের কোমর পর্যন্ত হামজার তরবারী পৌঁছে গেল। এরপরেই ব্যাপক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। আবু দুজানা (রা.) রসূলের তরবারী নিয়ে কুরাইশদের বুহ্য ভেদ করে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। আলী (রা.) ও হামজা (রা.) একইভাবে কুরাইশদের সৈন্য বাহিনীর বুহ্য ভেঙ্গে তছনছ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। হামজা দুই হাতে তরবারী চালনা করছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শী যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.) বলেন, রসূলের তরবারীর অধিকারী আবু দুজানা (রা.) এমনভাবে যুদ্ধ করছিলেন যে, তাঁর তরবারীর সামনে যে পড়ছিল সেই নিহত হচ্ছিল। আমি দেখলাম শত্রুদের একটি লোক আমাদের লোকদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করছিল। আবু দুজানা (রা.) ঐ লোকটির দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি দু'আ করছিলাম লোকটি যেন আবু দুজানার (রা.) সামনে পড়ে। এক সময় সে আবু দুজানার (রা.) সামনে পড়লো।

দু'জনে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। লোকটি আবু দুজানা (রা.)কে প্রচণ্ড বেগে তরবারীর আঘাত হানলো। আবু দুজানা (রা.) সে আঘাত তাঁর চামড়ার ঢাল দিয়ে প্রতিহত করলেন এবং লোকটির তরবারী আবু দুজানা (রা.)র চামড়ার ঢালে আটকে গেল। এই সুযোগে তিনি রসূলের দেয়া তরবারী দিয়ে আঘাত করে লোকটিকে হত্যা করলেন।

## **রসূল ﷺ এর তরবারীর সন্মান**

এরপর তাঁর সামনে পড়লো আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা। আবু দুজানা তাঁর মাথার উপর তরবারী উঠিয়েও নামিয়ে নিলেন। এ সম্পর্কে স্বয়ং আবু দুজানা (রা.) বলেন, ‘আমি দেখলাম কে একজন মক্কার কাফিরদেরকে উস্কানী দিচ্ছে। আমি তার এই অপকর্ম বন্ধ করার জন্য এগিয়ে গেলাম। আমি তরবারী উঠাতেই সে ভয়ে চিৎকার করে উঠলো। তখন আমি বুঝলাম সে একজন নারী। আমি রসূলের তরবারী দিয়ে একজন নারীকে আঘাত করে তরবারীর অপমান করতে চাইনি। এ কারণে আমি আঘাত করিনি।’

মুসলিম বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে মক্কার কুরাইশরা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল। যখনই তারা পিছনের দিকে সরে যেতে থাকে, তখনই তাদের নারীরা কবিতা আবৃত্তি করে তাদের উৎসাহ সৃষ্টি করছিল। হামজা (রা.)র আক্রমণের মুখে কুরাইশ বাহিনী বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়ে পড়ছিল। তিনি দু'হাতে তরবারী চালনা করে শত্রু নিধন করছিলেন। হাবশী গোলাম ওয়াহশী তাঁর মনিবের সাথে চুক্তি করেছিল, সে যদি হামজাকে হত্যা করতে পারে তাহলে তাকে মুক্তি দেয়া হবে। সে লক্ষ্য স্থির করে আড়ালে বসেছিল। হারবা নামক ছোট এক ধরণের বর্শা দূর থেকে ছুড়ে সে হামজা (রা.)কে হত্যা করেছিল। হানজালার পিতা আবু আমের কুরাইশদের পক্ষে যুদ্ধ করছিল। হানজালা নাবী কারীম ﷺ-এর কাছে অনুমতি চাইলেন, তিনি তাঁর পিতার সাথে যুদ্ধ করবেন।

আল্লাহর নাবী এটা পছন্দ করলেন না যে, পিতার সাথে সন্তান যুদ্ধ করবে। তিনি অনুমতি দিলেন না। মুসলিম বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে যুদ্ধের এক পর্যায়ে মক্কার কুরাইশ বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। মুসলিম বাহিনী কুরাইশদের ফেলে যাওয়া সম্পদ সংগ্রহ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। যুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়েছে দেখে তীরান্দাজ বাহিনীর মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল। একদল যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহ করার জন্য ময়দানে চলে যাবার পক্ষে মতামত দিল। তীরান্দাজ বাহিনীর সেনাপতি আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.) তাদেরকে বারবার নিষেধ করার পরেও তাঁরা নেতার আদেশ অমান্য করে গণিমতের মালামাল সংগ্রহ করার জন্য ময়দানে ছুটে গেল। মক্কার কুরাইশ বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেও তারা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। আল্লাহর নাবী মুসলিমদের তীরান্দাজ বাহিনীকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত অবস্থান করতে আদেশ দিয়েছিলেন, সে স্থান অরক্ষিত দেখে খালেদ ইবনে ওয়ালিদ তার বাহিনী নিয়ে সেদিক থেকেই ঝড়ের বেগে আক্রমণ করেছিলেন।

নেতার আদেশ অমান্য করার ফল হাতে হাতেই মুসলিম বাহিনী লাভ করলো। চারদিক থেকে কুরাইশ বাহিনী একত্রিত হয়ে অপ্রস্তুত মুসলিম বাহিনীকে এমনভাবে আক্রমণ করলো যে, তাঁরা যুদ্ধ করা দূরে থাক- আত্মরক্ষা করার মত সুযোগ পেল না। অসহায়ের মত বড়বড় বীর যোদ্ধা শাহাদাতবরণ করতে লাগলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ়ের মতই অনেকে কি করবেন তা ভেবে পাচ্ছিলেন না। তীরান্দাজ বাহিনীর যে কয়জন গিরিপথে প্রহরা দিচ্ছিলেন, তাঁরা একে একে শাহাদাতবরণ করলেন। কুরাইশ বাহিনীর লক্ষ্য ছিল একটিই, নাবী কারীম ﷺ-কে হত্যা করা। ইসলাম বিরোধীদের আক্রমণ এতই তীব্র ছিল যে,

অধিকাংশ সাহাবা সে সময় জানতেন না, আল্লাহর রসূল কোথায় কী অবস্থায় আছেন ।

কুরাইশ বাহিনী আর মুসলিম বাহিনী এমনভাবে একাকার হয়ে গিয়েছিল যে, কে শত্রু আর কে মিত্র তা জানার উপায় ছিল না । মুসআব রাদিয়াল্লাহু আনহুর চেহারা এবং দেহের আকৃতি কিছুটা নাবী কারীম ﷺ-এর মতই ছিল । তিনি মুসলিম বাহিনীর পতাকা বহন করছিলেন । কাফির ইবনে কামিয়া তাকে হত্যা করে ভেবেছিল সে আল্লাহর নাবীকে হত্যা করেছে । ময়দানে সে চিৎকার শুনে মুসলিম বাহিনীর শেষ শক্তিটুকুও যেনো ঝরে পড়েছিল । উমর (রা.)র মত ব্যক্তি নিশ্চল হয়ে বসেছিলেন । আনাসের চাচা আনাস ইবনে নদর (রা.) উমর (রা.)কে তরবারী ফেলে বসে থাকতে দেখে বললেন, ‘আপনি যুদ্ধ না করে এখানে এমন করে বসে আছেন কেন? তিনি বাকরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, ‘এখন যুদ্ধ করে আর কি হবে, আল্লাহর নাবীই তো পৃথিবীতে আর নেই ।’ আনাস ইবনে নদর (রা.) আতঁচিৎকার করে বললেন, ‘আল্লাহর রসূল আর নেই! তাহলে আমার আর বেঁচে থেকে কী হবে!’

এ কথা বলেই তিনি ঝড়ের বেগে ছুটে গিয়ে কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ লিপ্ত হলেন । এক পর্যায়ে তিনিও শাহাদাতবরণ করলেন । তাঁর অবস্থা এমন হয়েছিল যে, তাকে চেনার কোন উপায় ছিল না । কারণ কাফিরদের অস্ত্রের আঘাতে তাঁর দেহ অক্ষত ছিল না । তাঁর হাতের আঙ্গুল দেখে তাঁর বোন তাকে সনাক্ত করেছিলেন । সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কেউ বিশ্বাস করেছিল রসূল আর নেই আবার কেউ বিশ্বাস করতে পারছিল না, আল্লাহর রসূলকে কাফিররা হত্যা করতে পারে ।

যারা বিশ্বাস করেছিল, তাঁরা জীবিত থাকার আশা ছেড়ে দিয়ে যুদ্ধ করছিল এবং আকুল দৃষ্টিতে নাবী কারীম ﷺ-এর চেহারা খুঁজে ফিরছিল । কা’ব ইবনে মালিক (রা.) সেই চেহারা দেখতে পেলেন । অদম্য আবেগে তিনি উচ্চকণ্ঠে বললেন, ‘হে নাবী আনুসারীরা! আল্লাহর নাবী আমাদের মাঝে আছেন!’ তাঁর কণ্ঠ শুনে সাহাবায়ে কেরাম ছুটে গেলেন আল্লাহর নাবীর কাছে । কাফির বাহিনীর মূল লক্ষ্যই ছিল আল্লাহর নাবীকে হত্যা করা । তারা যখন জানতে পারলো, নাবী এখনো জীবিত আছে, তখন নাবীর অবস্থানের দিকেই তারা আক্রমণ করলো তাঁকে হত্যা করার জন্য কুরাইশ বাহিনী সর্বশক্তি নিয়োগ করলো ।

চারদিক থেকে নাবী কারীম ﷺ-কে ঘেরাও করে কাফিরের দল আক্রমণ করলো । বৃষ্টির মতই অস্ত্র বর্ষিত হচ্ছিল । সাহাবায়ে কেরাম নাবী কারীম ﷺ -

কে নিজেদের মাঝে রেখে চারদিকে মানববন্ধন তৈরী করলেন। অস্ত্রের সমস্ত আঘাত এসে তাঁদের উপরেই নিপতিত হতে থাকলো। তাঁরা তাদের জীবনী শক্তির শেষ বিন্দু দিয়ে হলেও আল্লাহর নাবীকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন। একের পরে আরেকজন শাহাদাতের অমীয় সূধা পান করে জান্নাতের দিকে চলে যাচ্ছিলেন।

জিয়াদ (রা.) গুরুতর আহত হয়ে পড়ে গেলেন। তখন পর্যন্ত তাঁর দেহে প্রাণশক্তি অবশিষ্ট ছিল। আল্লাহর নাবীর আদেশে সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে ধরাধরি করে রসূল ﷺ -এর কাছে এনে শুইয়ে দিলেন। জিয়াদ আল্লাহর হাবিবের কাছে মুখ রেখে শাহাদাতবরণ করলেন। এই চরম দুর্যোগের মুখেও এক তরুণ সাহাবী খেজুর খাচ্ছিলেন। তিনি নাবী কারীম ﷺ -কে প্রশ্ন করলেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমি যদি এই মুহূর্তে আপনার জন্য প্রাণ দান করি তাহলে আমি কোথায় যাবো?’

আল্লাহর নাবী তাঁকে বললেন, ‘তুমি প্রাণ দান করলে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।’ রসূল ﷺ -এর মুখ থেকে এ কথা শোনার সাথে সাথে তিনি তরবারী হাতে ছুটে গেলেন। যুদ্ধ করতে করতে তাওহীদের এই বীর সেনানী শাহাদাতবরণ করলেন। চারদিক থেকেই অস্ত্র ছুটে আসছে। সমস্ত অস্ত্রের আঘাত এসে সাহাবায়ে কেরামের দেহে পড়ছে। সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের দেহকে ঢালের মতই ব্যবহার করছেন। তবুও কলিজার টুকরা নাবী কারীম ﷺ -কে অক্ষম রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন।

মক্কার জালিম আব্দুল্লাহ ইবনে কামিয়াহ সাহাবায়ে কেরামের বেষ্টনীর উপর দিয়ে দোজাহানের বাদশাহকে আঘাত করার জন্য বারবার তরবারীর আঘাত হানছে। তালহা (রা.) শূন্য হাতে তীক্ষ্ণধার তরবারীর আঘাত ফিরিয়ে দিচ্ছেন। এক পর্যায়ে তাঁর একটি হাত কেটে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। বেঁচে থাকার আর কোন আশা নেই, ঘাতকরা নাবী কারীম ﷺ -কে আঘাত করছে। আর করুণার সিন্ধু সেই চরম মুহূর্তেও মহান আল্লাহর কাছে ঘাতকদের জন্য বলেছেন, ‘রাবিগ্‌ফিরলি ক্বাওমি ফাইল্লাহুম লা ইয়া’লামুন-হে আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করুন, তারা যে কিছুই বুঝে না।’ সাহাবায়ে কেরাম রসূল ﷺ -কে পরিবেষ্টন করে আছেন। তাঁরা আবেদন করলেন, ‘ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনি মাথা উঁচু করবেন না। তীর এসে বিদ্ধ হতে পারে। যত তীর আসে আসুক, আমাদের বুক আছে। আমাদের বুক দিয়েই আমরা তীর প্রতিরোধ করবো।’

রসূল ﷺ যাদের কল্যাণের জন্য দু'আ করছেন, সেই জালিমের দলই রসূল ﷺ-কে হত্যা করার জন্য এগিয়ে এসে আঘাতের পরে আঘাত করছে। জালিম ইবনে কামিয়া তরবারী দিয়ে বিশ্বনাবী ﷺ-এর চেহারা আঘাত করলো। তার তরবারীর আঘাতে আল্লাহর নাবী ﷺ-এর মাথার লোহার শিরজ্ঞাণের দুটো কড়া ভেঙ্গে চেহারাতে প্রবেশ করলো। আল্লাহর নাবী ﷺ রক্তাক্ত হয়ে পড়লেন। তিনি করুণ কণ্ঠে আত্ননাদ করে বললেন, 'ঐ জাতি কি করে কল্যাণ লাভ করতে পারে, যারা তাদের নাবীকে আঘাত করে রক্তাক্ত করে দেয়, অথচ সে নাবী তাদেরকে আল্লাহর দিকেই আহ্বান করছে!' মহান আল্লাহ তাঁর নাবীর এই সামান্য আক্ষেপটুকুও পছন্দ করলেন না। সাথে সাথে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হলো। বলা হলো :

“হে নাবী! চূড়ান্তভাবে কোনো কিছুর ফায়সালা করার ক্ষমতা-ইখতিয়ারে তোমার কোনোই হাত নেই, আল্লাহরই ইখতিয়ারে রয়েছে, ইচ্ছা হলে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করবেন আর ইচ্ছা করলে শাস্তি দিবেন, কারণ তারা যালিম।”  
(সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১২৮)

সীরাতে ইবনে হিশামে উল্লেখ করা হয়েছে, কাফিরদের আঘাতে নাবী ﷺ-এর একটি দাঁত পরে গিয়েছিল। তাঁর চেহারা ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল। সে ক্ষত দিয়ে রক্ত ঝরছিল। আলী (রা.) তাঁর ঢাল ভর্তি করে পানি আনছিলেন আর ফাতিমা (রা.) প্রিয় পিতার ক্ষত ধুয়ে দিচ্ছিলেন। রক্ত যখন বন্ধ হলো না, তখন বিছানার একটি অংশ পুড়িয়ে তার ছাই ক্ষতস্থানে দেয়ার পরে রক্ত বন্ধ হয়েছিল।

### তাকওয়ার দৃষ্টান্ত :

আমরা উপরের ঘটনাগুলো থেকে যা দেখলাম এবং বুঝলাম, ইবরাহীম (আ.) এবং ইসমাইল (আ.)-এর তাকওয়ার পরীক্ষা, রসূল ﷺ-এর তিনটি বছর অমানবিক বন্দি জীবনযাপন, তায়েফের লোমহর্ষক নির্যাতনের ঘটনা, ওহূদের প্রাপ্তে নির্মম ঘটনা। এসবই তাকওয়ার প্রকৃত দৃষ্টান্ত। এগুলোর বাইরে ইসলাম নয়। প্রকৃত ইসলামের রূপ দেখতে হলে এই ধরণের ত্যাগ শিকার করতেই হবে। কোন রকম বাধা-বিপত্তি ছাড়াই ইসলাম প্রচার করে যাওয়া আসলে প্রকৃত ইসলামের দাওয়াত হতে পারে না। আমি মানুষকে দাওয়াত দিয়ে যাবো আর অপর পক্ষ থেকে কোন বাঁধা আসবে না তা হতে পারে না, ইসলামের ইতিহাস তা বলে না। তাই কেউ যদি সত্যিকার ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করে তাকে এই ধরণের পরীক্ষার সম্মুখীন হতেই হবে। হয়তো মাঝে মাঝে



জীবন-মরণ সমস্যা এসে হাজির হবে এবং সে জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে ।  
এবার দেখা যাক সাহাবাদের তাকওয়ার দৃষ্টান্ত ।

## সাহাবাদের (রা.) তাকওয়ার দৃষ্টান্ত

### নির্যাতনের শিকার বিলাল (রা.)

বিলাল (রা.) হাবশ দেশীয় একজন প্রখ্যাত সাহাবী ছিলেন । তিনি নাবী কারীম صلی اللہ علیہ وسلم -এর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ও মদীনার মসজিদে নববীর মুয়াজ্জিন ছিলেন । তিনি ছিলেন ক্রীতদাস । ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁর মুনিব উমাইয়া বিন খালফ তাঁকে নানাভাবে নির্যাতন করতে লাগলো । ইসলামের মহাশত্রু উমাইয়া নিজের ভৃত্য বিলালকে তাওহীদের বিশ্বাস থেকে ফিরানোর জন্য অমানুষিক ও নির্মম অত্যাচারের ব্যবস্থা করেছিল । দ্বিপ্রহরের ক্ষরতাপে অগ্নিস্নাত তপ্ত বালুকার উপর সে বিলালকে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে তাঁর বুকের উপর পাথর চাপা দিয়ে রাখত । যাতে করে তিনি একটুও নড়াচড়া করতে না পারেন । উপরে প্রচন্ড সূর্যোভাপ নিচে আগুনের মত বালু- এই ধরনের নিষ্ঠুর অত্যাচারের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল হয় তিনি মরে যাবেন নতুবা অসহ্য হয়ে ইসলাম ত্যাগ করবেন । কিন্তু দেখা গেল ওষ্ঠাগত প্রাণ তাকওয়াবান মুজাহিদ তখনও আল্লাহকে ভুলেননি’ মাঝে মাঝে চিৎকার করে বলে উঠতেন ‘আহাদ’ ‘আহাদ’ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা’বুদ নেই ।

তাঁকে ধারাবাহিকভাবে অত্যাচার করা হতো, কখনও আবু জাহিল, কখনও উমাইয়া, কখনও ইসলামের অন্য দুশমনরা এসে তাঁকে দৈহিক নির্যাতন করতো, রাতেও তাঁর শাস্তি ছিল না, যখন তাঁকে বেত মারা হতো, ফলে পূর্ব দিনের জখমগুলো রক্তাক্ত হয়ে উঠত, পুনরায় তাঁকে যখন আবার উত্তপ্ত বালুকার উপর শুইয়ে দেয়া হত তখন তাঁর ক্ষতস্থান থেকে রক্ত চর্বি গলে পড়তো । মাঝে মাঝে তাঁকে মক্কার দুষ্ট তরুণ দলের হাতে ন্যাস্ত করা হতো- তারা তাঁর গলায় রশি বেঁধে মক্কার রাজপথে সারা দিন টেনে-হেচড়ে বেড়াত । আবার সন্ধ্যায় তাঁকে মৃতপ্রায় অবস্থায় ফিরিয়ে আনতো, কিন্তু এত নিগ্রহের পরেও তিনি তাওহীদের বিশ্বাস থেকে বিন্দু পরিমাণ সরে আসেননি ।

নির্যাতনের ধারাবাহিকতায় একদিন আবুবকর সিদ্দিক (রা.) তাঁকে এ অবস্থায় দেখতে পেয়ে বিপুল পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়ে মুক্ত করে দেন । নাবী কারীম صلی اللہ علیہ وسلم তাঁকে মসজিদে নববীর মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করলেন । আল্লাহর

রসূল ﷺ -এর ইস্তিকালের পর বিলাল (রা.)-কে সফরের সরঞ্জামসহ কোথাও রওয়ানা হতে দেখে উমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, মনে হচ্ছে তুমি যেনো কোথাও চলে যাচ্ছে?

বিলাল বললেন, ‘উমর, যে মদীনায়ে রসূল ﷺ নেই, সেখানে আমার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। রসূল ﷺ শূন্য মদীনা আমার কাছে অসহনীয়। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কোনো দূর দেশে গিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদে লিপ্ত থেকে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো পার করে দেবো।’

বিলাল দামেশকে চলে গেলেন। দীর্ঘদিন পরে এক রাতে তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, রসূলের বিচ্ছেদ বেদনায় তিনি মদীনা ত্যাগ করেছেন, সেই রসূল স্বপ্নে তাঁকে বলছেন, হে বিলাল! তুমি আমার কাছে আর আসো না কেনো?

বিলালের ঘুম ভেঙ্গে গেলো। রসূলের বিচ্ছেদ বেদনা তাঁর মধ্যে পুনরায় নতুন করে জেগে উঠলো। মদীনায়ে গলে জীবিত রসূলকে তো দেখা যাবে না, কিন্তু আল্লাহর রসূল যে পথে হেঁটেছেন, সেই এবং সেই পথের ধূলি তো দেখা যাবে- যে ধূলিতে মিশে রয়েছে আল্লাহর রসূল ﷺ এর পায়ের স্পর্শ। মদীনায়ে যাবার জন্য তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন এবং দ্রুত বেগে তিনি মদীনার দিকে ছুটলেন।

মদীনায়ে বিলাল এসেছে- এ সংবাদ সকলেই জেনে গেলো। রসূলের মুয়াজ্জিন এখন মদীনায়ে, লোকজন দলে দলে এসে তাঁকে অনুরোধ করলো, বিলাল! আল্লাহর রসূল জীবিত থাকতে তুমি আযান দিয়েছো, আমরা আযান শোনামাত্র মসজিদে ছুটে এসে আল্লাহর নাবীর পেছনে কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছি। তুমি আজ আবার আযান দাও। আমাদের কাছে মনে হবে, আল্লাহর রসূল এখনো জীবিত আছেন! মসজিদে গলে আবার আমরা রসূলের পেছনে কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়াতে পারবো! দেখতে পাবো রসূল ﷺ এর চেহারা।

বিলাল (রা.) রাজী হলেন না, তিনি বললেন, ‘মদীনাবাসীরা তোমরা শোন, আমি যখন মসজিদে নববীর মিনারে উঠে আযানের মধ্যে বলতাম ‘আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ’ তখন আমার নজর পড়তো মিসরের উপর উপবিষ্ট নাবী করিম ﷺ -এর চেহারার প্রতি। কিন্তু আজকে আযান দিতে গিয়ে যখন আমার দৃষ্টি পড়বে মসজিদে নববীর মিসরের দিকে, তখন দেখবো মিসর শূন্য- সেখানে রসূল নেই। এই দৃশ্য তো আমি সহ্য করতে পারবো না।’ অবশেষে আল্লাহর রসূলের নাতী হাসান-হোসাইন (রা.)মের অনুরোধে বিলাল (রা.) উপেক্ষা করতে পারলেন না, তিনি মসজিদের মিনারে উঠে আযান দিতে

লাগলেন। দীর্ঘদিন পর বিলাল (রা.)র আযানের সুমধুর ধ্বনি মদীনাবাসীদের পাগল করে তুললো। রসূল হারানোর শোকে মদীনায়ে মাতম উঠলো। মদীনায়ে উঠলো কান্নার রোল।

বিলাল ‘আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ’ উচ্চারণ করছেন আর স্বভাব মতোই মিসরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তিনি দেখলেন, সেখানে প্রিয় রসূল নেই। নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলেন না। জ্ঞানহারা হয়ে পড়ে গেলেন। এরপর কিছুদিন তিনি মদীনায়ে অবস্থানের পর আবার মদীনা হতে চলে গেলেন। হিজরী বিশ সনের কাছাকাছি তিনি দামেশক নগরে ইন্তেকাল করেন।

### পরীক্ষার সম্মুখীন খাব্বাব (রা.)

যাঁরা দ্বীন ইসলামের জন্য নিজেদেরকে কুরবানী এবং আল্লাহর রাস্তায় কঠিনতম শাস্তি ভোগ করেছিলেন, খাব্বাব (রা.) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। প্রাথমিক স্তরের পাঁচ ছয় জনের ইসলাম গ্রহণের পর তিনি মুসলিম হন। সুতরাং তাঁকে যে কি ধরনের অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। তাঁর জীবনের পরিবর্তন অন্ত্যস্ত হৃদয়-বিদারক। তাঁর প্রতি কাফিরদের অত্যাচারের শেষ ছিল না। লৌহ জেরা পরিয়ে তাঁকে আরবের মরুভূমির প্রচণ্ড রোদে শায়িত করে রাখা হতো। রোদের তাপে তাঁর উত্তপ্ত বালুকাতে শয়ন করে রাখা হতো। উত্তাপে তাঁর কোমরের গোশত পর্যন্ত গলে যেত।

তিনি জনৈক স্ত্রী লোকের গোলাম ছিলেন। সেই স্ত্রী লোকটির নিকট যখন সংবাদ পৌঁছল যে, খাব্বাব মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাথে মিলিত হয়েছেন। তখন থেকে স্ত্রী লোকটি লোহার শলাকা গরম করে তাঁর মাথায় দাগ দিতে লাগল। এরপরেও খাব্বাব (রা.) কোনক্রমেই বিচলিত হচ্ছেন না দেখে একদিন কোরাইশ দলপতিগণ মাটিতে প্রজ্বলিত অংগার বিছিয়ে তার উপর তাঁকে চিৎ করে শায়িত করতো এবং কতিপয় পাষণ্ড তার বুকে পা দিয়ে চেপে ধরতো। অংগারগুলো তার পিঠের গোস্তু-চর্বি পুড়াতে পুড়াতে এক সময় নিভে যেত, তবুও নরাধমরা তাঁকে ছাড়ত না। খাব্বাব (রা.)র পিঠের চামড়া এমনভাবে পুড়ে গিয়েছিল যে, শেষ বয়স পর্যন্ত তার সমস্ত পিঠে ধবল কুষ্ঠের ন্যায় ঐ দাগের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। তিনি কর্মকার ছিলেন। তিনি জেরা, তরবারী ইত্যাদি প্রস্তুত করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ইসলাম গ্রহণের পর যে সকল লোকের নিকট তার সকল প্রাপ্য ছিল, কোরাইশদের নির্দেশমতে তা কেউই আর দেয়নি। উমর (রা.)র খিলাফতের সময় তিনি খাব্বাব (রা.)কে তাঁর প্রতি

ইসলাম বিরোধীদের নির্যাতন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাঁর পৃষ্ঠদেশ প্রদর্শন করলেন। উমর (রা.) তাঁর কোমর দেখে বললেন, এমন কোমর তো আর আমি কারো দেখিনি। খাব্বাব (রা.) বললেন, আমাকে আগুনের অঙ্গারে চেপে রাখা হতো। তাতে আমার রক্ত এবং চর্বি গলে আগুন নিভে যেত।’

মহান আল্লাহর রহমতে সাহাবায়ে কেরাম ও নাবী কারীম ﷺ-এর অসীম ত্যাগ ও কুরবানীর বিনিময়ে ইসলাম বিজয়ী হবার পরে ইসলামী সাম্রাজ্যে প্রাচুর্যতা দেখা দিয়েছিলো। প্রায় সাহাবায়ে কেরামই স্বচ্ছলতা লাভ করেন। খাব্বাব যখন রোগাক্রান্ত হয়েছিলেন, তখন কেউ কেউ তাঁকে বলেছিলেন, আপনি খুশী হন যে, ইন্তেকালের পরে আপনি আপনার সাথীদের সাথে হাউজে কাওসারের পাশে সাক্ষাৎ করবেন।

এ কথা শুনে তিনি কাঁদতে লাগলেন আর বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি মৃত্যুকে ভয় পাই না। তোমরা সেসব সাথীর কথা বলছো, যারা পৃথিবীতে কোনো প্রতিদান পায়নি। আখিরাতে তাঁরা অবশ্যই নিজেদের কর্মের প্রতিদান পাবে। কিন্তু আমরা পরে রয়েছি এবং দুনিয়ার নিয়ামতের অংশ এত পেয়েছি যে, ভয় হয় তা আমাদের আমলের সওয়াব হিসেবেই হিসাব না হয়ে যায়।

ইন্তেকালের কিছুক্ষণ পূর্বে তাঁর সামনে কাফন আনা হলো, তিনি কাফন দেখে অতীতে মুসলিমদের দুরাবস্থার কথা স্মরণ করে কঁদে কঁদে বলতে লাগলেন- এতো সম্পূর্ণ কাফন! আফসোস! হামাযা (রা.)-কে একটি ছোট ধরনের কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিলো। যেটি তাঁর সম্পূর্ণ শরীর আবৃত করার মতো ছিল না। তাঁর পা আবৃত করলে মাথা বের হয়ে যেতো আর মাথা আবৃত করলে পা বের হয়ে যেতো। পরিশেষে আমরা তাঁর পা ইযখির নামক ঘাস দিয়ে ঢেকে কাফনের কাজ সম্পন্ন করেছি।

৩৭ হিজরীতে খাব্বাব (রা.) ইন্তেকাল করেন। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তাঁকেই সর্বপ্রথম কুফায় দাফন করা হয়। আলী (রা.)র চোখে কুফা শহরের বাইরে সাতটি কবর পড়লো। তিনি সাথীদের কাছে জানতে চাইলেন, এসব কোন লোকজনের কবর! এখানে তো কোনো কবর ছিলো না!

তাঁকে বলা হলো, এই প্রথম কবরটি খাব্বাব বিন আরাতের। তাঁর ওসিয়ত অনুযায়ী সর্বপ্রথম তাঁকে এখানে দাফন করা হয়। অবশিষ্ট কবরগুলো অন্যদের। তাঁদের আত্মীয়-স্বজনরা তাঁদেরকে এখানে দাফন করেছে।

এ কথা শোনার সাথে সাথে আলী (রা.)র চোখ দুটো অশ্রু সজল হয়ে উঠলো। তিনি তাঁর কবরের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলতে লাগলেন, খাবাবের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। তিনি স্বেচ্ছায় ও আনন্দ চিত্তে আল্লাহর দীন কবুল করেছিলেন এবং নিজের ইচ্ছাতেই হিজরত করেছিলেন। সারাটি জীবন তিনি জিহাদে কাটিয়েছেন এবং ইসলামের জন্য অকল্পনীয় বিপদ সহ্য করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালার সৎ লোকদের আমল নষ্ট করেন না।

খাবাব ছিলেন সেই ব্যক্তি, যিনি ইতিহাসের পাতায় নিজের দৃঢ় সঙ্কল্প ও অবিচল-অটলতার এমন তুলনাহীন চিহ্ন এঁকেছেন যে, প্রত্যেক যুগের ঈমানদারদের জন্য তা চেতনার মশাল হয়ে রয়েছে। তিনি নিজের বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে জেনে বুঝে মুসলিম হন এবং হিজরত করেন। সারাটি জীবন জিহাদে অতিবাহিত করেন এবং যে কোনো ধরনের দুঃখ-কষ্ট হাসিমুখে বরণ করেন। যে ব্যক্তি কিয়ামতের কথা স্মরণে রাখে আখিরাতের জীবনে হিসাব দিতে হবে- এ কথা বিশ্বাস করে, তাঁর পক্ষে এই পৃথিবীতে ধন-সম্পদ অর্জনের জন্য হালাল পথে ছোট কাজ করা কোনোক্রমেই লজ্জার নয়। খাবাব (রা.) কর্মকারের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

### আম্মার (রা.)-এর প্রতি নির্ভরতা

আম্মার (রা.) ও তার মাতা-পিতা ইসলাম গ্রহণ করার পর ইসলামের দুশমনরা তাঁদের উপরে লোমহর্ষক নির্যাতন করতে থাকে। আরবের মরুভূমির উত্তপ্ত বালুর উপরে তাঁদেরকে শাস্তি দেয়া হতো। আঘাতের পর আঘাত করতো পাষন্ডের দল। আঘাত সহ্য করতে না পেরে তিনি অনেক সময় জ্ঞানহারী হয়ে যেতেন। তাঁর পাশ দিয়ে নাবী কারীম ﷺ যাবার সময় তাঁকে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ ও জান্নাতের সুসংবাদ দিতেন।

তাঁর পিতা ইয়াসির (রা.)কে ইসলামের দুশমনরা ধরে দুই পায়ে দুটো রশি বেঁধে তা দুটো উটের পায়ে বেঁধে দেয়া হলো। এরপর উট দুটিকে দুই দিকে যাবার জন্য আঘাত করা হলো। উট দুটো দুই দিকে দৌড় দেয়ার পরে ইয়াসিরের দেহ ছিঁড়ে দুই ভাগ হয়ে গেলো এবং তিনি তৎক্ষণাত শাহাদাতবরণ করলেন।

আম্মারকেও প্রহার করতে করতে অচেতন করে ফেলা হতো। তাঁর গর্ভধারিণী মা সুমাইয়া (রা.) দেখতেন- কিভাবে তাঁর কলিজার টুকরা সন্তানকে প্রহার করা হচ্ছে। সন্তান প্রসূত হচ্ছে আর তিনি উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করছেন, লা ইলাহা

ইব্রাহীম মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ। তাঁর মুখে কালিমার ঘোষণা শুনে নরপশু আবু জাহিল ক্রুদ্ধ হয়ে সুমাইয়াকে বর্শা বিদ্ধ করে হত্যা করলো। নারীদের মধ্যে সুমাইয়া (রা.)ই সর্বপ্রথম শাহাদাতবরণ করেন।

আম্মার (রা.) ইসলামের সর্বপ্রথম মসজিদ-মসজিদে কুবা নির্মাণে অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের সাথে ভূমিকা রাখেন। ইমাম হাকিম (রহ.) তাঁর মুসতাদরাক-এ উল্লেখ করেছেন যে, কুবা মসজিদ নির্মাণের জন্য আম্মারই পাথর একত্রিত করেছিলেন এবং মসজিদের মূল নির্মাণ কাজও তিনিই করেছিলেন। মদীনার মসজিদে নববী নির্মাণেও তিনি বিরাট ভূমিকা রাখেন।

তিনি যখন শাহাদাতবরণ করেন, তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো ৯০ বছরের অধিক। কেউ বলেছেন ৯৪ বছর। নাবী কারীম ﷺ তাঁর শাহাদাতের ব্যাপারে ভবিষ্যৎ বাণী করে বলেছিলেন, তোমার জীবনের সবশেষ চুমুক তুমি যা পান করবে তা হবে দুধ।

বয়স বেশীর কারণে মহাসত্যের জন্য লড়াই করতে গিয়ে যুদ্ধের ময়দানে তাঁকে কেউ-ই দুর্বল দেখেনি। তিনি অসীম সাহসিকতার ও বলিষ্ঠতার সাথে যুবক যোদ্ধার ন্যায় ময়দানে ভূমিকা পালন করেছেন। সেদিন যুদ্ধের ময়দানে প্রচণ্ড যুদ্ধ হচ্ছিলো। সূর্য তখন পশ্চিম আকাশের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছে। আম্মার (রা.) প্রবল পিপাসা অনুভব করলেন। সম্মুখে পেলেন দুধ, তাই তিনি পান করলেন। এরপর তাঁর মনে পড়লো আল্লাহর রসূলের ভবিষ্যৎ বাণীর কথা।

তিনি অনুভব করলেন, আজই তাঁর জীবনের শেষ দিন এবং এখুনি তিনি শাহাদাতাবরণ করবেন। তিনি নিজের মুখেই তাঁর সম্পর্কে আল্লাহর রসূলের বলা কথা বললেন, আল্লাহর রসূল বলেছেন, হে আম্মার! সবশেষে তুমি যা পান করবে তা হবে দুধ।

এ কথা বলতে বলতে তিনি শত্রু বাহিনীর দিকে প্রচণ্ড বেগে ধাবিত হলেন। সম্মুখে হাশিম (রা.)কে যুদ্ধের পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাঁকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন, হে হাশিম! সম্মুখে অগ্রসর হও! জান্নাত তরবারীর ছায়ার নীচে এবং মৃত্যু নেজার (এক ধরনের অস্ত্র) কিনারায় অবস্থান করে। জান্নাতের দরজা খোলা হয়েছে। আজ আমি বন্ধুদের সাথে মিলিত হবো। আজ আমি আমার বন্ধু মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর দলের সাথে মিলিত হবো। এ কথা বলতে বলতে তিনি শত্রু বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি যেকোনো যেতেন,

সেদিকের শত্রুসৈন্যের রণবুহ্য ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতো। যুদ্ধের ময়দানে তিনি এক সময় শাহাদাত বরণ করে এই পৃথিবী ত্যাগ করলেন।

## আবুযর গিফারী (রা.)-র তাকওয়া

আবুযর গিফারী (রা.) একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন। আলিম হিসেবেও তিনি যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। আলী (রা.) বলেন, আবুযর এমন গভীর বিদ্যা অর্জন করেছিলেন যে, যা অনেক লোকই আয়ত্ত্ব করতে অক্ষম। তিনি তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য কখনও কারো কাছে প্রদর্শন করতেন না, তিনি নিজের জ্ঞানের আলো বিনয় এবং নম্রতার আবরণ দিয়ে সর্বদাই ঢেকে রাখতেন।

তাঁর কাছে নাবী কারীম ﷺ-এর নবুয়াত প্রাপ্তির সংবাদ পৌঁছলে তিনি তার ভাইকে মক্কায় পাঠালেন। যিনি নবুয়াতের দাবী করছেন, যার কাছে ওহি আসে এবং যিনি আসমানের খবর পান, তিনি কেমন লোক, তার চরিত্র কেমন, তিনি কী কী কথা বলেন। তাঁর আচার ব্যবহার কেমন, তা জানার জন্য তাঁর ভাইকে পাঠিয়ে দিলেন।

তাঁর ভাই মক্কা থেকে ফিরে গিয়ে আবুযরকে বললেন, ‘আমি লোকটিকে সংকথা বলতে, সদাচার করতে এবং পবিত্রতা অর্জন করতে মানুষকে আদেশ দিতে শুনেছি। আমি তাঁর এমন একটি কথা শুনেছি যা কোন ভবিষ্যদ্বাণীও নয় বা কোন কবির বাক্যও নয়।’

ভাইয়ের কথায় আবুযরের মন শান্ত হল না। নিজে সব কিছু জানার জন্য তিনি মক্কা রওয়ানা হলেন এবং সেখানে উপস্থিত হয়ে সোজা কা’বা গৃহে প্রবেশ করলেন। তিনি নাবী কারীম ﷺ-কে চিনতে পারলেন না, অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা করাও সমীচীন মনে করলেন না।

সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি ঐ অবস্থায়ই থাকলেন। সন্ধ্যার পর আলী (রা.) দেখলেন যে, একজন বিদেশী মুসাফির মসজিদে অবস্থান করছেন। মুসাফিরদের তত্ত্বাবধান করার ভার তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল, কাজেই তিনি আবুযরকে ডেকে এনে নিজের বাড়ীতে খাওয়ালেন এবং রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করে দিলেন।

তিনি খাওয়া দাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়লেন নিজের পরিচয় এবং ভ্রমণের উদ্দেশ্য প্রকাশ করলেন না। সকালে উঠে তিনি আবার মসজিদে চলে গেলেন এবং সমস্ত দিন সেখানে রইলেন। সেদিনও তিনি আল্লাহর নাবীকে নিজেও

চিনতে পারলেন না বা কারো কাছে জিজ্ঞেসও করলেন না। সন্ধ্যার পর আলী (রা.) তাঁকে আবার নিজের বাড়ীতে নিয়ে যথারীতি অতিথি আপ্যায়ন করলেন; মুসাফির আজও নিজের পরিচয় গোপন রাখলেন এবং আলী (রা.)ও তাঁকে কোন কথা জিজ্ঞেস করলেন না।

ভোরে উঠে আবুযর পুনরায় মসজিদে চলে গেলেন, আজও তিনি নাবী করিম ﷺ -কে চিনতে পারলেন না এবং সেদিনও কাউকে জিজ্ঞেস করতে সাহস পেলেন না। আল্লাহর নাবীর সাথে মেলামেশা করা বা তাঁর সান্নিধ্য বা সাহচর্য সন্ধান করা সে সময় বিপজ্জনক ছিল, কারণ তাঁর সম্পর্কে জেনে কেউ যদি ইসলাম কবুল করে, সে জন্য কাফিররা মক্কায় নতুন আগন্তুকসহ সকলের প্রতি সর্বক দৃষ্টি রাখতো। ইসলামের প্রতি বা নাবী কারীম ﷺ -এর প্রতি কারও বিন্দুমাত্র অনুরাগ প্রকাশ পেলেই তার আর নিস্তার ছিল না; ইসলাম বিরোধীদের অত্যাচার ও নির্যাতনে ইসলামের প্রতি অনুরাগী লোকটিকে একেবারে জর্জরিত করে ফেলতো। আবুযর গিফারী (রা.) এ কারণেই নিজের পরিচয় গোপন করেছিলেন।

তৃতীয় দিনেও তাই ঘটলো, কিন্তু আলী (রা.) মুসাফিরকে আহ্বারাদি করিয়ে শোবার পূর্বে তাঁকে মক্কায় আসার উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করলেন। আবুযর (রা.) আলী (রা.)কে প্রথমে সঠিক সংবাদ বলার জন্য শপথ করিয়ে তারপর নিজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন।

আলী (রা.) তার কথা শুনে বললেন, ‘তিনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল। কাল সকালে আমি যখন মসজিদে রওয়ানা হবো তখন আপনিও আমাকে অনুসরণ করবেন। কিন্তু সাবধান, কেউ যেন জানতে না পারে যে আপনি আমার সঙ্গী। রাস্তায় যদি কোন শত্রু সামনে পড়ে, তাহলে আমি কোনো কারণ দেখিয়ে বা জুতার ফিতা বাঁধতে বসে পড়ব, আপনি তখন আমার জন্য অপেক্ষা না করে সোজা চলতে থাকবেন এবং এমনি করে বুঝিয়ে দিবেন যে আমি আপনার সঙ্গী নই বা আপনার ও আমার উদ্দেশ্য এক নয়।’

ভোরে উঠে আলী (রা.) মসজিদের দিকে যাত্রা করলেন, আবুযর গিফারী (রা.)ও তাঁর পিছে পিছে যেতে লাগলেন। যথাসময়ে নাবী কারীম ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর কথাবার্তা মনযোগ দিয়ে শুনলেন। সত্যাত্মক প্রাণ সত্যের আহবান শুনে কখনও স্থির থাকতে পারে না। আবুযর (রা.)র পিপাসিত প্রাণও



সত্যের পিয়ুষধারা পান করে এক মুহূর্তও স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি সেখানে বসেই ইসলাম গ্রহণ করে অমর জীবন লাভ করলেন।

অত্যাচার ও নির্যাতনের আশঙ্কা করে নাবী কারীম عليه السلام আবুযর (রা.)কে বললেন, ‘তুমি ইসলাম গ্রহণের কথা এখন গোপন করে রেখো এবং নিরবে বাড়ী চলে যাও। মুসলিমদের আরও একটু প্রতিপত্তি এবং শক্তি সামর্থ্য হলেই চলে এসো।’

আবুযর (রা.) বললেন, ‘ইয়া রসূলুল্লাহ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ আমি সেই আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আমি তাওহীদের মহাবাহী কাফিরদের মধ্যে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করবো।’

এ কথা বলেই তিনি তৎক্ষণাৎ কা’বা গৃহে প্রবেশ করে উচ্চস্বরে তাওহীদের কালেমা পাঠ করলেন। আর যায় কোথায়! চারদিক থেকে কাফিররা ভিমরুগলের মত উড়ে এসে তাঁর উপর বাঁপিয়ে পড়লো। আঘাতে আঘাতে আবুযর (রা.)র শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রক্তাক্ত হয়ে গেল। নিষ্ঠুর-নির্মম আঘাতে তিনি মুমূর্ষ হয়ে পড়লেন। ঐ সময় নাবী কারীম عليه السلام -এর চাচা আব্বাস, যদিও তিনি তখন পর্যন্ত মুসলিম হননি তবুও মুমূর্ষু আবুযরকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে গেলেন এবং আঘাতকারী লোকদের বললেন, কি সর্বনাশ! এ যে গিফারী গোত্রের লোক, শাম দেশের রাস্তাতেই যে তাদের বাসস্থান, এর মৃত্যু হলে যে ঐ দেশের সাথে তোমাদের সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্যই বন্ধ হয়ে যাবে। একে মেরে ফেললে তোমাদের সেখানে যাওয়ার আর কি কোন পথ থাকবে?

তাঁর কথায় ইসলামের শত্রুরা কিছুটা যেনো চমকে উঠলো এবং সেদিনের মতো তারা আবুযরের উপর অত্যাচার বন্ধ করলো। পরের দিনও আবুযর (রা.) কা’বা শরীফে প্রবেশ করে ঠিক পূর্বের ন্যায়ই কালেমা শাহাদাত পাঠ করলেন, সে দিনও কাফিররা তাঁকে চরম আঘাত করে মরণাপ্লা করে তুললো। এবারেও আব্বাস ইসলামের শত্রুকে বুঝিয়ে আবুযর (রা.)কে নির্যাতন থেকে রক্ষা করলেন।

এটাই সত্যিকার ঈমানদারের পরিচয়, তাকওয়ার পরিচয়। ভয় নেই, সঙ্কোচ নেই, আল্লাহর প্রেমিক, আল্লাহর পবিত্র নামের গুণকীর্তন ও পৃথিবীর বুকে তা প্রতিষ্ঠিত করতে, সর্বশ্রেণীর মানুষের সম্মুখে তা প্রচার করতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করেন না। এ কারণেই আবুযর (রা.) নিষেধ সত্ত্বেও দ্বিধাহীন চিত্তে কাফিরদের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আল্লাহর তাওহীদের ঘোষণা উচ্চারণ করতে

এতটুকুও শক্তি হননি। আবুযর ইসলাম গ্রহণ করেছেন, এ কথা কাফিররা জানলে তাঁর উপর নির্যাতন চালাবে, এ কারণে নাবী কারীম ﷺ তাঁকে নিজের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি গোপন রাখার উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে ঈমানের আশ্বিন এমনভাবে প্রজ্জ্বলিত হয়েছিলো এবং ঈমানের যে স্বাদ তিনি পেয়েছিলেন, তা আর গোপন রাখতে পারেননি। অন্যকেও ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করেছিলেন।

আবুযর (রা.) খানকায় বসে যিকির করার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেননি। ঈমানের সে স্বাদ তিনি লাভ করেছিলেন, সে ঈমানের দিকে অন্যকেও আহ্বান করার জন্যই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করলে এবং সে ঘোষণা কাবা চত্তরে ইসলামের দুশমনদের মধ্যে দাঁড়িয়ে দিলে কী হতে পারে, তা আবুযরের অজানা ছিলো না। তিনি কি পারতেন না, তার ইসলাম গ্রহণ করার কথা গোপন রাখতে! ইসলাম গ্রহণ করেই তিনি তো তাঁর নিজের এলাকায় চলে যেতে পারতেন!

কিন্তু তিনি এসবের কিছুই করেননি। তিনি যখন দেখলেন, আল্লাহর রসূলের প্রতি এসব লোক কি ধরনের অত্যাচার করছে। আর সেই রসূলের হাতে হাত রেখেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। সুতরাং আল্লাহর নাবী যদি নির্যাতন সহ্য করতে পারেন, তাহলে তিনি সেই নাবীর অনুসারী হয়ে কেনো নির্যাতন সহ্য করতে পারবেন না!

তিনি যখন কালিমা পাঠ করছেন, সেই কালেমা তাঁর মধ্যে ঈমানের যে শক্তিদান করেছে, সেই শক্তিতেই তিনি শত্রুদের সম্মুখে মহাসত্যের ঘোষণা দিতে উদ্ধুদ্ধ হয়েছিলেন।

কালিমা শাহাদাত এক অদ্ভুত ইন্দ্রজাল, ঐকান্তিকভাবে তা একবার পাঠ করলে মানুষের মনে যে শক্তির বন্যা আসে, তার সম্মুখে জগতের অত্যাচার আর নির্মম নির্যাতন তৃণ-খণ্ডের মত ভেঙ্গে যায়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলিমরা বিজয়ী হয়েছিলো ঈমানী শক্তির কারণেই, তাকওয়ার গভীরতার কারণেই। ঈমানী শক্তির কাছে সংখ্যা গরিষ্ঠ কাফিররা মুষ্টিমেয় সাহাবায়ে কেরামের কাছে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। যে ব্যক্তি নিজের সবকিছু মহান আল্লাহর জন্য ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়, সেই ব্যক্তি পৃথিবীর কোনো শক্তির সম্মুখে মাথানত করতে পারে না। এই ধরনের মুসলিমদের একটি দলের সম্মুখে দুনিয়ার ইসলাম

বিরোধী শক্তি মুহূর্তকালের জন্যও টিকে থাকতে পারে না। আজ মুসলিমদের ঈমানী শক্তি নেই, এ কারণেই তারা দুনিয়া জুড়ে নির্যাতিত হচ্ছে।

### সোহায়েব (রা.)-র ত্যাগ

সোহায়েব (রা.) ও আম্মার (রা.) একত্রে ইসলাম কবুল করে মুসলিম হয়েছিলেন। তাঁদের ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি ছিলো এমন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ সে সময় আরকাম (রা.)র বাড়ীতে অবস্থান করছিলেন। তাঁরা দুইজন পৃথক পৃথক সময়ে নাবী কারীম ﷺ-এর কাছে হাযির হলেন এবং বাড়ীর দরজার সম্মুখে উভয়ের সাক্ষাৎ হলো। কিছু কথাবার্তার পরে উভয়ে জানতে পারলো যে, তাঁদের দু'জনেরই উদ্দেশ্য এক। দু'জনই নাবী কারীম ﷺ-এর সাক্ষাৎ করে ইসলাম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক।

বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করে তারা যথারীতি ইসলাম গ্রহণ করলেন। সে সময় ইসলাম গ্রহণ করার অর্থই ছিলো স্বেচ্ছায় নির্যাতন-নিষ্পেষণ ডেকে আনা। তাঁরাও এর ব্যতীক্রম ছিলেন না, নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁরা উভয়ে মক্কা থেকে হিজরত করার সঙ্কল্প করলেন। কিন্তু ইসলামের শত্রুদের এটাও সহ্য হলো না। তাঁরা মক্কার বাইরে স্বাধীনভাবে ইসলাম পালন করবে, এটা কাফিরদের কাছে এক অসহনীয় ব্যাপার। কোনো মুসলিম হিজরত করবে, এ সংবাদ জানতে পারলে কাফিররা নির্যাতনের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিতো।

সুতরাং সোহায়েব (রা.) হিজরত করবেন, এটা জানতে পেরেও কাফিররা তার পিছু লেগে গেল। একদল কাফির অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাকে ধরতে গেল। তিনি তখন তুনির হতে তীর বের করে রাখতে লাগলেন এবং বললেন, 'শোন তোমরা জানো যে আমি তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তীরন্দায। আমার হাতে একটি তীর থাকা পর্যন্ত তোমরা কেউ-ই আমার কাছে আসতে পারবে না। তীর ফুরিয়ে গেলে তরবারীর সাহায্য নেব এবং যতক্ষণ তরবারী হাতে থাকবে, ততক্ষণ কেউই আমার কাছে আসতে পারবে না। তারপর তরবারী কোনক্রমে আমার হাত ছাড়া হয়ে গেলে তোমরা আমাকে যা খুশী করতে পারো। এ কারণে তোমাদের কাছে আমি একটি প্রস্তাব দিচ্ছি, তোমরা যদি আমার প্রাণের পরিবর্তে আমার সম্পদ গ্রহণ করো তাহলে তোমাদেরকে আমার সম্পদের সন্ধান বলে দিতে পারি।

সম্পদ লোভী দুশমনের দল তাঁর প্রস্তাবে রাজি হলে তিনি বলে দিলেন যে, তাঁর সম্পদ কোথায় রয়েছে। এভাবেই সোহায়েব (রা.) নিজের সম্পদ দিয়ে নিজেকে কিছুটা হলেও বিপদ মুক্ত করেছিলেন। নাবী কারীম ﷺ তখন কা'বাত্তে অবস্থান করছিলেন, সোহায়েব (রা.)র অবস্থা সম্পর্কে জানতে পেরে তিনি বললেন, 'বড় লাভের ব্যবসাই করলে সোহায়েব।' সোহায়েব (রা.) বললেন, নাবী কারীম ﷺ তখন খেজুর খাচ্ছিলেন এবং আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন তা দেখে আমি তার সাথে খেতে বসে পড়লাম। তখন আল্লাহর নাবী বললেন, 'চোখের রোগে ভুগছো আবার খেজুরও খাচ্ছে। দেখছ কেমন করে!'

সোহায়েব (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! যে চোখটি ভালো সেটি দিয়ে দেখে খাচ্ছি। সোহায়েবের কথা শুনে নাবী কারীম ﷺ -এর মুখে মধুর হাসি ফুটে উঠলো। সোহায়েব (রা.) খুব অমিতব্যয়ী ছিলেন। তিনি অধিক খরচ করতেন। একদিন উমর (রা.) তাঁকে বলেছিলেন, তুমি খুব বেশী অনর্থক খরচ করো। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আমি অন্যায়ভাবে একটি পয়সাও খরচ করি না। উমর (রা.)র শাহাদাতবণের সময় উপস্থিত হলে তিনি সোহায়েব (রা.)কে তার জানাযার আদায়ের জন্য অসিয়াত করে গিয়েছিলেন।

### খুবাইব (রা.)-র তাকওয়ায় পরীক্ষা

রসূলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশে গোয়েন্দা কাজে বের হয়ে খুবাইব রাদিআল্লাহু আনহু কাফেরদের হাতে বন্দী হন। তিনি বদর যুদ্ধে হারিছ ইবনু আমিরকে হত্যা করেছিলেন বিধায় তার পুত্ররা বদলা নেয়ার জন্য তাঁকে ক্রয় করে নেয়। একদিন তারা খুবাইবকে হত্যা করার জন্য হারাম শরীফের সীমানার বাইরে নিয়ে যায়। তখন খুবাইব রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, আমাকে দু'রাক'আত সলাত আদায় করার সুযোগ দাও। তারা সুযোগ দিলে তিনি দু'রাক'আত সলাত আদায় করে বলেন, 'আল্লাহর কসম! আমি মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছি, তোমরা এ কথা না ভাবলে আমি সলাত আরো দীর্ঘায়িত করতাম'। অতঃপর দু'আ করেন 'হে আল্লাহ! তাদেরকে এক এক করে গুণে রাখ, তাদেরকে বিক্ষিপ্তভাবে হত্যা করো এবং তাদের একজনকেও বাকী রেখ না'। তারপর তিনি আবৃত্তি করেন :

আমাকে যখন একজন মুসলিম হিসেবে হত্যা করা হয় তখন আমি কোন কিছুকেই পরোয়া করি না। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে যেকোন অবস্থাতেই আমার মৃত্যু হোক তা যেহেতু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, তিনি ইচ্ছা

করলে আমার কর্তিত অঙ্গে বরকত প্রদান করবেন। এরপর হারিছের পুত্র সারুআ উকবা তাঁর দিকে দাঁড়াল এবং তাঁকে শহীদ করে দিল।

কতই না দুর্ভেদ্য ও সুগভীর তাদের আল্লাহ ভীরুতা! স্থির হয়ে দু'রাক'আত সলাত আদায় করলেন, তাদের সামনে তাদেরই বিরুদ্ধে দু'আ করলেন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিতে পেরে সৌভাগ্যবান মনে করে প্রবোধ লাভ করলেন। সাক্ষাৎ মৃত্যুর কথা ভেবে এতটুকুও ঘর্মাক্ত হননি তিনি।

### মুয়াবিজ ও মুয়াজ (রা.)-র ত্যাগ

ইসলামের কঠোর শত্রু এবং মক্কায় অবস্থানের সময় নাবী কারীম ﷺ কে সবচেয়ে বেশী কষ্ট দিয়েছে আবু জাহিল। মদীনায এ কথা এমনভাবে প্রচারিত হয়েছিল যে, মদীনার একজন মুসলিম শিশুও তার নাম জানতো। মদীনার আনসারদের দুই কিশোর সন্তান, মুয়াবিজ (রা.) ও মুয়াজ (রা.), তাঁরা ছিলেন আপন দুই ভাই। এই দুই ভাই প্রতীজ্ঞা করেছিল, রসূলকে যে ব্যক্তি বেশী কষ্ট দিয়েছে, সেই আবু জাহিলকে তাঁরা হত্যা করবে আর না হয় তাঁরা শাহাদাতবরণ করবে। বুখারী হাদীসের কিতাবুল মাগাযীতে বদরের যুদ্ধের দিনের কথা এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) বলেন, 'আমি এক সারিতে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার দু'পাশে ছিল কিশোর দু'টি ছেলে। আমার কেমন যেন বিব্রত বোধ হচ্ছিল, আমার দুই পাশে দুটি কিশোর ছেলে, বয়স্ক কোন বীর নেই! এক পাশের একজন আমার কানের কাছে মুখ এনে জানতে চাইলো, আবু জাহিল লোকটি কে? অপর পাশের কিশোরটিও আবু জাহিলের পরিচয় জানতে চাইলো। তখন আমার জড়তার ভাব কেটে গেল। আমার মনে হলো, আমি দুইজন বীরের মাঝেই দাঁড়িয়ে আছি।'

আব্দুর রহমান (রা.) বলেন, 'আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আবু জাহিলকে তোমাদের কী প্রয়োজন?' তাঁরা জানালো, 'আমরা আল্লাহর কাছে ওয়াদা করেছি, আবু জাহিলকে হত্যা করবো অথবা শাহাদাতবরণ করবো।' এরপর আব্দুর রহমান (রা.) তাদের দুই ভাইকে ইশারা দিয়ে দেখিয়ে দিলেন আবু জাহিলকে। আবু জাহিলকে দেখার সাথে সাথে দুই ভাই তীর বেগে ছুটে গেল তার কাছে। তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়লো আল্লাহর শত্রুর উপরে। আবু জাহিল মাটিতে পড়ে গেল। তাকে রক্ষার জন্য তার ছেলে দ্রুত এগিয়ে এসে তরবারীর আঘাত করলো। ময়াজ (রা.)র বাম হাতটি এমনভাবে কেটে গেল যে, সে কাটা হাতটি কাঁধের সাথে ঝুলতে লাগলো।

এই ঝুলন্ত হাত নিয়ে কিশোর এই সাহাবী আবু জাহিলের ছেলের সাথে যুদ্ধ করে তাকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করলেন। ঝুলন্ত হাত যুদ্ধ করতে অসুবিধার সৃষ্টি করছিল। কিশোর সাহাবী মায়াজ (রা.) তাঁর ঝুলন্ত হাত পায়ের নীচে ফেলে আল্লাহ্ আকবার বলে গর্জন করে একটানে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে স্বচ্ছন্দে যুদ্ধ করতে থাকলেন। এই দুই সিংহ সাবক ছিলেন আফরা নামক এক বীরঙ্গনা নারীর সন্তান।

বদরের প্রান্তরে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলিমদেরকে বিজয়দান করার পরে নাবী কারীম ﷺ তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে বললেন, ‘এমন কেউ আছে কি, যে ব্যক্তি আবু জাহিলের পরিণতি দেখে আসবে? আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) দ্রুত ছুটে গেলেন যুদ্ধের ময়দানে। তিনি দেখলেন, মৃতদেহের মধ্যে আবু জাহিল মারাত্মক আহত অবস্থায় পড়ে আছে। ঘনঘন নিশ্বাস ছাড়ছে আল্লাহর এই দুশমন। বুখারী হাদীস বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) আবু জাহিলের দাড়ি ধরে জানতে চাইলেন, ‘তুমিই কি আবু জাহিল?’

আল্লাহর দুশমন জবাব দিল, ‘সেই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম আর কে আছে, যাকে তার বংশের লোকজন হত্যা করলো।’ কোন একদিন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)কে আবু জাহিল থাপ্পড় মেরেছিল। সে কথা আব্দুল্লাহর স্মরণে ছিল। তিনি আবু জাহিলের ঘাড়ে পা রাখলেন। আবু জাহিল বললো, ‘এই ছাগলের রাখাল! দেখ তুই কোথায় তোর পা রেখেছিস?’

এরপর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ইসলামের এই শত্রুর মাথা তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। তারপর সে মাথা আল্লাহর রসূলের সামনে এনেছিলেন। তিনি বলেন, ‘আফরার দুই সন্তান আবু জাহিলকে মারাত্মকভাবে আহত করে ফেলে রেখেছিল। আমারও প্রতিজ্ঞা ছিল আমি তাকে হত্যা করবো। আমি তার মাথা কেটে আল্লাহর নাবীর সামনে এনে বললাম, হে আল্লাহর রসূল! এটা আল্লাহর দুশমন আবু জাহিলের মাথা।’

নাবী কারীম ﷺ যেন বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, ‘সত্যি কি এটা আবু জাহিলের মাথা!’ আমি বললাম, ‘আল্লাহর কসম, এটা আবু জাহিলের মাথা।’ এরপর নাবী কারীম ﷺ কুরাইশ নেতৃবৃন্দের লাশ কুয়ায় নিক্ষেপ করতে আদেশ করেছিলেন। তিনি গভীর রাতে সেই কুয়ার পাশে দাঁড়িয়ে নিহত কাফির নেতৃবৃন্দের নাম ধরে ডেকে ডেকে বলছিলেন, ‘আল্লাহ তোমাদের সাথে যে

প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা তোমরা যথাযথভাবে লাভ করেছে। আমিও আমার রবের প্রতিশ্রুতি বাস্তবে লাভ করেছি।’

### খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)-র ত্যাগ

কুরাইশদের মধ্যে সম্মানিত গোষ্ঠীর সন্তান ছিলেন খালিদ (রা.)। তাঁর গোটা বংশই ছিল আরবের সেনা পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত। অর্থাৎ তিনি এমন এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যারা সবাই সামরিক বাহিনীর লোক ছিল। তাঁর রক্তের মধ্যে মিশ্রিত ছিল সামরিক বাহিনীর সমর কৌশল। হৃদয়বিয়ার সন্ধির পরে মক্কা বিজয়ের পূর্বেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। আমার ইবনুল আ'স (রা.) সম্পর্কে কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে, তিনি হাবশাতেই বাদশাহর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আবার কোন বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি হাবশা থেকে মদীনায় রসূলের কাছে যাচ্ছিলেন ইসলাম গ্রহণ করার জন্য। পথে তিনি মদীনা যাত্রী একদল লোককে দেখতে পেলেন। তাদের মধ্যে খালিদ (রা.) ছিলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘হে খালিদ! কোন দিকে যাচ্ছে?’

তিনি কোন ধরনের জড়তা ব্যতীতই বললেন, ‘আল্লাহর কসম! আমার দৃঢ় বিশ্বাস মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রসূল। আর কতদিন এভাবে থাকবো। চলো যাই তাঁর কাছে, ইসলাম গ্রহণ করি।’ তারপর তাঁরা মদীনায় আল্লাহর নাবীর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে প্রথমে খালিদ ও পরে আমার ইসলাম গ্রহণ করেন। খালিদ (রা.) বলেন, ইসলাম গ্রহণ করার পরে আল্লাহর নাবী আমাকে বলেছিলেন, ‘আমি তোমার ভেতরে যে যোগ্যতা দেখতাম, তাতে আমি আশাবাদী ছিলাম তুমি একদিন কল্যাণ লাভ করবে।’

খালিদ (রা.) ইসলাম গ্রহণ করার পরে তাঁর মধ্যে অতীত ভুলের জন্য অনুশোচনা জাগলো। তিনি আল্লাহর নাবীর কাছে আবেদন করলেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর পথে আমি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে যে গোনাহ করেছি, এ কারণে আমার জন্য দু’আ করুন।’ নাবী কারীম ﷺ বললেন, ইসলাম অতীতের সমস্ত পাপ মুছে দেয়।’

খালিদ (রা.) বললেন, ‘আপনার এই কথার উপরে আমি বাইয়াত গ্রহণ করলাম। রসূল ﷺ আল্লাহর কাছে দু’আ করলেন, ‘আমার আল্লাহ! খালিদ তোমার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে যে পাপ করেছে, তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও!’

ইসলাম গ্রহণের পূর্বেও তিনি ছিলেন মক্কার কুরাইশদের জেনারেল, ইসলাম গ্রহণের পরে মুসলিম হিসেবে তাঁর জীবনের প্রথম যুদ্ধেই ঘটনাচক্রে তাঁকেই জেনারেলের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল। মুসলিম হিসেবে তাঁর প্রথম যুদ্ধ ছিল মুতার যুদ্ধ। এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিল মাত্র দুই হাজার আর রোমান বাহিনীর সংখ্যা ছিল দুই লক্ষ। নাবী কারীম عليه السلام এই যুদ্ধে পরপর তিনজনের নাম সেনাপতি হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। যায়িদ, জাফর ও আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহ তা'য়ালা আনহুম। এই তিনজনের কথা রসূল عليه السلام এভাবে বলেছিলেন যে, প্রথমজন শাহাদাত বরণ করলে দ্বিতীয় জন সেনাপতি হবে। তিনিও শাহাদাতবরণ করলে তৃতীয়জন সেনাপতি হবে। তিনিও শাহাদাতবরণ করলে মুসলিমরা যাকে ইচ্ছা সেনাপতি নিয়োগ করবে।

মুতার যুদ্ধে তিনজন সেনাপতির অধীনে খালিদ জেনারেলের সমস্ত অহংকার বিসর্জন দিয়ে একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন। পরপর তিনজনই যখন শাহাদাতবরণ করলেন, তখন সাবিত ইবনে আকরাম (রা.) যুদ্ধের পতাকা উঠিয়ে নিলেন- যেন মুসলিম বাহিনীর মধ্যে কোন ধরণের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়। পতাকা হাতে তিনি খালিদ (রা.)-র কাছে এসে বললেন, ‘হে খালিদ! এই পতাকা তুমি ধরো।’

দুই লক্ষের বিরুদ্ধে মাত্র দুই হাজার সৈন্য এবং এই দুই হাজারের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যা বেশী। বদর, ওহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরাম এই বাহিনীতে शामिल হয়েছেন। তাদের উপরে নও মুসলিম খালিদের নেতৃত্ব দেবার যে কোন অধিকার নেই এ কথা খালিদের থেকে আর কে ভালো বুঝতো! তিনি আপত্তি জানিয়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে বললেন, ‘অসম্ভব! আমি এ পতাকা গ্রহণ করতে পারি না। আপনি আমার থেকে বয়সে অনেক বড়। আপনি বদর-ওহুদে অংশগ্রহণ করেছেন। আপনিই এই পতাকার যোগ্যতম ব্যক্তি।’

সাবিত (রা.) বললেন, ‘আমি এই পতাকা তোমার জন্যই উঠিয়ে এনেছি। আমার তুলনায় তোমার মধ্যে সামরিক যোগ্যতা অনেক বেশী। তুমি এ পতাকা ধরো।’ এবার সাবিত (রা.) মুসলিম বাহিনীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘তোমরা কি খালিদের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে রাজি আছো?’ সমবেত বাহিনী সম্মতি জানিয়ে বলেছিল, ‘অবশ্যই আমরা রাজি আছি।’



খালিদ (রা.) জেনারেলের দায়িত্ব গ্রহণ করার পরে দুই হাজার মুসলিম বাহিনী দুই লক্ষের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিল। তিনি বলেন, ‘সেদিনের যুদ্ধে আমার হাতে সাতটি তরবারী ভেঙ্গেছিল। সর্বশেষে একটি ইয়েমেনী তরবারী টিকে ছিল।’

আল্লাহর নাবী খালিদের উপাধি দান করেছিলেন, সাইফুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর তরবারী। তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যেমন ছিলেন ইসলামের কটুর শত্রু, তেমনি ইসলাম গ্রহণ করার পরে হয়েছিলেন ইসলামের পরম বন্ধু।

মক্কায় বিভিন্ন গোত্রের উপরে বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পিত ছিল এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আমার ইবনুল আস (রা.)র গোত্র ছিল মক্কার সেই বিখ্যাত গোত্র, যে গোত্র মক্কার ঝগড়া বিবাদে মিমাতসা করতো। তাঁর গোত্রের নাম ছিল বনী সাহম। মক্কার যে তিনজন লোক ছিল ইসলামের প্রধান শত্রু, আমার ছিলেন তাদের একজন। তিনিই ইসলাম গ্রহণ করে হলেন ইসলামের মহাসেনা নায়ক, আরবের শ্রেষ্ঠ কৌশলী কূটনীতিক ও মিশরবাসীর মুক্তিদাতা।

মুসলিমদের প্রথম যে দলটি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন, তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য আমার গিয়েছিলেন। তিনিই অমুসলিম অবস্থায় আবিসিনিয়ার বাদশাহকে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্ষেপানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। খন্দকের যুদ্ধে এসেই আমার ভেতরে ইসলাম সম্পর্কে ভাবান্তর সৃষ্টি হয়েছিল।

তিনি স্বয়ং বলেন, ‘ইসলামের আহবান সম্পর্কে আমি ভাবতে থাকি। তারপর এক পর্যায়ে আমার কাছে ইসলামের মূল সত্য স্পষ্ট হতে থাকে। তারপর আমি মুসলিমদের বিরোধিতা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিলাম। কুরাইশ নেতারা আমার মনের অবস্থা অনুভব করতে পেরে আমার কাছে একজন লোক পাঠিয়েছিল। সে আমার সাথে তর্ক-বিতর্ক শুরু করলো। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, বলতে পারো, আমরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না রোমান পারসিকরা?’

লোকটি জবাব দিল, ‘আমরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।’ আমি তাকে পুনরায় প্রশ্ন করলাম, ‘সুখ সম্পদ এবং ধন-ঐশ্বর্যের অধিকারী আমরা না তারা?’ লোকটি জবাব দিয়েছিল, ‘তরাই সুখ-সম্পদ এবং ধন-ঐশ্বর্যের অধিকারী।’

আমি তাকে বললাম, ‘বর্তমান জীবনের শেষে ইন্তেকালের পরে যদি কোন জীবন থেকে থাকে, তাহলে আমাদের এই সত্য কোন কাজে লাগলো? এই পৃথিবীতে আমাদের সত্য আমাদের দুর্দশা দূর করতে সক্ষম হলো না, তাহলে পরকালে

আমাদের কোন কল্যাণ লাভের কোন আশাই নেই। সুতরাং মুহাম্মাদ ﷺ যে বলেন, মৃত্যুর পরে আরেকটি জীবন আছে এবং সে জীবনে মানুষ তার কর্ম অনুযায়ী ফল লাভ করবে, একথা অত্যন্ত যুক্ত সংগত বলেই আমার কাছে মনে হয়।’

তিনি আরো বলেন, ‘খন্দকের যুদ্ধ থেকে ফিরেই আমি আমার আত্মীয়-স্বজনদের বলেছিলাম, একটি কথা তোমরা জেনে রেখো, মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রচারিত আদর্শ বিজয়ী হবার জন্যই এসেছে। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এ সম্পর্কে আমার পরামর্শ হলো, চলো আমরা আবিসিনিয়ায় বাদশাহর দরবারে চলে যাই। মুহাম্মাদ ﷺ যদি বিজয়ী হয় তাহলে আমরা আর ফিরবো না। আমরা আবিসিনিয়ায় বাদশাহর দরবারে চলে গেলাম।’

সেখানে ঘটনার এক পর্যায়ে বাদশাহ তাঁকে নাবী কারীম ﷺ সম্পর্কে বুঝালেন। তাঁর চিন্তার জগতে বিপ্লব ঘটে গেল। তিনি বাদশাহর সামনেই ইসলামের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করলেন। তারপরই তিনি মদীনার পথে যাত্রা করলেন। পথে খালিদের সাথে দেখা এবং কথা হলো। তারপর তাঁরা আল্লাহর নাবীর সামনে উপস্থিত হলেন। আমর (রা.) বলেন, ‘আমাদেরকে দেখেই নাবী কারীম ﷺ-এর চেহারা আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। তিনি উপস্থিত মুসলিমদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, লাকাদ রামাত কুম মাককাহ বিফালাজাতি আকবাদিহা-মক্কা তার মূল্যবান অংশসমূহ তোমাদের প্রতি ছুড়ে দিয়েছে।’

খালিদ বিন ওয়ালিদ ইসলাম কবুল করে যে কথা বলেছিলেন, আমরাও অনুশোচনা করে একই কথা বললেন। আল্লাহর নাবী বললেন, ‘ইসলাম অতীতের সমস্ত গোনাহ মুছে দেয় এবং হিজরতও সমস্ত গোনাহ মুছে দেয়।’ আরব উপদ্বীপে অধিকাংশ গোত্র মক্কা বিজয়ের পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কোন কোন গোত্র ইসলাম গ্রহণ করার পরেও তাদের শতাব্দী সঞ্চিত কুসংস্কার ত্যাগ করতে পারেনি। তাঁরা মূর্তির আখড়া উৎখাত করতে ভয় পাচ্ছিল। এ কারণে নাবী ﷺ বিভিন্ন এলাকার নও মুসলিমদের কাছে সাহাবাদেরকে প্রেরণ করেছিলেন। তাঁরা মূর্তির আখড়া উৎখাত করতে সহযোগীতা করতেন।

## সাহাবীদের জীবনী থেকে তাকওয়ার শিক্ষা

তাকওয়া এমন এক অদৃশ্য শক্তি, যার স্পর্শে মানুষ নিজের প্রতিটি সময়, যাবতীয় শ্রম, সকল পদক্ষেপ, সমস্ত পরিকল্পনা, সর্বপ্রকার কষ্ট এমনকি অবশেষে সুন্দর পৃথিবীর সুখী জীবনের সমাধি রচনা করে পরকালমুখী হতে

কুণ্ঠিত হয় না। তাকওয়া এমন এক শক্তি, যার ফলে আজকের এই মূর্খতার যুগেও গুটিকতক বনু আদমের বক্ষপিঞ্জরে প্রশান্তির মৃদু সমীরণ প্রবাহিত হয়। ইসলামের জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত যে সমস্ত মনীষীর জীবন-কাহিনী ইতিহাসের পাতায় এসেছে তাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন আল্লাহভীতির এক একজন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এসব ঘটনাবলী মুসলিম উম্মাহকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেছে। যুগিয়েছে আল্লাহর পথে কাজ করে যাওয়ার অদম্য মনোবল। আর ইতিহাসকে করেছে সুশোভিত ও চিত্তাকর্ষক।

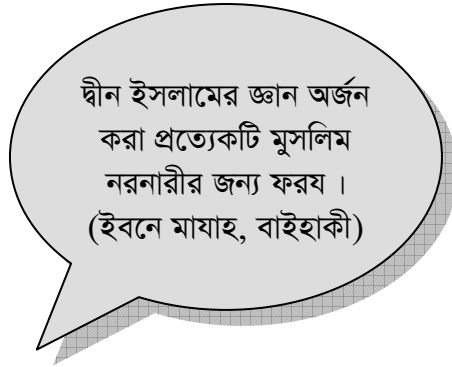
## এই বই থেকে আমাদের শিক্ষা ও করণীয়

### জীবনে সফলতা অর্জনের জন্য মূল চাবিকাঠি (Master Key)

১. দ্বীন ইসলামের উপর সহীহ সূত্র (authentic source) থেকে নিয়মিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং মনোভাবটা এমন রাখতে হবে যে আমি সবার চেয়ে কম জানি। এবং সকল প্রকার বিতর্ক এড়িয়ে চলি।
২. আমি যা জানি তা একদিকে রেখে তার পাশাপাশি পড়াশোনা করতে হবে।
৩. কুরআন ও সহীহ হাদীসে যা নেই তা থেকে আশ্তে আশ্তে বের হয়ে আসি।
৪. সংঘবদ্ধ জীবনযাপন বা জামাতবদ্ধ জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত হতে হবে।
৫. অমুসলিমদের মাঝে নিয়মিত দ্বীন ইসলামের দাওয়াতী কাজ করতে হবে এবং মুসলিমদেরকে সঠিক পথের দিশা দিতে হবে।
৬. ঈমানের উপর স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তুলতে হবে অর্থাৎ আংশিক বা ভুল ঈমান থেকে বের হয়ে আসতে হবে।
৭. দ্বীন ইসলামের সঠিক জ্ঞান ও উপলব্ধি অর্থাৎ knowledge and understanding develop করতে হবে।
৮. পার্থিব স্বার্থ ছাড়া এবং লোক দেখানো ব্যতীত ‘ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ’ অর্থাৎ আল্লাহর পথে নিয়মিত ব্যয় করতে হবে।
৯. ফযরের সলাতসহ পাঁচ ওয়াক্ত সলাত নিয়মিত জামাতের সাথে পড়ার চেষ্টা করতে হবে।
১০. সমস্ত কাজকর্ম করতে হবে শুধু মহান আল্লাহকে খুশি করার উদ্দেশ্যে এবং প্রতিটি কাজের মাপকাঠি (measurement scale) হবে তাকওয়া।

## আমাদের নিয়মিত জ্ঞান অর্জন

১. কুরআনের অর্থসহ তাফসীর পড়তে হবে।
২. রসূল ﷺ এর বিস্তারিত জীবনী পড়তে হবে।
৩. সহীহ হাদীসগ্রন্থসমূহ পড়তে হবে।
৪. সাহাবীদের জীবনী পড়তে হবে।
৫. তাওহীদ, শিরক ও বিদআত সম্পর্কে পরিষ্কার জ্ঞান অর্জন করতে হবে।
৬. ইসলামের হালাল-হারাম সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে হবে।
৭. ইসলামের দাওয়াতী কাজ ও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ (প্রচেষ্টা)-র জ্ঞান অর্জন করতে হবে।
৮. ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ ও ইসলামী অর্থনীতির উপর জ্ঞান অর্জন করতে হবে।
৯. ইকামাতুতদ্বীন অর্থাৎ establishment of Deen এর উপর জ্ঞান অর্জন করতে হবে।
১০. সর্বজনগৃহীত ইসলামিক স্কলারদের ইসলামী সাহিত্য পড়তে হবে।
১১. Youtube এবং prominent Islamic scholar-দের website থেকে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করতে হবে।



# APPENDIX

১০০

ইসলামী পরিভাষা

যা আমাদের জ্ঞান প্রয়োজন

## ১. মক্কী সূরা

হিয়রতের আগে যেসব সূরা নাযিল হয়েছে তাদেরকে মক্কী সূরা বলে। যেমন : সূরা কাফিরুন, সূরা ইখলাস।

## ২. মাদানী সূরা

হিয়রতের পরে যেসব সূরা নাযিল হয়েছে তাদেরকে মাদানী সূরা বলে। হিয়রতের পরে যদি কোন সূরা মক্কায়ও নাযিল হয়ে থাকে তাকেও মাদানী সূরা বলা হয়। যেমন : সূরা নসর।

## ৩. হিজরত (Hijrat)

অর্থ - দেশত্যাগ, স্থানান্তর গমন। সাধারণ অর্থ হলো দেশত্যাগ বা স্থানান্তর গমন। কিন্তু ইসলামী পরিভাষায় ইসলাম ধর্ম পালনের সুবিধার্থে স্বদেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে গমন যা নাবী কারীম (সাঃ) তাঁর সাহাবীদের নিয়ে মক্কা ছেড়ে মদীনা গিয়ে করেছিলেন (৬২২ খৃষ্টাব্দে)। এই হিজরতের তারিখ থেকে ইসলামের হিজরী সনের সূচনা।

## ৪. আনসার

আনসার অর্থ সাহায্যকারী। দ্বীনের পথে মুহাযীরদের যারা আশ্রয় দেন, সাহায্য সহযোগিতা করেন তারাই আনসার। মদীনার স্থায়ী বাসিন্দা যারা মুহাযীরদের সাহায্য ও আশ্রয় দিয়েছিলেন তাদেরকে আনসার বলা হয়। আনসারগণ রাদিআল্লাহু আনহুম মক্কার সাধারণ লোকদের তুলনায় দ্বীনের প্রতি অধিক সংবেদনশীল ছিলেন।

## ৫. মুহাযীর

দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজে যারাই নিজ জন্মভূমিতে নিগৃহীত হয়েছিলেন, নির্যাতিত হয়ে বহিষ্কারের সম্মুখীন হয়েছিলেন তারাই মুহাযীর। যেমন - যে সকল সাহাবা হিয়রত করে মক্কা থেকে মদীনা এসেছিলেন তাদেরকে মুহাযীর বলা হয়।

## ৬. ওহী

যা সরাসরি আল্লাহর কথা এবং জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে সরাসরি রসূল ﷺ -এর কাছে এসেছে অর্থাৎ কুরআনের আয়াতগুলোকেই ওহী বলে। ওহী

অর্থ হচ্ছে ইশারা করা, মনের মধ্যে কোন কথা প্রক্ষিপ্ত করা, গোপনভাবে কোন কথা বলা এবং ম্যাসেজ পাঠানো। ওহী অর্থ ‘ইলকা’, ইলহাম, মনের মধ্যে কোন কথা সৃষ্টি করে দেয়া কিংবা স্বপ্নে কিছু দেখিয়ে দেয়া। ওহীর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে গোপন এবং ত্বরিত ইংগিত।

## ৭. গায়েব

অর্থ - অদৃশ্য বা গোপন। গায়েব শুধুমাত্র মহান আল্লাহই জানেন। এই পৃথিবীর অনেকে আছেন যারা গায়েব বা অদৃশ্য বা ভবিষ্যৎ জানেন বলে দাবি করেন। কিন্তু এই ধরনের দাবী করা শিরক। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ গায়েবের খবর জানেন না সে যতো বড় বুজুর্গই হোক না কেন এটা স্পষ্ট কুরআনের কথা। তবে নাবী রসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা আল্লাহ তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন।

“(হে রসূল) বল : আল্লাহ ব্যতীত কেউই আকাশ ও পৃথিবীতে গায়েব বা অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না।” (সূরা নামল : ৬৫)

“গায়েবের সবকিছু একমাত্র তিনিই জানেন। আর কারও কাছেই তিনি গায়েবের কোন বিষয় প্রকাশ করেন না। তবে রসূলগণের মধ্যে যাকে পছন্দ করেন তাকেই তিনি কিছু বাতলে দেন।” (সূরা জ্বীন : ২৬-২৭)

## ৮. আলেম

ইলম (knowledge) থেকে আলেম শব্দের উৎপত্তি। যার দ্বীন ইসলামের উপর সহীহ (authentic) জ্ঞান আছে তাকে আলিম বলে। ওলামা হচ্ছে আলিমের বহুবচন।

## ৯. ইহুদী ও নাসারা

ইহুদী হচ্ছে যারা তাওরাতের অনুসারী এবং মুসা (আ.) এর অনুসারী। আর খ্রীষ্টানদেরকে নাসারা বলে।

## ১০. আহলি কিতাব

কিতাবপ্রাপ্তগণ (ইহুদি ও খ্রীষ্টানগণ) যারা তাদের নাবীদের মাধ্যমে আসমানী কিতাব লাভ করেছেন।

## ১১. আহলি বাইত

নাবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর পরিবারকে আহলি বাইত বলা হয়। মূল অর্থ “ঘরের লোকজন/ঘরের বাসিন্দারা”। ব্যবহারিক অর্থ রসূলুল্লাহ ﷺ -এর পরিবার এবং তাঁর বংশধরগণ (কন্যা ফাতিমা ও আলীর সন্তানদের মাধ্যমে)।

## ১২. সলাত (নামায)

সলাত আরবী শব্দ এর ফার্সি শব্দ হচ্ছে নামায। আল্লাহ সলাত বলতে আসলে যা বুঝিয়েছেন সেটাকে নামায বললে পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ পায় না, অর্থাৎ অসমাপ্ত থেকে যায়। তাই আমাদের উচিত সলাতকে নামায না বলে সলাতই বলা। সলাতের সংজ্ঞা : ‘সলাত’-এর আভিধানিক অর্থ দু’আ, রহমত, ক্ষমা প্রার্থনা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থে ‘শরী’আত নির্দেশিত ক্রিয়া-পদ্ধতির মাধ্যমে আল্লাহর নিকটে বান্দার ক্ষমা ভিক্ষা ও প্রার্থনা নিবেদনের শ্রেষ্ঠতম ইবাদত অনুষ্ঠানকে ‘সলাত’ বলা হয়, যা তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা শুরু হয় ও সালামের দ্বারা শেষ হয়।

## ১৩. সলাত কায়েম (আকিমুসসলাত)

কুরআনে সলাত আদায়ের চাইতে কায়েমের কথাই বেশী এসেছে। সলাত কায়েম অর্থ সলাতকে প্রতিষ্ঠা করা (শুধু সলাত পড়া বা আদায় করা নয়)। অর্থাৎ পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে, কর্মক্ষেত্রে সলাত চালু করা। সলাত কায়েম করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো ও এর গুরুত্ব সম্পর্কে লোকদেরকে বুঝানো এসবই সলাত কায়েমের অংশ। সলাতের শিক্ষা ও এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ভ্রাতৃত্ব, আনুগত্য, সাম্য, ঐক্য, শান্তি ইত্যাদির ব্যাপারে মানুষকে পরিচিত করানো ও শিক্ষা দেয়া। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা হচ্ছে সলাত কায়েম করার সবচাইতে কার্যকরী মাধ্যম।

## ১৪. রমাদান/সাওম/সিয়াম/রোযা

আরবী যে বারটি মাস রয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে রমাদান মাস। রমাদান এর ফার্সি শব্দ হচ্ছে রমযান। সিয়াম আরবী শব্দ এর ফার্সি শব্দ হচ্ছে রোযা। আরবী বছরের ২য় হিজরীতে রমাদান মাসে সিয়াম ফরয করা হয়েছে। মাহে ফার্সি শব্দ যার অর্থ মাস আর মাহে রমাদান অর্থ - রমাদান মাস। আমরা বলি রমাদান কারিম বা রমাদান মুবারক, এ দুটিই আরবী শব্দ। কারিম অর্থ - ‘মহান’



আর মুবারক অর্থ - ‘কল্যাণময় হোক’। আবার আমরা বলি খোশ আমদেদ মাহে রমাদান, খোশ আমদেদ-ও ফার্সি শব্দ যার অর্থ - ‘স্বাগতম’।

## ১৫. জিহাদ

‘জিহাদ’ শব্দের অর্থ প্রচেষ্টা বা Struggle. কোন কিছু লাভ করার জন্য শারীরিক, মানসিক, আর্থিক, বুদ্ধিবৃত্তিক সকল প্রকার প্রচেষ্টা এবং তার জন্যে সকল উপায়-উপাদান কাজে লাগানোকে জিহাদ বলে। ফী সাবীলিল্লাহ অর্থ আল্লাহর রাস্তায়। আল্লাহর রাস্তায় সর্বদিক থেকে এবং সব উপায় অবলম্বন করে প্রচেষ্টা চালানোকে জিহাদ বলে। দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য জবান, লেখনী, প্রচার মাধ্যম, ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক তৎপরতা, সম্পদ ব্যয়, সর্বোপরি নিজের জীবন বিলিয়ে দেবার নাম জিহাদ। দ্বীনের জন্য একটি বাক্য ব্যয় করা, এক কদম হেঁটে যাওয়া, একটি লেখনী, সুন্দর ব্যবহার সবই জিহাদের অংশ। দ্বীনকে সমুজ্জল করার জন্য যে কোন প্রচেষ্টাও জিহাদের অংশ। দ্বীনের কাজে লাগবে, মুসলিম জনতার উপকারে আসবে এমন সকল প্রচেষ্টায় রত কাজই জিহাদের সমতুল্য। জিহাদের অর্থ যুদ্ধ, ধ্বংস বা রক্তপাত নয়। যুদ্ধ হচ্ছে “হার্ব” এবং “কতল” হচ্ছে লোক হত্যা। জিহাদ দুই ধরনের হতে পারে :

১. আল্লাহর পথে জিহাদ।
২. শয়তানের পথে জিহাদ।

আমার যে প্রচেষ্টা দ্বীনের উপকারে আসবে তাই আল্লাহর পথে জিহাদ। আর আমার যে প্রচেষ্টা দ্বীনের কোন উপকারে আসবে না রবং দ্বীনের ক্ষতি করবে তা হচ্ছে শয়তানের পথে জিহাদ।

## ১৬. মুজাহিদ (Mujahid)

অর্থ - জিহাদকারী (a fighter)। জিহাদ শুধু অস্ত্রশস্ত্র হাতে হিংস্রতা নয়, যুক্তিতর্কের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবেও করা যায়। আক্রান্ত না হলে কারো বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা বা আক্রমণ করা ইসলাম মোটেই সমর্থন করে না। অস্ত্রের সাহায্যে জিহাদ করে ইসলাম ধর্ম জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই ধারণা ভুল।

## ১৭. এস্তেখারা

এস্তেখারা অর্থ হলো মঙ্গল কামনা করা। পরিভাষা হিসেবে এস্তেখারা অথবা ইস্তেখারার সলাত বলতে ঐ নফল সলাত বুঝায় যা নাবী ﷺ মুসলিমদেরকে এ

উদ্দেশ্যে শিক্ষা দিয়েছেন যে, যদি কখনো কোন জায়েয কাজ করতে গিয়ে তার ভালো দিকটা কি তা সুস্পষ্ট হয় না এবং ভালো মন্দ কোন দিক সম্পর্কেই নিশ্চিত হওয়া যায় না, তখন দু'রাকায়াত নফল সলাত আদায় করে এস্তেখারার মসনূন দু'আ পড়বে আশা করা যায় যে, আল্লাহ এস্তেখারা সলাতের বরকতে কোন একটি দিক সম্পর্কে নিশ্চিততা অথবা মনের প্রবণতা সৃষ্টি করে দেবেন।

## ১৮. কুনুতে নাযেলা

কুনুতে নাযেলা বলতে ঐ দু'আ বুঝায় যা দুশমনের ধ্বংসকারিতা থেকে বাঁচতে, তার শক্তি চূর্ণ করতে এবং তার ধ্বংসের জন্যে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়েছেন। নাবীর পর সাহাবীগণও তা পড়ার ব্যবস্থা করেছেন।

## ১৯. ফরয

এমন কাজ যা করা প্রত্যেক মুসলিমের অপরিহার্য এবং তা অস্বীকারকারী কাফের। যে ব্যক্তি বিনা ওযরে ফরয ত্যাগ করবে সে ফাসিক ও শাস্তিরযোগ্য। ফরয দু'প্রকার। ফরযে আইন, ফরযে কিফায়া।

## ২০. ফরযি আইন

যা করা প্রত্যেক মুসলিমের একেবারে অপরিহার্য, না করলে কঠিন গুনাহগার এবং শাস্তির যোগ্য। যেমন সলাত, সিয়াম প্রভৃতি।

## ২১. ফরযি কিফায়া

যা ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের জন্যে অপরিহার্য নয়, সামগ্রিকভাবে সকল মুসলিমের ফরয, যাতে করে কিছু লোক আদায় করলে সকলের জন্যে হয়ে যায়, আর কেউই আদায় না করলে সকলে গুনাহগার হবে। যেমন জানাযার সলাত, মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফন করা ইত্যাদি।

## ২২. ওয়াজিব

ওয়াজিব আদায় করা ফরযের মতোই অনিবার্য। যে ব্যক্তি একে তুচ্ছ ও গুরুত্বহীন মনে করে এবং বিনা কারণে ত্যাগ করে সে ফাসিক এবং শাস্তির যোগ্য হবে। এটা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরী। অবশ্যি ওয়াজিব অস্বীকারকারীকে কাফির বলা যাবে না।

## ২৩. মুস্তাহাব

অর্থ - উত্তম, মুস্তাহাব এমন আমলকে বলা হয় যা নাবী صلی اللہ علیہ وسلم মাঝে মাঝে করেছেন এবং অধিকাংশ সময়ে করেননি। এ আমলে অনেক সওয়াব আছে, না করলে গুনাহ নেই।

## ২৪. সুন্নাহ (Sunnah)

অর্থ - চলার পথ। সুন্নাহ কথাটার সাধারণ অর্থ হচ্ছে চলার রাস্তা, a path of going. কিন্তু ইসলামী পরিভাষায় সুন্নাহ কথাটার অর্থ হচ্ছে আমাদের নাবী মুহাম্মাদ صلی اللہ علیہ وسلم -এর প্রদর্শিত আল্লাহর ইবাদত এবং দুনিয়ার (জাগতিক) কর্মকাণ্ডে (দীন এবং দুনিয়ার বিষয়ে) আল্লাহর কুরআন ও তাঁর অর্থাৎ রসূলুল্লাহ صلی اللہ علیہ وسلم -এর জীবনের কর্মপদ্ধতির সঠিক অনুসরণ মুসলিমদের পালনীয় ও করণীয়। রসূলুল্লাহ صلی اللہ علیہ وسلم -এর সুন্নাহ, রসূলুল্লাহ صلی اللہ علیہ وسلم -এর প্রদর্শিত পথ যার সঠিক অনুসরণ আখিরাতে জান্নাত লাভের সহায়ক হবে। সঠিক সুন্নাহের দেখা পাওয়া যাবে একমাত্র তাঁর সহীহ হাদীসগুলোতে।

## ২৫. সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ

ঐসব কাজ যা নাবী صلی اللہ علیہ وسلم এবং সাহাবায়ে কিরাম রাদিআল্লাহু আনহুম সবসময় করেছেন এবং কারণ ব্যতীত কখনো ত্যাগ করেননি। অবশ্যি যারা করেনি তাদেরকে সতর্ক করে দেননি। তবে যে ব্যক্তি বিনা কারণে তা পরিত্যাগ করে এবং ছেড়ে দেয়ার অভ্যাস করে সে ফাসিক এবং গুনাহগার। নাবী صلی اللہ علیہ وسلم -এর শাফায়াত থেকে সে বঞ্চিত হবে। অবশ্যি ঘটনাক্রমে কোনটা বাদ গেলে সে অন্য কথা।

## ২৬. সুন্নাতে গায়েব মুয়াক্কাদাহ

যে কাজ নাবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অথবা সাহাবীগণ করেছেন এবং বিনা কারণে কখনো আবার ছেড়েও দিয়েছেন। এ কাজ করলে খুব সওয়াব না করলে গুনাহ নেই।

## ২৭. নফল ইবাদত

নফল মানে ফরযের অতিরিক্ত ইবাদত। আল্লাহর দেয়া সকল ইবাদতই দুই ভাগে বিভক্ত, হয় ফরয অথবা নফল। তাই ফরয ইবাদত ব্যতীত সকল

ইবাদতই নফল। ফরয ব্যতীত আল্লাহর রসূল ﷺ যত ইবাদত করেছেন সবই নফল অর্থাৎ অতিরিক্ত। এই নফল ইবাদতগুলোর গুরুত্ব বিবেচনা করে ফিকাহবিদগণ সেগুলোকে সুন্নাহ ও নফলে ভাগ করেছেন।

যেসব নফল রসূলুল্লাহ ﷺ নিয়মিত পড়তেন বা পড়তে তাকীদ করতেন, সেগুলিকে ফিক্বহী পরিভাষায় ‘সুন্নাতে রাতেবাহ’ অথবা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ বলা হয়। যেমন ফরয সলাত সমূহের আগে-পিছনের সুন্নাতসমূহ। দ্বিতীয় প্রকার সুন্নাত হলো ‘গায়ের মুওয়াক্কাদাহ’, যা আদায় করা সুন্নাত এবং যা করলে সওয়াব আছে, কিন্তু তাকীদ নেই অর্থাৎ না করলে কোন গুনাহ নেই। নফল ইবাদত পালন করলে সওয়াব আছে কিন্তু না করলে গুনাহ নেই এবং এর জন্য আখিরাতে জবাবদিহি করতে হবে না। তবে ফরয ইবাদাতে যদি কোথাও ঘাটতি পড়ে তাহলে কোন কোন ক্ষেত্রে নফল দিয়ে তা পূরণ করা হবে। তাই নফল ইবাদত খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

## ২৮. মাকরুহ ও মুবাহ

মাকরুহ অর্থ : ঘৃণ্য, পরিত্যাজ্য তবে হারাম নয়। এবং মুবাহ অর্থ : ইবাদত অথবা হারাম-হালাল সংশ্লিষ্ট নয় তেমন সব বিষয়ে ব্যক্তিগত রুচি-পছন্দের চর্চা যা করলে সওয়াবও নেই অথবা না করলে গুনাহও নেই।

## ২৯. বিদ’আত

ইসলামে ইবাদতের ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহতে (রসূলুল্লাহের সহীহ হাদীসে) উল্লিখিত বা বর্ণিত হয়নি এমন সব ইবাদত বা ইবাদতের পদ্ধতি, এদের সবই বিদ’আত (দীনে ইসলামে নূতন সংযোজন)। বিদ’আত সর্বদাই পরিত্যাজ্য কারণ রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সহীহ হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় বলে গেছেন যে বিদ’আত হচ্ছে পথভ্রষ্টতা (দালালাহ/গুমরাহী) এবং সেই পথভ্রষ্টতা তার আমলকারীকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে।

## ৩০. হাদীস (বহবচন আহাদীস) (Hadith/ Ahadith)

রসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ -এর কথা, কাজ ও সমর্থন যা সহীহ সূত্রে বিভিন্ন হাদীস সংগ্রহ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। হাদীস বলতে বুঝায় রসূলুল্লাহ ﷺ -এর কথা, কাজ ও অনুমোদন - ইবাদতের ক্ষেত্রে এবং মু’আমেলাত বা সাংসারিক/

সামাজিক আচার-আচরণের ক্ষেত্রে। গ্রহণযোগ্যতার বিচারে হাদীস সাধারণভাবে চার ভাগে বিভক্ত –

১) সহীহ, ২) হাসান সহীহ (সন্দেহাতীতভাবে সঠিক ও গ্রহণযোগ্য, আমলযোগ্য), ৩) যঈফ (দুর্বল, আমলযোগ্য নয়) এবং ৪) মওজু (জাল, বানোয়াট, false/fabricated হাদীস, সর্বদা বর্জনীয়/পরিত্যাজ্য)

হাদীসের অন্য একটি শ্রেণীবিভাগও রয়েছে। সেগুলো হলো –

১) কাউলী হাদীস : যে সকল হাদীস রসূলুল্লাহের ﷺ নিজের মুখের কথা, সেগুলি কাউলী হাদীস। (কাউল অর্থ হলো মুখের কথা)

২) ফে'লী হাদীস : যে সকল হাদীসে রসূলুল্লাহের ﷺ কোন কাজের বর্ণনা রয়েছে – তাঁর মুখের কথা নয় – সেগুলি ফে'লী হাদীস। ফা'আলা অর্থ কাজ করা, সেখান থেকে ফে'লী।

৩) তাকরিরী হাদীস : যে সকল হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন মুখের কথা বা কোন কাজ বর্ণিত হয়নি বরং অন্যের করা কোন কাজকে অনুমোদন ও সমর্থন দিয়েছেন সেগুলি হচ্ছে তাকরিরী হাদীস। (তাকরিরী অর্থ সমর্থিত। মূল শব্দ হলো ইকরার যার অর্থ হচ্ছে স্বীকৃতি বা সমর্থন)

হাদীসের চারটি নাম রয়েছে – হাদীস, সুন্নাহ, আসার ও খাবার। “আসার” কথাটা থেকেই মাসুরা শব্দের উৎপত্তি, যেমন দু'আয়ে মাসুরা, অর্থাৎ যেসব দু'আ রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে।

## ৩৪. সিহা সিহা

৬টি হাদীসগ্রন্থকে বলে সিহা সিহা। যথা :

- ১) সহীহ বুখারী; ২) সহীহ মুসলিম; ৩) তিরমিযি; ৪) আবু দাউদ  
৫) ইবনে মাজাহ; ৬) নাসাঈ

## ৩৫. হাদীসে কুদসী (Hadith-e-Qudsi)

আল্লাহর বাচনিক হাদীস, তবে বর্ণনার ভাষা রসূলুল্লাহের ﷺ নিজস্ব। আল্লাহ পবিত্র (কুদ্দুস), সেই থেকে কুদসী। এ ধরনের হাদীসগুলো রসূলুল্লাহের ﷺ নিজস্ব বক্তব্য নয়, স্বয়ং আল্লাহর বক্তব্য যা বলার আগে ভূমিকা স্বরূপ রসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন যে, “আল্লাহ আমাকে একথা জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন যে বলঃ

জেনে রাখা ভালো যে হাদীসে কুদসী কুরআনের কোন অংশ নয়। হাদীসে কুদসী জিবরাঈল ফিরিশতার মাধ্যমেই communicated হয়েছিল বলে এর অপর নাম হাদীসে জিবরাঈল।

### ৩৬. কিয়াস ও ইজমা (Deduction & Concensus)

কুরআন ও সুন্নাহের পরোক্ষ (প্রত্যক্ষ নয়), একাধিক অর্থবোধক বা কুরআন ও সুন্নাহে উল্লেখ নেই এমন বিষয়ে, কুরআন ও সুন্নাহর অন্য তথ্যের আলোকে, বিচক্ষণ (ফকিহ) ব্যক্তিদের উন্নত বিবেক-বুদ্ধি (Common sense) খাটিয়ে চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে উদ্ঘাটন করা সিদ্ধান্তকে কিয়াস (Deduction) বলে। আর কোন বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফলাফল এক হওয়া বা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলের একমত হওয়াকে ইজমা (Concensus) বলে। তাই সহজে বুঝা যায় কিয়াস বা ইজমা ইসলামের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস নয়। কিয়াস ও ইজমা হলো আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি তথা কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি (Common sense) ব্যবহার করে কোন বিষয়ে, বিচক্ষণ (ফকিহ) ব্যক্তিদের নেয়া একক বা সামষ্টিক সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ কিয়াস ও ইজমার মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহের সাথে আল্লাহ প্রদত্ত তৃতীয় উৎস Common sense উপস্থিত আছে। ইজমাকে ইসলামী জীবন বিধানের একটি দলিল হিসেবে ধরা হলেও মনে রাখতে হবে, ইজমার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মত অন্য যে কোন বিষয়েই তা হতে পারে।

### ৩৭. ইস্তিগফার (Istighfar)

অর্থ - ক্ষমা প্রার্থনা, দয়া ভিক্ষা। ক) কোন গুনাহের কাজ করে ফেললে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা- আস্তাগফিরুল্লাহ - আল্লাহ, তোমার কাছে ক্ষমা চাই। খ) অশালীন কোন কথা শুনলে অথবা কিছু দেখলেও আস্তাগফিরুল্লাহ বলে আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়। যার অর্থ এই যে ঐসব আপত্তিকর কাজ আমি ঘৃণা করি, দূরে থাকতে চাই।

### ৩৮. ইয়াউমুল কিয়ামাহ (Yawmul Qiyamah)

কিয়ামাতের দিন (The Day of Resurrection/ The Day of Judgment)। আরবী কিয়াম অর্থ উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ানোও বটে। সেই মহাদুর্যোগপূর্ণ দিনে  
তাকওয়া - ২২৯

সকল পুনর্জীবিত মানুষ হাশরের ময়দানে দাঁড়িয়ে থাকবে (কিয়াম করবে) আল্লাহর বিচারের রায় শোনার জন্যে ।

### ৩৯. জাযাকাল্লাহ (Jazakallah)

জাযা অর্থ : প্রতিফল, প্রতিদান, বিনিময় । জাযাকাল্লাহ অর্থ : আল্লাহ তোমাকে প্রতিদান/পুরস্কার দিন । কেউ কোন সাহায্য-সহায়তা করলে সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা হচ্ছে জাযাকাল্লাহ । কখনো কখনো জাযাকাল্লাহু খাইরান (আল্লাহ তোমাকে উত্তম পুরস্কার দিন)ও বলা হয় ।

### ৪০. তাওবা (Tawba)

অর্থ - অনুতাপ, পাপ থেকে প্রত্যাবর্তন, অনুশোচনা । গুনাহ করার পর অনুতপ্ত হয়ে কাতরতার সংগে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা । তওবার শর্তগুলো হচ্ছে –

ক) অবিলম্বে তওবা করা (কুরআন ৪:১৭)

খ) খালিস दिलে তওবা করা (কুরআন ৬৬:৮)

গ) সেই ধরনের গুনাহ ভবিষ্যতে না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা ।

ঘ) সেই প্রতিজ্ঞায় অটল থাকা ।

ঙ) অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়া । (কুরআন ৩৯: ৫৩, ৫৪)

### ৪১. তাকবীরে তাহরীমা (Takbeer-e-Tahreema)

অর্থ - দুনিয়ার চিন্তা ও কাজ হারামকারী তাকবীর । সলাতের (নামাযের) শুরুতে দাঁড়িয়ে মনে মনে নিয়্যত করে দু'হাত দু'কাঁধ অথবা দু'কানের লতি পর্যন্ত উঠিয়ে আবার বুকের উপর দু'হাত বাঁধার সময় যে 'আল্লাহু আকবার' বলতে হয় তাকে বলা হয় 'তাকবীরে তাহরীমা' । 'আল্লাহু আকবার' কথাটির নাম তাকবীর, আর 'তাহরীমা' অর্থ হচ্ছে দুনিয়ার কাজ ও চিন্তা হারামকারী । অর্থাৎ এই আল্লাহু আকবার বলা মাত্র সেই মুসল্লীর জন্যে দুনিয়ার সমস্ত কাজ ও চিন্তা হারাম হয়ে গেল যতক্ষণ পর্যন্ত সে সলাত শেষ করে তার ডানে-বামে সালাম না ফিরাচ্ছেন ।

### ৪২. তাকবীর (Takbeer)

আল্লাহু আকবার (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ) বলে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করা ।

### ৪৩. তাসবীহ (Tasbeeh)

সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ মহান ও পবিত্র) বলে আল্লাহর প্রশংসা করা ।

## ৪৪. তাহলীল (Tahleel)

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য অন্য কোন সত্তা নেই) বলে আল্লাহর একত্ব (তাওহীদ) ঘোষণা করা।

## ৪৫. তাস্মিয়াহ (Tasmiah)

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। প্রারম্ভ বাক্য। কোন শুভ কাজ শুরু করার আগে বিসমিল্লাহ বলে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করা।

## ৪৬. তায়াম্মুম (Tayammum-Dry Ablution)

অর্থাৎ পানির অভাবে পাকসাঁফ শুকনা মাটি/বালু দিয়ে বিকল্প ওয়ূ। পানির অভাবে অথবা কোন কারণে পানি ব্যবহারে বাধা থাকলে পাকসাঁফ শুকনা মাটি/বালু দিয়ে শরীয়তি পদ্ধতিতে হাত ও মুখ মুছে বিকল্প ওয়ূ করা জাইয, যার নাম তায়াম্মুম। এটা আল্লাহের আদেশ (সূরা মায়িদা (৫), আয়াত ৬ এবং সূরা নিসা (৪), আয়াত ৪৩)। সলাতের আগে ওয়ূর মত তায়াম্মুমও ফরয, না করলে সলাত হবে না।

## ৪৭. তাহারাত (Taharat)

অর্থ - পবিত্রতা। আল্লাহর কাছে বান্দার ইবাদত গ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রথম শর্ত হলো শরীয়তি পদ্ধতি অনুসারে তার দেহ, পোশাক ও ইবাদতের স্থানের পবিত্রতা (তাহারত) অর্জন গোসল, ওয়ূ অথবা তায়াম্মুমের মাধ্যমে (কুরআন ৫ : ৬; ৪ : ৪৩) যারা পবিত্রতা অবলম্বন করে, পবিত্র থাকতে চায় আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন (৯ : ১০৮; ২ : ২২২; ৭৪ : ৪) হাদীসে আছে, তাহারাত হচ্ছে ঈমানের অংগ।

## ৪৮. তাওয়াক্কুল (Tawakkul)

অর্থ - আল্লাহর উপর ভরসা, নির্ভরতা। আল্লাহ তাঁর কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন যে মু'মিনগণ যেন সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে সর্বাবস্থায় তাঁর উপর তাওয়াক্কুল (নির্ভর) করে কারণ তিনিই সবকিছুর নিয়ন্তা ও দাতা, অন্য কেহ নহে। সুখের দিনে আলহামদুলিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই) বলা এবং দুঃখের দিনে আলহামদুলিল্লাহে 'আলা কুল্লি হাল (সর্বাবস্থাতেই প্রশংসা একমাত্র



আল্লাহর) বলা। আল্লাহর উপর ভরসা, নির্ভর করলে আল্লাহ-ই যথেষ্ট। তিনি গুনাহ মাফ করবেন, পুরস্কার দেবেন। (কুরআন ৮: ৬১ এবং ৬৫: ৩, ৫)

## ৪৯. দু'আ/দোয়া (Du'a - Supplication)

আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার জন্যে প্রার্থনা। দু'আ অর্থ প্রার্থনা। রসূলুল্লাহ صلی اللہ علیہ وسلم বলেছেন : “দু'আই ইবাদত।” (আদ দু'আউ হুয়াল ইবাদত) – আহমাদ, আবু দাউদ প্রভৃতি)

সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে দু'আ করা অর্থ হলো সেই ব্যক্তির ইবাদত করা যা শিরক ও হারাম।

## ৫০. দরুদ/দুরুদ (Durud)

রসূলুল্লাহ صلی اللہ علیہ وسلم -এর জন্যে আল্লাহর কাছে আশীর্বাদ ও শান্তির প্রার্থনা (কুরআন ৩৩ : ৫৬)। এটি ফার্সি শব্দ। ইসলাম ধর্ম নিয়ে আলোচনার একটা বইতে দেখলাম যে ফার্সি শব্দ দুরুদের মূল অর্থ কোন জিনিস কেটে টুকরা টুকরা করা। এর সংগে রসূলুল্লাহ صلی اللہ علیہ وسلم -এর জন্যে আশীর্বাদ ও শান্তি প্রার্থনার কি সম্পর্ক সেটা বোঝা যায় না। মূলতঃ কুরআন ও হাদীসে ব্যবহৃত আরবী “সলাত” ও “সালাম” কথা দু'টির প্রতিশব্দ হিসাবে বাংলা ও উর্দু ভাষায় এই দরুদ/দুরুদ কথাটা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু আমাদের উচিত সলাত ও সালাম বলা, দরুদ নয়, কারণ এটা কুরআন-হাদীসের ভাষা নয়। হাদীসের কোন ইংরেজী অনুবাদেই দুরুদ কথাটার দেখা পাওয়া যায় না, আছে সলাত ও সালাম। এখানে সলাত অর্থ আশীর্বাদ (blessings) এবং সালাম অর্থ শান্তি (peace). সহীহ হাদীসে প্রচুর সলাত ও সালামের (প্রচলিত ভাষায় দুরুদের) উল্লেখ রয়েছে যা আমরা বরাবরই পড়ে থাকি।

## ৫১. নিকাহ (Nikah)

অর্থ - বিবাহ, বিয়ে। মুসলিম নারী ও পুরুষের মাঝে ইসলামী শরীয়ত অনুসারে লিখিত কাবিন সাপেক্ষে সাক্ষী রেখে বহু লোক সমক্ষে বিবাহবন্ধন অনুষ্ঠান।

## ৫২. পুলসিরাত (Pulsirat)

ইসলামী আকীদা অনুসারে হাশরের মাঠে শেষ বিচারের দিনে জাহান্নামের উপরে যে পুলটা আল্লাহ স্থাপন করবেন সেটা। ফার্সি পুল (bridge) এবং আরবী

সিরাত (রাস্তা /path/road)। জান্নাতে যেতে হলে সকল মানুষকে হেঁটে সেই পুলসিরাত পার হতে হবে (কুরআন ১৯ : ৭১)। যে পারবে না, সে নীচে জাহান্নামে পড়ে যাবে। উল্লেখ করা দরকার যে কুরআনে এই পুলসিরাতের স্পষ্ট কোন উল্লেখ নেই, এর আলোচনা শুধু হাদীসে পাওয়া যাবে। সূরা মারিয়াম (১৯), আয়াত ৭১ এবং সূরা কালাম (৬৯), আয়াত ৪২ এর আলোচনায় মুহাম্মদ মুহসিন খান ও তাকিউদ্দীন আল-হিলালীর কুরআনের English translation- (Pages 455, 848, 849)এ পুলসিরাতের আলোচনা আছে।

### ৫৩. ফিকহ (Fiqh)

ইসলামী জ্ঞানের নানা শাখার একটি। ইবাদতের নানা নিয়ম-পদ্ধতি-মাসালা ইত্যাদি যে শাস্ত্রে আলোচিত হয়েছে সেটা। ফিকহ শব্দের অর্থ বুদ্ধি বিবেচনা, ধীশক্তি, উপলব্ধি, পরিভাষায় ফিকহর অর্থ শরয়ী আহকাম। যা কুরআন ও সুন্নাহ গভীর জ্ঞান ও পারদর্শিতা সম্পন্ন আলেমগণ কুরআন সুন্নাহ থেকে যুক্তি প্রমাণসহ বের করেছেন।

- ১) ইসলামের শরীয়তি বিধি-বিধান। Islamic jurisprudence.
- ২) যে আলেম ফিকহ শাস্ত্রে পারদর্শী তিনি ফকীহ, বহুবচন ফুকাহা।
- ৩) বুদ্ধিমান অর্থেও ফকীহ কথাটা ব্যবহৃত হয়।
- ৪) বাংলা ভাষায় ফিকহ কথাটাকে ফিকাহ বলা হয়।

### ৫৪. ফিদইয়া (Fidya)

অর্থ - আর্থিক ক্ষতিপূরণ (Redemption)

ইবাদতের ক্ষেত্রে (রোযা বা হাজ্জে) কোন ত্রুটি ঘটে গেলে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ শরীয়তি বিধান অনুসারে অর্থ ব্যয়। যথা অনুমোদিত কারণে রোযা রাখতে না পারলে তার পরিবর্তে একজন গরীব লোককে প্রতিদিন দুইবেলা পেট ভরে খেতে দেয়া।

### ৫৫. ফিত্না (Fitnah) - ফাসাদ (Fasad)

আযমাইশ (ফার্সি) (Azmaish- পরীক্ষা)। অরাজকতা, বিশৃংখলা, বিদ্রোহ, ধর্মীয় নির্যাতন। হাংগামা, গোলযোগ, হত্যা, রক্তপাত, বিদ্রোহ, বিভেদ, পরীক্ষা ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ফিত্না আল্লাহর খুব অপছন্দ, তাই তিনি মুসলিমদের মাঝে ফিত্না সৃষ্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বলেছেন : ফিত্না হত্যা

অপেক্ষাও গুরুতর অন্যায় (সূরা বাকারা : ১৯১, ২১৭)। ঈমানদার মানুষ যখন বিপদগ্রস্ত হয়, কোন সমস্যায় পড়ে তখন সে ভাবে, আল্লাহ আমাকে ফিতনায় ফেলে পরীক্ষা করছেন। অন্যদিকে সন্তান ও সম্পদকেও কুরআনে ফিতনা (পরীক্ষা/test) বলা হয়েছে (৮ : ২৮)। ফিতনা ও ফাসাদের উপর নিষেধাজ্ঞার জন্যে কুরআনের এই আয়াতগুলো দেখা যেতে পারে – (২ : ১১, ৬০, ৮৪, ১৯১, ২০৫, ২১৭; ৫ : ৬৪; ৭ : ৫৬, ৭৪, ৮৫)।

### ৩১. পীর

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় পীর বলতে কোন শব্দ নেই। পীর ফারসী শব্দ। মানুষের বয়স বেশী হয়ে গেলে সেই বুড়োবুড়ি মানুষকে বলা হয় পীর। পারস্যের অগ্নি পূজারীদের পুরোহিতকে বলা হয় ‘পীরে মুগা’। ফারসী অভিধানে ‘পীরে মুগার’ অর্থ করা হয়েছে- ‘আত্যাশ পোরস্তকা মুরশেদ’ (অগ্নিপূজারীদের পুরোহিত)। খ্রীষ্টানদের Priest আর হিন্দুদের পুরোহিত বলতে যা বুঝায়, পীর বলতে ঠিক তাই বুঝায়।

### ৫৬. ফকির/দরবেশ (Fakir/Darvish)

অর্থ - ধর্মীয় আবরণে ভিক্ষুক। “ফকির” একটা আরবী শব্দ যার অর্থ দরিদ্র। “দরবেশ” হচ্ছে একটা ফার্সি শব্দ যার অর্থ তথাকথিত ইসলামী পোশাক পরিহিত এক ধরনের ভিক্ষুক। এরা সলাত-সিয়ামের ধার ধারে না, এরা সুফী মতবাদের অনুসারী। ওদের পোশাক ও কিছু ইসলামী বোলচালে মুগ্ধ হয়ে সাধারণ মুসলিমগণ এদের একধরনের শ্রদ্ধার চোখে দেখে এবং হাত পাতলে, চাইলে ভিক্ষা দেয়। এদের থেকে আমাদের দূরে থাকা উচিত।

### ৫৭. বাইতুল্লাহ

ক) বাইতুল মুকাদ্দাস = পবিত্র গৃহ।

প্যালেস্টাইনের জেরুজালেম শহরে [বর্তমান ইহুদি রাষ্ট্র ইজরায়েল] অবস্থিত এই মসজিদ ইসলামের পবিত্রতম মসজিদগুলোর মাঝে তৃতীয় স্থানের অধিকারী। প্রথম স্থানে মক্কার মসজিদুল হারাম এবং দ্বিতীয় স্থানে মদীনায় মসজিদে নববী।

খ) বাইতুল মাক্দিস = পবিত্র গৃহ।

গ) মাসজিদুল আকসা = দূরবর্তী মাসজিদ।

ঘ) আল কুদস = মহাপবিত্র।

## ৫৮. বারযাখ্ (Barzakh)

অর্থ - পর্দা, অন্তরাল । আলমে বারযাখ্ (Alam-e-Barzakh)

পর্দার অন্তরালের জগৎ অর্থাৎ কবরবাসীদের জীবন । ইসলামী আকীদা (বিশ্বাস) অনুসারে মানুষের মৃত্যুর পর কবরের জীবন কিয়ামতের দিনে পুনর্জীবন লাভ করা পর্যন্ত । কবরের শাস্তি অথবা শান্তি (দুনিয়াতে আমলের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে) এই জীবনে ভোগ করতে হবে । মানুষের দৃষ্টির আড়ালের এই জীবন সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানেন একমাত্র আল্লাহ যিনি এই আলমে বারযাখের সৃষ্টিকর্তা । বারযাখের অন্যান্য অর্থও রয়েছে । যথা : মধ্যবর্তী স্থান, অবকাশ, এলোমেলো চিন্তা ।

## ৫৯. মাখলুক (Makhluk)

মাখলুকাত (Makhlukat) কায়েনাত (Kayenat) । সৃষ্টি, সৃষ্ট জীব এবং বস্তু । আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে আল্লাহর সকল সৃষ্টি - প্রাণবান ও প্রাণহীন, দৃশ্য ও অদৃশ্য - সবই । বহুবচনে মাখলুকাত (সৃষ্টিকুল মাখলুকাত) । জগৎ বা বিশ্বকে কায়েনাত (Kayenat)ও বলা হয়ে থাকে ।

## ৬০. মুশরিক (Mushrik)

আল্লাহর একত্বে অংশীদার সাব্যস্তকারী; যে বা যারা আল্লাহর সংগে “শিরক” করে । আরবী “শারিক” কথাটার অর্থ অংশীদার/সমকক্ষ । আল্লাহ এক, একক, অংশীদারবিহীন । তিনি আহাদ, তিনি ওয়াহিদ, তিনি একমাত্র প্রভু ও উপাস্য - এই হচ্ছে তাওহীদ । এই তাওহীদে অংশীদার আরোপকারীদের বলা হয় মুশরিক, তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে জঘন্যতম অপরাধী, কঠোর শাস্তি পাবে তারা জাহান্নামে । তাদের অপরাধ আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবেন না [সূরা নিসা (৪), আয়াত ৪৮, ১১৬; সূরা মায়িদা (৫), আয়াত ৭২; সূরা বাইয়্যিনা (৯৮), আয়াত ৬] বহুবচনে মুশরিকুন, মুশরিকীন ।

## ৬১. মুত্তাকী (Muttaqi)

পূর্ণরূপে আল্লাহ ভক্ত মু’মিন, পুণ্যবান । যিনি তাকওয়া অবলম্বন করেছেন । যিনি কুরআন-হাদীসের সব বিধি-নিষেধ মেনে পূর্ণ তাকওয়া অবলম্বন করে ইবাদত-বন্দেগী করেন এবং দৈনন্দিন জীবন-যাপন করেন । এমন সব মু’মিনদের

ফার্সিতে পরহেয়গার বলা হয়। পরহেয় অর্থ হলো সংযম; ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বিচার করে চলা, হারামকে পরিত্যাগ করা।

## ৬২. মাযহাব (Madhab)

মাযহাব অর্থ মত ও পথ। সারা পৃথিবীতে ছড়ানো সুন্নী মুসলিমদের চারটি মত ও পথ। সুন্নীদের ফিকহ (Fiqh or Jurisprudence) এর বিখ্যাত চার ইমামের নামানুসারে আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে বিভক্ত চারটি মত ও পথের অনুসারীগণ – হানাফী, মালিকি, শাফেঈ এবং হান্বালী মাযহাব। মাযহাবের অস্তিত্ব রসূলুল্লাহ ﷺ এর যমানায় ছিল না, এগুলোর সৃষ্টি হয়েছে তাঁর মৃত্যুর চারশত বছর পর।

মাযহাব হচ্ছে কতিপয় মাসয়ালা-মাসায়েলের ব্যাপারে ওলামাদের মতামত, অনুধাবন ও গবেষণালব্ধ জ্ঞান। আল্লাহ ও তাঁর রসূল এই জ্ঞান, গবেষণা এবং মতামতের অনুসরণ করা কারো উপর অপরিহার্য করেননি। কেননা মতামতের মধ্যে শুদ্ধ-অশুদ্ধ উভয় সম্ভাবনা বিদ্যমান। তবে মাযহাবসমূহের যে সব বিষয় কুরআন-সহীহ হাদীস এর ওপর নির্ভরশীল শুধু সেগুলোই অনুসরণ করা ওয়াজিব। আর যেগুলো কুরআন-হাদীসের বাণী দ্বারা সমৃদ্ধ নয়, সেগুলো মতামত ও ইজতিহাদের বিষয়; এতে শুদ্ধ এবং অশুদ্ধ উভয় সম্ভাবনা রয়েছে।

যে সকল মত ও পথ কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা মোটেও সমর্থিত নয়, এগুলো ইসলাম ধর্মে নূতন সৃষ্টি। মাযহাব মেনে চলা ফরয, ওয়াজীব, সুন্নত, নফল বা মুবাহ কোনটাই নয়। মুসলিমদের জন্যে একটি মাত্র মাযহাব আল্লাহ অনুমোদন করেছেন তাদেরকে বিভ্রান্তি থেকে বাঁচানোর জন্যে, এবং সেই মাযহাব হচ্ছে কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত রসূল ﷺ -এর মাযহাব যা তিনি তাঁর জীবিতকালে তাঁর সাহাবীগণ, তৎপর তাঁর চার খলিফা, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈনগণ অনুসরণ করে গেছেন। মুসলিমদের মাঝে ভিন্ন ভিন্ন দল ও মত সৃষ্টি করা আল্লাহ নিষেধ করেছেন (কুরআন ৭ : ১৫৩; ৩ : ১০৩)

## ৬৩. মুকতাদি (মুক্তাদী) (Muqtadi)

অর্থ - অনুগামী, শিষ্য। শরীয়তের সংজ্ঞা অনুসারে মুকতাদি অর্থ হলো সলাতের শুরু থেকে ইমামের পেছনে দাঁড়ানো ব্যক্তি। যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে সলাতের জন্য ইকতেদা (অনুসরণ/অনুকরণ) করে সে একজন মুক্তাদী। যে ব্যক্তি ইমামের সাথে সলাতের কিছু অংশ পেলো, তাকে বলে মাসবুক।

## ৬৪. মাগফিরাত (Maghfirat)

অর্থ - ক্ষমা, মার্জনা, রেহাই। প্রচলিত সবগুলো অর্থই স্থান বিশেষে প্রযোজ্য তবে মুসলিম সমাজে আল্লাহর কাছে পাপ (গুনাহ) থেকে রেহাই পাওয়া অর্থেই সচরাচর মাগফিরাত কথাটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মাগফিরাত বা ক্ষমা দানের অধিকার একমাত্র আল্লাহরই ক্ষমতাভুক্ত, তাই আল্লাহর নাম গাফুর, গাফ্ফার।

## ৬৫. লাওহে মাহফুয (Lawhim Mahfuz)

অর্থ - সংরক্ষিত ফলক (Preserved/ Guarded Tablet)। কথাটা কুরআনের সূরা বুরূজ (৮৫)-এর ২১-২২ নম্বর আয়াতে আছে যেখানে বলা হয়েছে ‘বালহুয়া কুরআনুম মাজীদ, ফী লাওহিম মাহফুয’ যার বাংলা অনুবাদ : বস্তুতঃ ইহা সম্মানিত কুরআন, সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ। এটাকে উম্মুল কিতাব-ও বলা হয়েছে (কুরআন ১৩ : ৩৯)

আবদুল্লাহ ইউসুফ আলীর ব্যাখ্যাটা এরকম : “Inscribed in a Tablet Preserved”, i.e., Allah’s message is not ephemeral [short-lived] It is eternal [existing always] The “Tablet” is “Preserved” or guarded from corruption for Allah’s Message must endure for ever.”

## ৬৬. শরীয়ত/শারী’আ (Shari’at)

অর্থ - ইসলাম ধর্মীয় বিধি-বিধান, আইন-কানুন। ধর্মীয় বিধি-বিধান বা আইন-কানুন যা আল্লাহ নাবীদের ও আসমানী কিতাবের মাধ্যমে মানবজাতির আচরণ-পালনের উদ্দেশ্যে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন ইসলামী শরীয়ত। (Shariah) মূল শব্দ হলো “শারী” যার অর্থ হলো “পথ”, এবং দ্বিতীয়টি হলো “শারী’আ” যার অর্থ শুরু করা, প্রবেশ করা, প্রয়োগ করা, বিধান দেয়া – to begin, enter, introduce, prescribe. শরীয়ত হচ্ছে মুসলিমদের জন্যে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আচরণ বিধি – Code of Conduct. শরীয়ত মেনে চলার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ-নিষেধ মেনে চলা।

## ৬৭. সদাকাহ (Sadaqah)

দান-খয়রাত যা ফরয দেয় যাকাতের অর্থের অতিরিক্ত। অতীব পূণ্যময় কাজ, আল্লাহ ও রসূলের পছন্দ ও নির্দেশ মুসলিমদের প্রতি। সহীহ হাদীস অনুসারে

শুধুমাত্র অর্থদানই নয়, এমন কি পথ থেকে কাঁটা সরিয়ে দেয়া বা একজনের সংগে হাসিমুখে কথা বলাও সদাকাহ। সূরা তাওবা (৯)-এর ৬০ নম্বর আয়াতে “সদাকা” কথাটার উল্লেখ আছে তবে সেখানে সদাকা বলতে “যাকাত”-কে বোঝানো হয়েছে।

### ৬৮. সিজদা/সাজদা (Sijdah)

মাটিতে কপাল ও নাক লাগিয়ে আল্লাহর প্রতি বিনীতভাবে আত্মনিবেদন। ‘সিজদা’ অর্থ চেহারা মাটিতে রাখা। পারিভাষিক অর্থ, আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে বিনম্রচিত্তে চেহারা মাটিতে রাখা যা সলাতের সময় করতে হয়। সিজদা হলো দু’আ কবুলের সর্বোত্তম সময়।

### ৬৯. সিজদায়ে সহ (Sijda-e-Sahu)

সলাতে কোন ভুলের জন্যে সিজদা। সহ অর্থ ভুলে যাওয়া। সলাতের মধ্যে ভুলবশতঃ যে কম বেশী হয় তাতে যে সলাতের অনিষ্ট হয় তা পূরণের জন্যে সলাতের শেষে দুটি সিজদা করা ওয়াজিব হয়ে যায়। তাকে সহ সিজদা বলে। অর্থাৎ সলাতে ভুলক্রমে কোন ওয়াজিব তরক হয়ে গেলে শেষ বৈঠকের তাশাহুদ শেষে সালাম ফিরানোর পূর্বে ‘সিজদায়ে সহ’ দিতে হয়।

### ৭০. সিজদা-এ-তিলাওয়াত (Sijdah-e-Tilawat)

কুরআন তিলাওয়াত-কালীন সিজদা। সমগ্র কুরআনে ১৫টি স্থানে (সূরা হাজ্জ-এ দু’বার) সংশ্লিষ্ট আয়াতটির তিলাওয়াত শেষ হওয়া মাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি করে সিজদা করতে হয়। It is recommended to make the Sijdah. এতে তাশাহুদ নেই, সালামও নেই। সিজদার আয়াত পাঠ করা হলে পাঠক ও শ্রোতা দু’জনকেই সিজদা করতে হবে।

### ৭১. সিজ্জীন (Sijjin)

সূরা মুতাফফিফীন (৮৩), আয়াত ৮-এ এই “সিজ্জীন” কথাটার উল্লেখ আছে। হাদীসের বর্ণনা অনুসারে সিজ্জীন একটা বিশেষ স্থানের নাম যেখানে কাফিরদের রুহ ও আমলনামা রাখা হয়।

## ৭২. ইল্লিই-ইন (Illiyin)

সূরা মুতাফফিফীন (৮৩), আয়াত ১৮তে এই “ইল্লিই-ইন” কথাটার উল্লেখ আছে। হাদীসের বর্ণনা অনুসারে ইল্লিই-ইন একটা বিশেষ স্থানের নাম যেখানে মু’মিনদের রুহ ও আমলনামা রাখা হয়।

## ৭৩. সাহাবী (Sahabi)

(A Companion of Prophet Muhammed, pbuh)

মুহাম্মাদ ﷺ -এর একজন সংগী, সাথী, সহচর, অনুগামী ও ভক্ত। সাহাবী। মূল শব্দটা হলো সাহিব (sahib) যার অর্থ সংগী, সাথী, অনুচর, ভক্ত, অনুসারী, বন্ধু ইত্যাদি। কিন্তু ইসলামী পরিভাষায় এই সাহিব কথা ‘সাহাবী’তে রূপান্তরিত হয়ে একটা বিশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করেছে। তার ফলে একজন সাহাবী হলেন সেই ব্যক্তি (পুরুষ অথবা নারী) যিনি রসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবিতকালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলিম হয়ে তাঁর নিত্য সহচর/সাথী/অনুগামী ছিলেন; যিনি নাবীজীর সংগে কথা বলেছেন, যুদ্ধ করেছেন, শান্তির বাণী প্রচার করেছেন, তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছেন, তাঁর পেছনে সলাত আদায় করেছেন ও অন্যান্য ইবাদত করেছেন, তাঁর আদেশ পালন করেছেন, তাঁর সেবা করেছেন, তাঁর সংগে সফর করেছেন, হিজরত করেছেন ইত্যাদি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে নাবী ঈসা (আ.) এর অনুগত অনুসারীদের বলা হতো হাওয়ারিইউন (হাওয়ারিগণ), এক বচনে হাওয়ারী। তাঁদের সংখ্যা ছিল ৯২ জন। সূরা সাফ (৬১), আয়াত ১৪।

ক) সাহাবা (Sahaba) বহুবচন - সাহাবীগণ। (The Companions of Prophet Muhammed, pbuh)

খ) আস্হাব (As-hab)। অন্য একটি বহুবচন - সাহাবীগণ

গ) নারী সাহাবীকে বলা হয় সাহাবিইয়াহ বহুবচনে সাহাবিইয়া-ত

## ৭৪. তাবিঈ (Tabei)

তাবিঈ = একবচন এবং বহুবচনে = তাবিঈন। যারা সাহাবীগণের অনুসরণকারী। রসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবিতকালে তাঁর ভক্ত ও নিত্যসহচরগণকে বলা হয় সাহাবী (একবচন) সাহাবা (সাহাবীগণ-বহুবচন) নাবীজীর মৃত্যুর পর ইসলাম ধর্ম প্রচারে ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন সেই সাহাবীগণ। সেই যুগে যেসব মুসলিম সাহাবীগণের সাহচর্য পেয়েছিলেন, ইসলাম শিক্ষা করেছিলেন, ইসলামের চর্চা করেছিলেন তাঁরা হলেন ‘তাবিঈ’, অর্থাৎ

তাকওয়া - ২৩৯



সাহাবীগণের অনুসারী (তাবেদার)। অর্থাৎ সাহাবাদের পরের জেনারেশনকে তাবীঈ বলে অর্থাৎ যারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেননি কিন্তু সাহাবাদেরকে দেখেছেন। যেমন : ইমাম হুসাইন রাদিআল্লাহু আনহুন্নহর ছেলে জয়নুল আবেদীন।

## ৭৫. তাবিতাবিঈ (TabeTabei)

তাবিতাবিঈ = একবচন এবং বহুবচনে = তাবিতাবিঈন। যারা তাবিঈগণের অনুসরণকারী। তাবিঈগণের যুগের পর তাঁদের হাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত যে মুসলিমগণ ইসলাম ধর্ম শিক্ষা ও প্রচার করে গেছেন তাঁদের পরিচয় হলো তাবিতাবিঈন (তাবিঈদের অনুসারীগণ)। অর্থাৎ তাবিঈদের পরের জেনারেশনকে তাবি-তাবিঈ বলে অর্থাৎ যারা সাহাবাদেরকে রাদিআল্লাহু আনহুন্নহর দেখেননি কিন্তু তাবিঈদেরকে দেখেছেন। যেমন : ওমর ইবন আব্দুল আজীজ (রা.)।

## ৭৬. ইসলামের দৃষ্টিতে “শহীদ”

ইসলামের দৃষ্টিতে আসলে শহীদ কে? সহীহ বুখারীর হাদীস অনুযায়ী ৫ প্রকার ‘প্রকৃত মুসলিম’ মারা গেলে শহীদ হয়। যেমন : ১) মহামারীতে ২) পেটের পীড়ায় ৩) পানিতে ডুবে ৪) ধ্বংসস্থাপে চাপা পরে এবং ৫) আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে। অন্যান্য বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। শুধু শেষের বিষয়ে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর পথে কাজ করতে গিয়ে, দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে, দ্বীনের কথা বলতে গিয়ে, দ্বীনের জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে মারা যান শুধু মাত্র তাকেই শহীদ বলা হয়। তবে কে শহীদ, কে জান্নাতী, কে জাহান্নামী এই ডিকলারেশনের অধিকার কাউকে দেয়া হয়নি। এই অধিকার শুধু মহান আল্লাহ তাআলার। কেউ আল্লাহর এই অধিকার নিজের হাতে তুলে নিতে পারবে না। কে সত্যিকারভাবে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেছে সেটাও তো সিদ্ধান্ত হবে আখিরাতে বিচারের পরে। ইসলামের দৃষ্টিতে পরিস্কারভাবে আমাদের জানা থাকা প্রয়োজন যে কোন হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, ইহুদী, নাস্তিক, মুরতাদ, মুনাফিক, বোনামাযী কখনো শহীদ হতে পারে না। কারণ বিষয়টা তাদের জন্য না। শহীদ হতে হলে প্রকৃত ঈমানদার, মুমিন, মুসলিম হতে হবে, আর্থশিক ঈমানের অধিকারী হলেও হবে না। অর্থাৎ যদি আমি ইসলামের কিছু অংশ মানবো আর কিছু অংশ মানবো না বলে মত পোষণ করি তাহলেও আমি প্রকৃত মুসলিম হতে পারবো না।

## ৭৭. সীরাত (Seerat)

অর্থ - জীবনী, (biography), গুণ, প্রকৃতি, স্বভাব। আরবী অক্ষর সী-ন, ইয়া, র, তা = সীরাত (জীবন কাহিনী, জীবনী)। সীরাতুন নাবী অর্থ নাবীর জীবনী। শব্দটার প্রয়োগের ক্ষেত্রটা ভিন্ন হলে অন্যান্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

## ৭৮. সিরাত (Sirat)

অর্থ - পথ, রাস্তা। আরবী অক্ষর সদ, র, আলীফ, ত্ব = সিরাত (রাস্তা, পথ)। সিরাতুল মুস্তাকীম - সরল পথ (দ্বীন-ই ইসলাম)

## ৭৯. সিরাতুল মুস্তাকীম (Siratul Mustaqim)

কুরআন ও সুন্নাহ প্রদর্শিত সরল পথ যা বান্দাকে জান্নাতে পৌঁছাবে। কুরআন ও সুন্নাহে প্রদর্শিত সৎপথ যা অনুসরণ করলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে সাফল্য ও শান্তি এবং আখিরাতে জান্নাতে স্থান পাওয়ার প্রত্যাশা করা যাবে, আল্লাহর রহমত ও রসূলুল্লাহের শাফা'আত পাওয়া যাবে। (কুরআন ১:৫; ১৯:৭৬; ২২:৫৪)

## ৮০. হালাল (Halal)

ইসলাম ধর্ম দ্বারা অনুমোদিত, শরীয়তসম্মত, গ্রহণযোগ্য, সমর্থনযোগ্য। হালাল কথাটা ইসলাম ধর্মে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর অধীনে আয়-রোজ্গার, খাদ্য, পানীয়, পোশাক, অলংকার, কাজ, ব্যবহার, অর্থনীতি, রাজনীতি এর সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হয়।

## ৮১. হারাম (Haram)

ক) ইসলাম ধর্ম দ্বারা অর্থাৎ শরীয়ত দ্বারা অনুমোদিত নয়, গ্রহণযোগ্য বা সমর্থনযোগ্য নয়। কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। হালাল এর মত হারাম কথাটাও ইসলাম ব্যাপকভাবে ব্যবহার/প্রয়োগ করে যার অধীনে পূর্বোক্ত সব কাজ এবং বিষয়গুলোও নিয়ন্ত্রিত হয় এবং নিষেধাজ্ঞার অধীনে বিবেচিত হয়।

খ) হারাম কথাটা একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে যখন এর অর্থ দাঁড়ায় পবিত্র, অতিপবিত্র। মক্কায় কাবা গৃহকে অতিপবিত্র স্থান (হারাম) বলে গণ্য করা হয়, এবং কাবা গৃহকে ঘিরে যে বিশাল আকারের মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে তার সমস্ত এলাকাটাকেও হারাম

(মহাপবিত্র) শ্রদ্ধার স্থান বলে গণ্য করা হয়। অতি পবিত্র এবং শ্রদ্ধার স্থান বোঝাতেও হারাম কথাটা ব্যবহৃত হয়।

গ) মদীনাতে অবস্থিত রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবরকে ঘিরে যে বিরাটাকারের মসজিদ তৈরী করা হয়েছে সেটাকেও “হারাম” (অতিপবিত্র) বলে বিবেচনা করা হয়।

ঘ) এই দুটি স্থানের পবিত্রতার স্বীকৃতি দিয়ে এদের পরিচয় এখন হারামাইন বা হারামাইন শরীফ (অর্থাৎ দুটি অতিপবিত্র ও শ্রদ্ধার স্থান) বলে। কোন কোন বইপত্রে দেখা যায় এবং মুসলিমদের মুখেও শোনা যায় “হরম শরীফ” অথবা “হেরেম শরীফ” যা হারাম শরীফ কথাটার বিকৃত রূপ, গ্রহণযোগ্য নয়।

## ৮২. যিকর

যিকরের শাব্দিক অর্থ হলো কোন কিছু স্মরণ করা, আবার বর্ণনা করাও হয়। কোন কিছু মনে রাখা বা মনে করাকে আমরা মনের যিকর বলতে পারি। এমনভাবে কোথায় আল্লাহর কোন হুকুম কিভাবে মানতে হবে, কী কী কাজ আল্লাহ করতে বলেছেন আর কী কী করতে বারণ করেছেন, সেটা মনে গেঁথে নেবার নাম কলবের যিকর। আর কোন কিছু মুখে আলোচনা করাকে আমরা মুখের যিকর বলতে পারি। জুমু'আর সলাতের নির্দেশ দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন : “জুমু'আর দিনে যখন সলাতের জন্য ডাকা হয় তখন আল্লাহর যিকরের জন্য দ্রুত হাযির হও।” (সূরা জুমু'আ : ৯)

এখানে যিকর বলতে জুমু'আর সলাত ও খুত্বাকে বুঝানো হয়েছে। খুত্বার মাধ্যমে মুসলিমদেরকে আল্লাহর কথা, আল্লাহর হুকুম আহকামের কথা শোনানো হয়ে থাকে। খুত্বা আসলে একটা বক্তৃতা, আল্লাহ তা'আলা তাকেও যিকরের নামে অভিহিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় এই যিকর শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তিনি যিকর অর্থে কয়েকটা শব্দ মাথা ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে ‘হু-হা-হু-হা’ করতে বলেন নাই।

## ৮৩. দ্বীন

শব্দটির প্রচলিত কিন্তু অপূর্ণাঙ্গ অর্থ হচ্ছে ধর্ম। এতে দ্বীনের পুরাপুরি অর্থ হয় না। এর প্রকৃত অর্থ ব্যাপক। তবে সংক্ষেপে ও এক কথায় দ্বীন শব্দের অর্থ :

জীবন-বিধান। আল কুরআনে দ্বীন শব্দটি কয়েক ধরনের অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এর মধ্যে জীবনের সকল মৌলিক বিষয়ের নির্দেশনা পাওয়া যায়। যেমন :

- ক) সূরা আল ফাতিহার ৩ ও সূরা আল ইনফিতর ৯ আয়াতে এর অর্থ প্রতিদান বা বদলা বা বিনিময়।
- খ) সূরা আলে ইমরান ৮৩, সূরা আয যুমার ২, সূরা আল বাকারা ১৯৩ আয়াতগুলিতে দ্বীন শব্দের অর্থ বুঝানো হয়েছে আনুগত্য বা আত্মসমর্পণ।
- গ) সূরা আলে ইমরান ১৯, ৮৫, সূরা আশ শূরা ১৩, সূরা আস সফ ৯, আয়াতগুলিতে বুঝানো হয়েছে আনুগত্যের বিধান।
- ঘ) সূরা আল মু'মিনুন ২৬, সূরা ইউসুফ ৭৬, সূরা আন নূর ২, সূরা তওবা ২৯ আয়াতগুলিতে বুঝানো হয়েছে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও আইন বিধান ইত্যাদি।

আল্লাহর দ্বীন মানব জীবনের সকল মৌলিক দিকের পথনির্দেশনা দান করে। ইসলামই একমাত্র দ্বীন বা আদম (আ.) হতে শুরু করে শেষ নাবী মুহাম্মাদ صلی اللہ علیہ وسلم পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে মানুষের জন্য গাইডলাইন হিসেবে আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে। শরীয়াহ হলো দ্বীন অনুসরণ ও বাস্তবায়নের বিস্তারিত পস্থা। মানুষের স্বভাব, প্রয়োজন, স্থান, কাল ও পরিস্থিতি সাপেক্ষে শরীয়ার পরিবর্তন হয়েছে। বিভিন্ন নাবীর শরীয়ার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু আল্লাহ এর পরিপূর্ণতা বিধান করেছেন শেষ নাবী মুহাম্মাদ صلی اللہ علیہ وسلم -এর মাধ্যমে। মানুষের কল্যাণের জন্যই মহান আল্লাহ এ সুন্দর, সহজ ও গতিশীল বিধানের ব্যবস্থা করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

## ৮৪. ইকামতে দ্বীন/আকিমুদ্দীন

ইকামতে দ্বীন অর্থ দ্বীন কায়েমের প্রচেষ্টা। আর দ্বীন কায়েম বলতে বুঝায় কোন একটা জনপদে দ্বীন ইসলাম বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। দ্বীন ইসলামের পরিপূর্ণ বিধি-বিধান অনুসরণ ও বাস্তবায়নের পথে কোন প্রকারের বাধা ও অন্তরায় না থাকা। আল্লাহ তা'আলা সূরায় শূরায় ঘোষণা করেছেন :

“তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের সেই নিয়ম কানুন নির্ধারণ করে দিয়েছেন যার নির্দেশ তিনি নূহ (আ.)-কে দিয়েছিলেন। আর যা এখন তোমার প্রতি যে হিদায়াত ওহীর মাধ্যমে প্রদান করছি, আর সেই হিদায়াত যা আমি ইবরাহীম (আ.), মুসা (আ.)-এর প্রতি প্রদান করেছিলাম। (সব নির্দেশের সার কথা ছিল)

তোমরা দ্বীন কায়েম কর এই ব্যাপারে পরস্পর দলাদলিতে লিপ্ত হবে না।”  
(সূরা আশ শূরা : ১৩)

এভাবে দ্বীন কায়েমের চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালানোটাই ইসলামী আন্দোলনের জাগতিক লক্ষ্য। আর এরই মাধ্যমে অর্জিত হয় পারলৌকিক লক্ষ্য অর্থাৎ নাজাত ও আল্লাহর সন্তুষ্টি। শেষ নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে দুনিয়ায় পাঠানোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল কুরআনে যা বলা হয়েছে তারও সার কথা এটাই।

## ৮৫. ইসলামিক মুভমেন্ট

আন্দোলন বা Movement যার সাধারণ অর্থ কোন দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্যে এবং কোন কিছু পরিবর্তন বা বাতিল করার জন্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা। এর ব্যাপক ও সামগ্রিক রূপ হলো প্রতিষ্ঠিত কোন কিছুকে অপসারণ করে সেখানে নতুন কিছু প্রতিষ্ঠা বা চালু করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা, প্রাণান্তকর চেষ্টা। ইসলামের সঠিক আকিদা বিশ্বাসের ভিত্তিতে দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে মুক্তির উদ্দেশ্যে আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত কিছু সংখ্যক লোকের সম্মিলিত ও সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার নাম ইসলামী আন্দোলন, আর এর সামষ্টিক রূপ ও কাঠামোর প্রক্রিয়ার নাম ইসলামী সংগঠন। এক কথায় বলতে পারি, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে পরিচালিত সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা বা সংগ্রাম সাধনার নামই আন্দোলন বা মুভমেন্ট।

## ৮৬. দাওয়াত

একজন মু’মিন হিসেবে এবং রসূল ﷺ-এর উম্মত হিসেবে আমাদের দায়িত্ব অনেক, তার মধ্যে সর্ব প্রধান কাজ হলো দাওয়াত (দ্বীন ইসলামের দাওয়াতী কাজ)। রসূল ﷺ তার জীবদ্দশায় যে কাজগুলো করে গেছেন বিদায় হাজ্জের ভাষণে তিনি আমাদেরকে সেই দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। তাই সেদিক দিয়ে চিন্তা করলে আমরা খুবই ভাগ্যবান যে নাবী-রসূলদের (আ.) দায়িত্ব আমাদেরকে দেয়া হয়েছে, আর এর কারণ হচ্ছে আর কোন নাবী-রসূল (আ.) আসবেন না, সেই কাজ আমাদেরকেই করতে হবে। গোটা কুরআন পড়লে আমরা দেখতে পাই যে এই দায়িত্ব এসেছে আল্লাহ তা’আলার পক্ষ থেকে এবং এই দায়িত্ব পালন করা অবশ্যই প্রতিটি মুসলিম নরনারীর জন্য ফরয। আল্লাহ বলেছেন :

- “এখন তোমরাই দুনিয়ার সর্বোত্তম দল। তোমাদের কর্মক্ষেত্রে আনা হয়েছে মানুষের হিদায়াত ও সংস্কার সাধনের জন্য, তোমরা ভাল কাজের আদেশ

দিয়ে থাক, দুষ্কৃতি থেকে বিরত রাখ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আন।”  
(সূরা আলে-ইমরান : ১১০)

- “তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক অবশ্যই থাকতে হবে, যারা মানবজাতিকে কল্যাণের পথে আহ্বান জানাবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে আর অসৎ কাজে বাধা দেবে, তারাই হ’ল সফলকাম।” (সূরা আলে-ইমরান : ১০৪)
- “তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া সত্যকে গোপন রাখে?” (সূরা বাকারা : ১৪০)
- “হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর সাহায্যকারী হও [দ্বীনের প্রতি আহ্বান জানানোর কাজে]।” (সূরা আস-সফ : ১৪)
- “তুমি এদের বলে দাও : আমার পথ তো এই, আমি আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাই।” (সূরা ইউসুফ : ১০৮)
- “দ্বীন কায়েম কর এবং এ ব্যাপারে মতভেদে লিপ্ত হয়ো না।” (সূরা আশ-শূরা : ১৩)

## ৮৭. দা-’ঈ

দ্বীন ইসলামের দাওয়াতী কাজ যিনি করেন অর্থাৎ ইসলাম প্রচারের কাজ যিনি করেন ইসলামের পরিভাষায় তাকে দা-’ঈ বলে।

**একজন দা-’ঈর ভিশন :** “To seek the pleasure of Allah Subhanahu wata’ala by serving humanity” (মানুষের সেবার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।)

“সে তো শুধু মহান রবের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করে। অবশ্যই তিনি [তার উপর] সন্তুষ্ট হবেন।” (সূরা লাইল : ২০-২১)

“অপরদিকে মানুষের মধ্যেই এমন লোক রয়েছে যে কেবল আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যেই নিজের জীবন-প্রাণ উৎসর্গ করে, বস্তুতঃ আল্লাহ এসব বান্দার প্রতি খুবই অনুগ্রহশীল।” (সূরা বাকারা, ২ : ২০৭)

**একজন দা-’ঈর মিশন :** একজন দা-’ঈ হিসেবে আমাদেরকে অবশ্যই পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে যে আমাদের মূল ভিশন কী আর ঐ ভিশনে পৌঁছতে হলে তার মিশনগুলো কী কী। একজন দা-’ঈর ভিশন নিয়ে agreement হচ্ছে মহান আল্লাহ তায়ালার সাথে। আমাদের উচিত মিশনগুলো মুখস্ত করে নেয়া।

- a. Invite: To invite mankind to submit to the Creator by using all means of communication.
- b. Motivate: To motivate Muslims to perform their duty of being witness unto mankind by their words and deeds.
- c. Organize: To organize those who agree to work for this cause under the discipline of Islam.
- d. Educate: To offer educational and training opportunities to increase Islamic knowledge, to enhance Muslim character.
- e. Support: To promote morality and join forces against all levels of oppression to achieve the goal of socio-economic justice in the society.
- f. Strengthen: To strengthen the bond of humanity by serving all those in need anywhere in the world with special focus on our neighborhoods across the country.
- g. Cooperate: To cooperate with other organizations for the implementation of this program and unity in the Muslim community as well as in all other faith groups.

## ৮৮. ইসলামিক অর্গানাইজেশন (সংগঠন)

আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার কাজে সাহায্য করে যে অর্গানাইজেশন বা সংগঠন, তাই ইসলামী সংগঠন। ইসলামী সংগঠন একটি ইনস্টিটিউশন বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বটে যা আদর্শ লোক তৈরীতে সাহায্য করে। এছাড়া ইসলামী সংগঠন দাওয়াতী কাজের একটি প্ল্যাটফর্ম। কারণ কোন প্ল্যাটফর্ম ছাড়া দাওয়াতী কাজে সফলতা পাওয়া সম্ভব নয়। সঠিক ইসলামী বিশ্বাসের ভিত্তিতে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে আল্লাহর এই পৃথিবীতে বাতিল ও আল্লাহদ্রোহী মতাদর্শ পবিত্রন করে আল্লাহর দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কতগুলো লোকের সংঘবদ্ধ রূপ কাঠামোকে ইসলামী সংগঠন বলে। আর সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টাকে ইসলামিক মুভমেন্ট বলে।

## ৮৯. ফি সাবিলিল্লাহ

ফি সাবিলিল্লাহ অর্থ আল্লাহর পথে। এ কথাটির অর্থ ব্যাপক। সাধারণতভাবে গরীব-দুঃখীকে সাহায্য বা সেবামূলক কাজও ফি সাবিলিল্লাহর কাজ হিসেবে

পরিগণিত, তবে এগুলো ফি সাবিলিল্লাহর মৌলিক কাজ নয়। আল কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মৌলিকভাবে ফি সাবিলিল্লাহ বলতে আল্লাহর দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠাকে বুঝায়।

## ৯০. ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ

শাব্দিক অর্থে ইনফাকের অর্থ ‘অর্থ খরচ করা’। কিন্তু যেমন তেমন খরচকে ইনফাকের পর্যায়ে ফেলা যায় না। আল কুরআনে ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহর আহ্বান মূলতঃ আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে অর্থ ব্যয়কেই বুঝানো হয়েছে। ইনফাকের অর্থ এবং ফি সাবিলিল্লাহর অর্থ একত্রে মিলালে ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহর অর্থ দাঁড়ায় : আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য এর উপায়-উপকরণ যোগাড় ও এই মহান কাজটি পরিচালনার জন্যে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্যে অর্থসম্পদ খরচ করা।

## ৯১. কুফর (Kufr)

অর্থ - আল্লাহর উপর অবিশ্বাস, ইসলামে অবিশ্বাস, সত্য গোপন করা বা ঢেকে রাখা। আল্লাহর প্রতি অশ্রদ্ধা বা বিরূপ মন্তব্য। ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করা। ইসলাম ধর্মে অবিশ্বাস। “কাফারা” root থেকে উদ্ভূত যার অর্থ সত্যকে ঢেকে রাখা বা গোপন করা বা অস্বীকার করা।

## ৯২. কাফির (Kafir)

অর্থ - আল্লাহ অথবা ইসলাম ধর্মে অবিশ্বাসী। সত্য গোপনকারী। একবচন কাফির অথবা কাফ্ফার। বহুবচনে কাফিরুন অথবা কুফ্ফার। কাফিরদের স্থান জাহান্নাম (কুরআন ৮ : ৩৬)

## ৯৩. মুনাফিক (Munafiq)

অর্থ - কপটাচারী, ভণ্ড, প্রতারক। যে ব্যক্তি বাহ্যিক/মৌখিকভাবে মুসলিম কিন্তু অন্তরে ইসলামে ঈমান নেই, সেই ব্যক্তি একজন মুনাফিক। আল্লাহ মুনাফিকদের অত্যন্ত অপছন্দ করেন। ওদের জন্যে জাহান্নামের নিম্নতম স্তর (কুরআন ৪ : ১৪০, ১৪৫)। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে মুনাফিকদের চারটি লক্ষণ : (ক) সে বিশ্বাসঘাতকতা করে, (খ) মিথ্যা বলে, (গ) চুক্তি ভংগ করে, এবং (ঘ) তার মুখ থেকে কুৎসিৎ গালি বের হয়।



## ৯৪. ফাসিক (Faasiq)

বহুবচনে ফা-সিকীন অথবা ফাসা-ক। পাপী (গুনাহগার), সৎপথত্যাগী, চরিত্রহীন (immoral), আল্লাহতে অবিশ্বাসী, অসৎকর্মকারী ইত্যাদি। মূল ধাতু ফাসাকা, সেটা থেকে ফিস্ক (Fisq), ফুসুক (Fusuq) আরো অনেক অর্থেই ফাসিক কথাটা ব্যবহৃত হয় যথা : a person not meeting the legal requirements of righteousness (Islamic Law); fornicator, adulterer, sinner, godless, licentious, etc.

ফিস্ক কথাটার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর হুকুমের অবাধ্যতা, আইনভংগ করা, পাপ-পংকিল ও চরিত্রহীনতার জীবন ইত্যাদি। সূরা বাকারার ১৯৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ ফুসুক (ফিস্ক কথাটার বহুবচন – অন্যায/অশ্লীল কাজকর্ম) থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। ফাসিকদের তিনি শাস্তি দেবেন একথা তাঁর কুরআনে আল্লাহ বহু আয়াতেই উল্লেখ করেছেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর সেই ধর্মের নির্দেশ অস্বীকার করা বা অমান্য করাও ফিস্কের অপরাধের অন্তর্ভুক্ত।

## ৯৫. মুরতাদ

মুরতাদ তারাই যারা মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও মুসলিম সমাজের মাঝে প্রকাশ্যে আল্লাহর বিরুদ্ধে কাজ করে, ইসলামের বিরুদ্ধে কলম ধরে এবং শত্রুদের দলে গিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে হাত মিলায়। ইসলাম কাউকে মুসলিম হতে বাধ্য করে না। ধর্মে জোর-জবরদস্তি নেই। মুরতাদ হলো তারাই যারা আল্লাহর ও মুসলিম উম্মাহর নিরাপত্তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। ইসলামী শরিয়্যা মতে সেই বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। নানা ফেরকা ও নানা মাযহাবের উলামাদের মাঝে নানা বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু ইসলামের মৌল বিষয়ের ন্যায় মুরতাদের সংজ্ঞা ও শাস্তি নিয়ে কোন মতভেদ নেই। আর এই শাস্তি কার্যকরী করার দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের (Islamic State)। ব্যক্তিগতভাবে কেউ এই শাস্তির দায়িত্ব হাতে তুলে নিতে পারবে না।

## ৯৬. তাগুত

হে নাবী! তুমি কি তাদেরকে দেখোনি, যারা এই মর্মে দাবী করে চলছে যে, তারা ঈমান এনেছে সেই কিতাবের প্রতি যা তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে এবং সেই সব কিতাবের প্রতি যেগুলো তোমার পূর্বে নাযিল করা হয়েছিল; কিন্তু তারা নিজেদের বিষয়গুলোর ফায়সালা করার জন্য ‘তাগুত’ের দিকে ফিরতে

চায়, অথচ তাদেরকে তাগুতকে অস্বীকার করার হুকুম দেয়া হয়েছিল? শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে সরল সোজা পথ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। (সূরা আন নিসা ৪, ৫৬০)

তাগুত বলতে সুস্পষ্টভাবে এমন শাসককে বুঝানো হয়েছে যে আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে অন্য কোন আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে এবং এমন বিচার ব্যবস্থাকে বুঝানো হয়েছে যা আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার আনুগত্য করে না এবং আল্লাহর কিতাবকে চূড়ান্ত সনদ হিসেবে স্বীকৃতিও দেয় না। কাজেই যে আদালত তাগুতের ভূমিকা পালন করছে, নিজের বিভিন্ন বিষয়ের ফায়সালার জন্য তার কাছে উপস্থিত হওয়া যে একটি ঈমান বিরোধী কাজ, এ ব্যাপারে এ আয়াতটির বক্তব্য একেবারে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। আর আল্লাহ ও তাঁর কিতাবের ওপর ঈমান আনার অপরিহার্য দাবি অনুযায়ী এ ধরনের আদালতকে বৈধ আদালত হিসেবে স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানানোই প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির কর্তব্য। কুরআনের দৃষ্টিতে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা ও তাগুতকে অস্বীকার করা, এ দু'টি বিষয় পরস্পরের সাথে অংগাংগীভাবে সংযুক্ত এবং এদের একটি অন্যটির অনিবার্য পরিণতি। আল্লাহ ও তাগুত উভয়ের সামনে একই সাথে মাথা নত করাই হচ্ছে সুস্পষ্ট মুনাফিকী।

দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। ভ্রান্ত মত ও পথ থেকে সঠিক মত ও পথকে ছাঁটাই করে আলাদা করে দেয়া হয়েছে। এখন যে কেউ তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর উপর ঈমান আনে, সে এমন একটি মজবুত অবলম্বন আঁকড়ে ধরে, যা কখনো ছিন্ন হয় না। আর আল্লাহ (যাকে সে অবলম্বন হিসেবে আঁকড়ে ধরেছে) সবকিছু শোনে ও জানে। (সূরা আল বাকারা, ২ : ২৫৬)

আভিধানিক অর্থে এমন প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে 'তাগুত' বলা হবে, যে নিজের বৈধ অধিকারের সীমানা লঙ্ঘন করেছে। কুরআনের পরিভাষায় তাগুত এমন এক বান্দাকে বলা হয়, যে বন্দেগী ও দাসত্বের সীমা অতিক্রম করে নিজেই প্রভু ও খোদা হবার দাবীদার সাজে এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে নিজের বন্দেগী ও দাসত্বে নিযুক্ত করে। আল্লাহর মোকাবিলায় বান্দার প্রভুত্বের দাবীদার সাজার এবং বিদ্রোহ করার তিনটি পর্যায় আছে। ১ম পর্যায় বান্দা নীতিগতভাবে তাঁর শাসন কর্তৃত্বকে সত্য বলে মেনে নেয় কিন্তু কার্যত তার বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে। একে বলা হয় ফাসিকী। ২য় পর্যায়ে সে আল্লাহর শাসন কর্তৃত্বকে নীতিগতভাবে মেনে না নিয়ে নিজের স্বাধীনতার ঘোষণা দেয় অথবা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো বন্দেগী ও দাসত্ব করতে থাকে। একে বলা হয় কুফরী।

৩য় পর্যায়ে সে মালিক ও প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তার রাজ্যে এবং তার প্রজাদের মধ্যে নিজের হুকুম চালাতে থাকে। এই শেষ পর্যায়ে যে বান্দা পৌঁছে যায় তাকেই বলা হয় “তাগুত”। কোন ব্যক্তি এই তাগুতকে অস্বীকার না করা পর্যন্ত কোন দিন সঠিক অর্থে আল্লাহর মু’মিন বান্দা হতে পারে না।

যে তাগুতকে অস্বীকার করলো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল সেই ময়বুত রজ্জু ধারণ করেছে। (সূরা বাকারা, ২ : ২৫৬)

তাগুত অর্থ হলো আল্লাহর বিদ্রোহী শক্তি। কাফির আল্লাহকে অস্বীকার করে মাত্র। কিন্তু তাগুত মানুষকে আল্লাহর দাসত্ব করতে বাধ্য দেয় এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তার আনুগত্য করতে বাধ্য করে। ফিরাউন এমনি ধরনের তাগুত ছিল বলেই মুসা (আ.)- কে ফিরাউনের নিকট পাঠাবার সময় আল্লাহ বললেন –

ফিরাউনের কাছে যাও, নিশ্চয়ই সে বিদ্রোহ করেছে। (সূরা আন নাযিয়াত : ১৭)

ইসলাম বিরোধী শক্তি এক কথায় তাগুত। দ্বীনে বাতিল তাগুতী শক্তিরই নাম। কালিমায়ে তাইয়িবায প্রথমেই তাগুত বা বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বলা হয় যে, লা-ইলাহা বা কোন হুকুমকর্তাকে মানি না। অন্য সব কর্তাকে অস্বীকার করার পরই ইল্লাল্লাহ বলে আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ হিসেবে স্বীকার করা হয়। সুতরাং ইসলামের প্রথম কথাই বাতিলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এ কারণেই কালেমার দাওয়াত নিয়ে যে নাবীই এসেছেন তাগুত বা বাতিল তাকে স্বাভাবিকভাবেই দুশমন মনে করে নিয়েছে। দ্বীনে হকের দাওয়াত দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত শেষ নাবীও আল আমীন ও আস সাদিক বলে প্রশংসিত ছিলেন। কিন্তু “আল্লাহর দাসত্ব কর ও তাগুতকে ত্যাগ কর।” (সূরা আন নাহল : ৩৬) বলে দাওয়াত দেয়ার পর নাবীর সাথে তাগুতের সংঘর্ষ না হয়েই পারে না।

## ৯৭. ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ ইংরেজী Secularism শব্দেরই বাংলা অনুবাদ। ধর্মীয় প্রবণতাকে মানুষের ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ রেখে সমাজ জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে আল্লাহ ও রসুলের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার নামই ধর্মনিরপেক্ষতা। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ধর্মকে পরিত্যাগ করাই এর লক্ষ্য। সে হিসেবে এ মতবাদকে ধর্মহীনতা বলাই সমীচীন। ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন :

“তরাই সে লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে বিভ্রান্ত হয়, অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে। তরাই সে লোক, যারা তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলী এবং তার সাথে সাক্ষাতের বিষয় অস্বীকার করে। ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। সতরাং কিয়ামতের দিন তাদের জন্য আমি কোন গুরুত্ব স্থির করব না। জাহান্নাম এটাই তাদের প্রতিফল; কারণ তারা কাফির হয়েছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রসূলগণকে বিদ্রূপের বিষয়রূপে গ্রহণ করেছে। (সূরা কাহাফ : ১০৪-১০৬)

### ৯৮. মুসলিম সরকারের দায়িত্ব সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য

ইসলামী সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর দ্বীন ইসলামকে বাস্তবায়ন করাই রাষ্ট্র প্রধানের কর্তব্য। তার মধ্যে প্রধান দায়িত্ব হল চারটি। যা আল্লাহ কুরআনে ঘোষণা করেন :

তারা এমন লোক যাদেরকে আমি জমিনে ক্ষমতা দান করলে সলাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে। আর সব বিষয়ের চূড়ান্ত পরিণতি আল্লাহর হাতে। (সূরা হাজ্জ : ৪১)

মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মুসলিমদের কোন বিষয়ের দায়িত্বশীল হল কিন্তু পরে সে তাদের কল্যাণ কামনা ও সেবা দেয়ার জন্য এতটুকু চেষ্টাও করল না যা সে নিজের জন্য করে থাকে, আল্লাহ তাকে উপর করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (তাবারানী আল-মুজামুস সগীর)

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন যে ব্যক্তি মুসলিমদের কোন বিষয়ের দায়িত্বশীল হল, অতঃপর তাতে বিশ্বাসঘাতকতা করল, সে জাহান্নামে যাবে। (তাবারানী আল-মুজামুস সগীর)

আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল ﷺ এই দুআ করলেন, হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের লোকদের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় কাজের দায়িত্বশীল হবে সে যদি লোকদেরকে ভয়ানক অশান্তি ও দুঃখ-কষ্টে নিক্ষেপ করে, তবে তুমিও তার জীবনকে সংকীর্ণ ও কষ্টপূর্ণ করে দাও। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মাতের সামগ্রিক কাজকর্মের দায়িত্বশীল হবে এবং সে যদি লোকদের প্রতি ভালোবাসা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করে তবে তুমিও তার প্রতি অনুগ্রহ কর। (সহীহ মুসলিম)

## ৯৯. কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য

কুরআনকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে এ কথাটি জানতে হবে যে, আল্লাহ কী উদ্দেশ্যে এ কিতাব নাযিল করেছেন। আদম ও হাওয়া (আ.)-কে জান্নাত থেকে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তারা শয়তানের ভয়ে অস্থির হয়ে গিয়েছিলেন। যে শয়তান এত কৌশল ও যোগ্যতার সাথে তাঁদেরকে জান্নাতে পর্যন্ত ধোঁকা দিতে পেরেছে, দুনিয়ায় না জানি ঐ শত্রুর হাতে কী দুর্গতি হয় এ আশঙ্কায়ই তাঁরা চিন্তিত হয়ে গিয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে সাত্ত্বনা দিয়ে বলেছেন,

“আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হিদায়াত আসবে। যারা ঐ হিদায়াত মেনে চলবে তাদের কোনো ভয় নেই। আর তাদের ভাবনার কোনো কারণও নেই।”  
(সূরা বাকারা : ৩৮)

আল্লাহর ঐ ঘোষণা অনুযায়ী মানবজাতিকে সঠিক পথে চলার সুযোগ দেয়ার উদ্দেশ্যেই নাবী ও রসূলগণের নিকট যুগে যুগে কিতাব পাঠানো হয়েছে। শয়তানের ধোঁকা, নাফসের তাড়না ও দুনিয়ার মোহ থেকে বেঁচে থেকে আল্লাহর হুকুম ও রসূল صلی اللہ علیہ وسلم-এর তরীকা অনুযায়ী যারা চলতে চায়, তাদেরকে সব যুগেই আল্লাহর কিতাব সরল ও সঠিক পথ দেখিয়েছে। আল কুরআন আল্লাহর ঐ মহান কিতাবেরই সর্বশেষ সংস্করণ। তাহলে বোঝা গেল, দুনিয়ার জীবনটা কীভাবে কাটালে দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তি পাওয়া যাবে- সে কথা শিক্ষা দেয়ার জন্যই কুরআন এসেছে। দুনিয়াদারি বাদ দিয়ে বৈরাগী, সন্ন্যাসী ও দরবেশ হওয়ার শিক্ষা দিতে কুরআন আসেনি। মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে হলে ঘর-সংসার, রুজি-রোজগার, বিয়ে-শাদি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শাসন-বিচার, যুদ্ধ-সন্ধি ইত্যাদি যত কিছু মানুষকে করতে হয় সবই যাতে আল্লাহর হুকুম ও রসূল صلی اللہ علیہ وسلم-এর তরীকা অনুযায়ী এসব করা হলে দুনিয়াদারিও দ্বীনদারিতে পরিণত হয়। আর ঐসব কাজ যদি মনগড়া নিয়মে করা হয়, তাহলে সবই শয়তানের কাজ বলে গণ্য। মু'মিনের জীবনে দ্বীনদারি ও দুনিয়াদারি আলাদা নয়। আল্লাহর হুকুম ও রসূল صلی اللہ علیہ وسلم-এর তরীকা অনুযায়ী চললে গোটা জীবনের সব কাজই দ্বীনদারি বলে গণ্য।

## ১০০. রসূল صلی اللہ علیہ وسلم -কে এই পৃথিবীতে পাঠানোর উদ্দেশ্য

আল্লাহ যে রসূলের উপর কুরআন নাযিল করেছেন তাঁকে দুনিয়ার কোন্ দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন তা কুরআনেরই তিনটি সূরায় স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন :

“তিনিই ঐ সত্তা, যিনি তাঁর রসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন, যাতে (রসূল) ঐ দ্বীনকে অন্য সব দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন।”(সূরা তাওবা : ৩৩, সূরা ফাত্হ : ২৯ ও সূরা সফ : ৯)

এ আয়াত থেকে জানা গেল, কুরআনই ঐ হিদায়াত ও সত্য দ্বীন (দ্বীনে হক), যাকে মানুষের মনগড়ার মত, পথ ও বিধানের উপর বিজয়ী করার কঠিন ও মহান দায়িত্ব দিয়ে শেষ নাবীকে পাঠানো হয়েছে। এ দায়িত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে হলে ‘দ্বীন’ শব্দের আসল অর্থ জানতে হবে। ‘দ্বীন’ শব্দের মূল অর্থ আনুগত্য বা মেনে চলা ছাড়া মানুষের উপায় নেই। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনসহ ছোট-বড় সব ব্যাপারেই কতক নিয়ম, আইন ও বিধান মেনে চলতে হয়। এসব আইন বানানোর সুযোগ যারা পায়, তারা সবার প্রতি ইনসাফপূর্ণ বিধান তৈরি করতে পারে না। সঠিক জ্ঞানের অভাবে বা দলগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থের কারণে এসব বিধানের দ্বারা মানুষ শোষণ, যুলুম ও অশান্তি ভোগ করে। মানবরচিত এসব বিধানেও ঐ আয়াতে দ্বীন বলা হয়েছে। কেননা, সব বিধানই মানুষের নিকট আনুগত্য দাবি করে এবং মানুষ তা মেনে চলতে বাধ্য হয়।

আল্লাহ মানবজাতিকে মানুষের দ্বীনের শোষণ, অত্যাচার ও অশান্তি থেকে মুক্তি দেয়ার দায়িত্ব দিয়েই রসূল صلی اللہ علیہ وسلم -কে ‘দ্বীনে হক’সহ পাঠিয়েছেন। মানুষ যেন আল্লাহর দ্বীনকে মেনে চলার সুযোগ পায় এবং অন্য কোনো দ্বীনের আনুগত্য করতে যেন বাধ্য না হয়, সে মহান উদ্দেশ্যেই রসূল صلی اللہ علیہ وسلم -কে পাঠানো হয়েছে। রসূল صلی اللہ علیہ وسلم দীর্ঘ ২৩ বছরের কঠোর সাধনা, ত্যাগ ও কুরবানীর মাধ্যমে অত্যন্ত সফলতার সাথে এ কঠিন দায়িত্ব পালন করেছেন। ইতিহাসই এর উজ্জ্বল সাক্ষী।

## কিছু প্রচলিত আরবী শব্দ ও তার বাংলা অর্থ

আরবী	বাংলা অর্থ	আরবী	বাংলা অর্থ
সুবহা-নাল্লাহ	মহান আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি	ইহসান	সৎকাজ/ভাল ব্যবহার/ আল্লাহর উপস্থিতি
আলহামদুলিল্লাহ	সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য	একীন	অন্তরে গভীর বিশ্বাস
আল্লাহ্ আকবার	আল্লাহ্ মহান, সর্বশ্রেষ্ঠ	ইখলাস	সততা/ছলনাবিহীনতা/ Sincerity
মাশা-আল্লাহ	আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন	তরক করা	পরিত্যাগ করা
সুবহা-না রবিয়াল আযীম	আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণা করছি	ফিকির	না পাওয়া পর্যন্ত অনুসন্ধান করা/খোঁজাখুঁজি করা
সুবহা-না রবিয়াল আ'লা	আমি আমার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভুর পবিত্রতা ঘোষণা করছি	কিরামান-কাতেবিন	সম্মানিত লেখকদ্বয়
খুশু খুযু	ভয়/আশা/বিনয়/একগ্রতা	ফিতনা	পরীক্ষা/ বাধা
আ'উযুবিল্লাহ	আমি আশ্রয় চাই আল্লাহর কাছে	ওসঅয়াসা	প্ররোচনা/ কুমন্ত্রণা
না'উযুবিল্লাহ	আমরা আশ্রয় চাই আল্লাহর কাছে	মাওলা	প্রভু (আল্লাহ)
আস্তাগফিরুল্লাহ	আমি ক্ষমা চাই আল্লাহর কাছে	মাওলানা	আমাদের প্রভু
সুবহানাহু ওয়া তা'আলা	আল্লাহ অতি পবিত্র ও মহান	আলেম	যার ভেতর ইলম (জ্ঞান) আছে
আ'লাইহিস সালাম	তঁার উপর শান্তি বর্ষিত হোক	ওলামা	আলিমের বহুবচন
রাদিআল্লাহ্ আনহু	আল্লাহ তঁার উপর রাজী হোন	ওলী	অভিভাবক
জাযাকাল্লাহু খাইরান	আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান/পুরস্কার দিন	আওলিয়া	ওলির বহুবচন
তাহক্কীক	যাচাই-বাছাই/verification	হক ও বাতিল	সত্য ও মিথ্যা
সহীহ	শুদ্ধ/সঠিক/authentic	বালা - মুছিবত	বিপদ - আপদ
যঈফ	দুর্বল/weak	নশর	পুনরুত্থান
মাওজু	মিথ্যা/বানোয়াট/ fabricated	হাশর	জমায়েত/ gathering
মুনকার	অগ্রহণযোগ্য/ unacceptable	জিয়ারত	দর্শন/visit
হাসান	উত্তম (সহীহর কাছাকাছি)	জানাযা	মৃতদেহ/ডেড বডি
মুস্তাহাব	উত্তম/প্রশংসনীয়/better	ইন্তিক্বাল	স্থানান্তর/বদলি/transfer

## REFERENCES

- ② তাফসীরে ইবনে কাসীর - ইবনে কাসীর
- ② তাফসীরে ফীযিলালিল কুরআন - সাইয়েদ কুতুব শহীদ
- ② সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম
- ② হাদীস শরীফ ১ম খন্ড - মুহাম্মদ আব্দুর রহীম
- ② তাকওয়া জ্ঞান কোষ - মাওলানা নুরুল হুদা সান্তারী
- ② ইসলামি জীন্দেগীর মৌলিক উপাদান - মোঃ সারওয়ার কবির শামীম
- ② কুরআন ও হাদীস সংগ্ৰহ - অধ্যাপক মাওলানা আতিকুর রহমান ভূঁইয়া
- ② এন্তেখাবে হাদীস - আব্দুল গাফ্ফার হাসান নদভী
- ② আত-তাহরীক - ফেব্রুয়ারী ২০০৭
- ② ইসলামের বুনয়াদি শিক্ষা - আধুনিক প্রকাশনী
- ② সফল প্রবাস জীবন - মোঃ সারওয়ার কবির শামীম
- ② তাকওয়ার বাস্তব রূপ - তাফসীরে ইবনে জুযাই
- ② ইসলামের শিক্ষা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ- সাইদুল হোসেন
- ② দ্বীন ইসলামের ১৫টি বিষয়ে সঠিক ধারণা - আধুনিক প্রকাশনী
- ② কুরআন, হাদীস ও ইসলাম - সাইদুল হোসেন
- ② সচ্চরিত্র গঠনের রূপরেখা - জাবেদ মুহাম্মাদ
- ② এতেকাফ তাৎপর্য, উদ্দেশ্য ও বিধান - সংকলন : মুহাম্মদ আকতারুজ্জাম
- ② সালাতে একাগ্রতা ও খুশ - সানাউল্লাহ নজির আহমদ
- ② সমাজ গঠনে নামাযের ভূমিকা - আব্বাহমা দেলওয়ার হোসেন
- ② ইসলামিক এনসাইক্লোপিডিয়া - সাইদুল হোসেন
- ② তাকওয়া - ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
- ② Muslimmatters থেকে বিডিটুডে - দেশের আলো, ক্যনাডা, মে ২০১৫
- ② Dr. Zakir Naik Lecture – Women rights
- ② From website - moreoneislam@hotmail.com
- ② <http://salafimedia.com/tarbiyyah/item/283-meaning-of-at-taqwa.html>
- ② <http://islambrowser.blogspot.com/2010/12/taqwa.html>
- ② <http://en.wikipedia.org/wiki/Taqwa>
- ② <http://quranicverse99.tripod.com/pathtoparadise/id3.html>
- ② [www.islaam.com](http://www.islaam.com)
- ② [www.islamtomorrow.com](http://www.islamtomorrow.com)
- ② [www.islamonline.net](http://www.islamonline.net)
- ② <http://www.isgr.org/taqwa.htm>
- ② [www.islamhouse.com](http://www.islamhouse.com)
- ② <http://www.witness-pioneer.org/vil/Articles/tazkiyah/taqwa.html>
- ② [www.ahya.org/amm/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=154](http://www.ahya.org/amm/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=154)
- ② <http://www.bogvaerker.dk/Taqwa.html>
- ② <http://unitypeace.com/home/taqwa>



## ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজের উদ্দেশ্য

সকল প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহ তা'আলার ।

আমরা মূলতঃ ‘প্যারেন্টিং এবং ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট’ নিয়ে গবেষণা করি । আমাদের প্রকাশিত বইগুলোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে পারিবারিক উন্নয়ন । আমরা সকলেই চাই এই দুনিয়া এবং আখিরাত দুই দিকেই সফলতা । প্রকৃত ইসলামিক জ্ঞান এবং সেই অনুযায়ী জীবন পরিচালনা ছাড়া এটা কিছুতেই সম্ভব না । আমাদের মতো যারা ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া জেনারেল এডুকেশনে এডুকটেড তাদের ইসলামের উপর তেমন কোন একাডেমিক এবং সিলেবাসভিত্তিক পড়াশোনা নেই । আমরা দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে যতোটুকুই জানি তা শুনে শুনে বা দুই একটা বই পড়ে যার বিস্তৃতি বা গভীরতা নগণ্য । আমরা যারা দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ও আমলযোগ্য জ্ঞান অর্জন করতে চাই তাদের সামনে এক মহাসমুদ্র, কোথা থেকে শুরু করবো আর কোথায় গিয়ে শেষ করবো বুঝে উঠা মুশকিল! এছাড়া আমাদের সামনে ইসলামিক স্টাডিজের উপর বাস্তব জীবনধর্মী কোন পরিপূর্ণ সিলেবাসও নেই । বরং রয়েছে বাজার ভরা আনঅথেন্টিক বই-পত্রের সমারোহ । আমরা যারা ব্যস্ত জীবন-যাপন করি তাদের সময়-সুযোগ করে সব দিক মিলিয়ে ইসলামকে জানার জন্য প্রচুর পড়া-শোনার সময়ও হয়ে উঠে না ।

এই বিষয়ে আমরা নিজেরা (স্বামী-স্ত্রী) যেহেতু ভুক্তভুগি ছিলাম তাই অন্যদের কথা চিন্তা করে দ্বীন ইসলামের উপর আমাদের ১২ বছরের অধ্যয়ন, বিভিন্ন কোর্স এবং গবেষণার ফল ১২টি বইতে বিষয়ভিত্তিকভাবে উপস্থাপন করেছি । কোন পরিবার যদি ১২টি বইয়ের এই সিলেবাস অধ্যয়ন করেন তাহলে তাদের সঠিক ইসলামের উপর ওভারঅল একটা নলেজ হবে । আমরা ১২ বছরে যা শিখেছি আশা করি এই ফ্যামিলি ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজের ১২টি বই অধ্যয়ন করলে তা এক বছরেই পাওয়া সম্ভব, ইনশাআল্লাহ । একই কথা চিন্তা করে বড়দের ডেভেলপমেন্টের পাশাপাশি আমরা আমাদের সন্তানদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে বাংলা মিডিয়ামের জন্য ১২টি বই বাংলায় এবং ইংরেজী মিডিয়ামের জন্য ১২টি বই ইংরেজীতে প্রকাশ করেছি । এই বইগুলো পড়লে বড়রাও সমভাবে উপকৃত হবেন ।

আমরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনই মূলতঃ IT Professionals, আমাদের মেধা ও একাডেমিক কোয়ালিফিকেশনকে আমরা সঠিক দ্বীন বুঝার কাজে লাগানোর চেষ্টা করছি, তাই প্রকৃত পক্ষে আমরা হলাম Students of Knowledge । আমাদের বইগুলো প্রকাশনার সমস্ত ব্যয় IFD Trust-কে সদাকা করে দেয়া হয়েছে । এই বইয়ের বাজারজাতকরণ এবং বিক্রি সবই Non-commercial । এই বইয়ের বিক্রয় মূল্য সমাজের কল্যাণে পরবর্তী ভার্শন প্রিন্টিংয়ে ব্যবহৃত হবে, ইনশাআল্লাহ ।